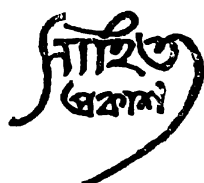
পশ্চিম সীমান্ত-বঙ্গের লোক-সাহিত্য

উৎস ও অভিপ্রায়

শ্রীসুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.
অধ্যাপক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
দীনবন্ধু কলেজ, শিবপুর



কোলকাতা নয়

শ্রীমিতা দেবী
C/o 'লিপিকা
৩০।১ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীপঞ্চমী ১৩৫৭
২২শে জানুয়ারী '৬৯

প্রচ্ছদ : শ্রীমর্ণিব মিত্র

বিক্রয় কেন্দ্র

দে বুক স্টোর্স
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সান্যাল এণ্ড কোং
১।১এ, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা—১২

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

মুদ্রক :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিক াতা-৬

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকশ্রুতিবিদ্‌

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি. এইচ. ডি., এফ. এন. এ.

শ্রীচরণকমলেষু

পরিচায়িকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগে একটি ঐচ্ছিক পাঠ্য রূপে যখন লোক-সাহিত্য বিষয়টি প্রবর্তিত হইয়াছিল, তখন বিষয়টির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে একটু আশঙ্কা ছিল। ইহার প্রধান কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বিভাগের কোন পাঠ্যতালিকায় লোক-সাহিত্য বিষয়টিকে স্বতন্ত্রভাবেই হোক, কিংবা অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্তভাবেই হোক, পড়াইবার কিংবা পড়িবার এ যাবৎ কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। স্নাতক বিভাগ হইতেই বিষয়টি পড়াইতে আরম্ভ করিলে স্নাতকোত্তর বিভাগ পর্যন্ত তাহার ধারা অগ্রসর হইয়া শেষ পর্যন্ত তাহা কতকটা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে; কিন্তু তাহার কোন ব্যবস্থা না থাকিলে কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর বিভাগের দুই বৎসরের অনুশীলনের মধ্য দিয়া লোক-সাহিত্যের মত একটি ব্যাপক বিষয় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোন কৌতূহল সৃষ্টি করা অসম্ভব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা গেল, মাত্র ১৯৬০ সন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগে লোক-সাহিত্য বিষয়টি একটি ঐচ্ছিক বিষয় রূপে প্রবর্তিত হইবার পর হইতেই ছাত্রছাত্রীদিগের মধ্যে এই বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল এবং আকর্ষণ ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরও কয়েকজন অনুরাগী ছাত্রছাত্রী এই বিষয় লইয়া উচ্চতর অনুসন্ধান এবং গবেষণার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি বা 'ডক্টরেট' লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিরই লোক-সাহিত্য লইয়া বিস্তৃত গবেষণা কেবলমাত্র যে আরম্ভই হইয়াছে, তাহাই নহে—বহু দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; বিষয়টির গুরুত্ব এবং

জাতীয় জীবনে ইহার অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া ইহা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ছাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া ঐচ্ছিক বিষয়রূপেই নহে, সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় রূপে অবশ্য-পাঠ্য হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে স্নাতকোত্তর শিক্ষা-ব্যবস্থার সনাতন ধারায় এ' যাবৎ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। সেইজন্য সমাজ এবং জীবনের নূতন নূতন প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের পাঠ্যতালিকা এই পর্যন্ত নূতন ভাবে রচনা করিয়া লইবার আমরা কোন প্রেরণা অনুভব করি না।

যাই হোক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগের লোক-সাহিত্য বিষয়টি পাঠ্যরূপে গৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি অভিনব ব্যবস্থাও ইহার সঙ্গে গৃহীত হইয়াছিল। লোক-সাহিত্যের পুথি-পাঠ্য বিষয়কে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কার্যে হাতে কলমে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ইহার ছাত্রছাত্রীর এক একটি দল লইয়া প্রতি বৎসরই আমি নিজে পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলে একবার করিয়া শিবির স্থাপন করিয়া আসিতেছি। তাহাতে অধিকাংশই গ্রাম-জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ শহুরে ছাত্রছাত্রী বাংলার পল্লীর নরনারীর সঙ্গে সহজে মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইয়া ইতিমধ্যেই তাহাদের যে অন্তরের পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহারা যেমন এক একটি নূতন দেশ আবিষ্কার করিবার আনন্দ লাভ করিয়াছে, তেমনই লোক-সাহিত্যের প্রয়োগ-ক্ষেত্রটি প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ইহা একটি সম্পূর্ণ অভিনব ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা সাধারণভাবে গ্রহণ করিবার পক্ষে কতকগুলি বাধা ছিল, তাহাদের মধ্যে অনভিজ্ঞতাই প্রধান। আমার এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার কতকগুলি যে দুর্লভ সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাই এই কার্যে প্রয়োগ করিয়া আশাতীত

ফল লাভ করিয়াছি। এ কথা হয়ত অনেকেই জানেন, যে আমি আট বৎসরেরও অধিককাল ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগে লোক-সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ডক্টর ভেরিয়র এলউইনের গবেষণা সহযোগী রূপে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সহ সারা ভারতবর্ষের আদিবাসী গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া এই বিষয়ে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম আমার সেই অভিজ্ঞতা দ্বারাই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগের শিবির-জীবন পরিচালনা করিতে পারিয়াছি বলিয়াই এই কার্যে আমি আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছি। সুতরাং এই অভিজ্ঞতা সকলের থাকিবার কথা নহে এবং স্বভাবতই এই সাফল্য সাধারণভাবেও লাভ করা যাইতে পারে না।

গ্রাম-সমীক্ষা কার্যে অনুরাগ সৃষ্টি হইবার পর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া সংসার এবং কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার পরও এই বিষয়ের প্রতি অনুরাগ পোষণ করিয়া থাকেন এবং অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায় প্রতি বৎসরই গ্রাম-সমীক্ষার কার্যে যখন আমি নিয়মিত ছাত্রছাত্রীর দল লইয়া বাহির হইয়া যাই, তখনই আমার সঙ্গে যোগদান করেন এবং তাহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমার কার্যে নানাভাবে সাহায্য করেন। বর্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীসুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমার তেমনই একজন লোক-সাহিত্য বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগী ছাত্র। যে বৎসর স্নাতকোত্তর বিভাগে লোক-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তন হয়, সেই বৎসরই তিনি এই বিষয়টি তাঁহার স্নাতকোত্তর বিষয়ের পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যথাসময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরও তারপর হইতে প্রতি বৎসর কেবলমাত্র লোক-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বশতঃ গ্রাম-সমীক্ষার কার্যে আমাদের শিবির জীবনে অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়াও এই বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ যে বিন্দুমাত্রও শিথিল হইতে

দেন নাই, বর্তমান গ্রন্থখানি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কারণ, বর্তমান গ্রন্থখানি কোন বই পড়িয়া লেখা বই নয়, চোখে দেখিয়া ইহার প্রত্যেকটি বিষয় লেখা। এই কয়েক বৎসর যাবৎ একটি আঞ্চলিক জীবন-সম্পর্কে নিজের চোখে যাহা তিনি দেখিয়াছেন, তাহাই তিনি এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন। অথচ চোখে দেখা বিষয় লেখার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র নিষ্প্রাণ সংবাদপত্রের বিবরণ মাত্র না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার রচনাকে তিনি সরস এবং সাহিত্য-গুণান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার রচনা হইতে এ কথাও বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনি কেবলমাত্র চোখ দিয়াই দেখেন নাই, হৃদয় দিয়াও বুঝিয়াছেন; অভিনিবেশ সহকারে দুই চোখ খুলিয়া দেখার সঙ্গে সঙ্গে যদি হৃদয় দিয়া বুঝিবার গুণটুকুও যুক্ত হয়, তবেই যে রচনার যথাযথ সার্থকতা, তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন করে না, তাঁহার রচনা সেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। যে অজ্ঞাত জীবনগুলি অবহেলা এবং অবজ্ঞায় প্রতিদিন বিস্মৃতির মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাদেরই সুখ-দুঃখের দুই একটি কথা তিনি তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং সহজাত সহানুভূতি দ্বারা সাহিত্যের এক কোণে ফুটাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন, বনফুলের কমনীয়তায় একদিন যদি ভবিষ্যতের কোন পাঠকের এই পথের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তবেই এই তরুণ গবেষকের স্বপ্ন সফল হইবে; কারণ, ইহার বেশি তাঁহার আর কিছু কামনা আছে বলিয়া জানি না।

এ কথা সত্য, এই গ্রন্থখানির রচনা এবং প্রকাশের জন্য আমিই লেখককে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করিয়াছি। সুতরাং ইহার সাফল্য এবং ব্যর্থতা যাহাই হোক না কেন, তাহার ফলাফল আমাকেও ভোগ করিতে হইবে। গ্রন্থকার যে পথে চলিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা গবেষণার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক নূতন পথ। সাহিত্যে নূতন পথ কেন, সেই বিষয়ে আগে বলিয়াছি যে, লোক-সাহিত্যের আধুনিক পদ্ধতিতে আলোচনা বাংলা সাহিত্যে সবে মাত্র

আরম্ভ হইয়াছে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এই উদ্যম নূতন এইজন্য যে, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র (field) হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কেবলমাত্র তাহার ভিত্তিতে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণাও বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে বিশেষ হয় নাই। কেবল আমারই ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ তুষার চট্টোপাধ্যায় আমার অধীনে এই ভাবেই গবেষণা করিয়া বাংলার লোক-সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি বিষয়ে ইতিপূর্বে 'ডক্টরেট্' উপাধি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই উভয় দিক হইতেই গ্রন্থখানি অভিনন্দন যোগ্য বলিয়া মনে হইবে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লোক-সাহিত্যের আরও একটি মূল্যবান, বিষয়ে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু তাহাতে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সংগ্রহের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং তাঁহার এই গ্রন্থখানি তাঁহাব বাংলা গবেষণার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক দান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

তবে এ কথাও সত্য, গবেষণা বস্তু উপস্থাপনার যে সনাতন একটি রীতি আছে, বর্তমান গ্রন্থকার সেই রীতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজস্ব একটি সরস ভঙ্গিতে ইহার বিষয়-বস্তু পাঠক সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাতে গবেষণা-গ্রন্থ সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের যে একটি ভীতির ভাব আছে, তাহা অতি সহজেই দূর হইয়া যাইবে। তত্ত্বের বিষয়ও যে সরস করিয়া পরিবেষণ করা যায়, কিংবা তথ্যও যে প্রাণরসহীন না হইয়া সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে, বর্তমান লেখকের রচনায় তাহাই বুঝিতে পারা যাইবে। তবে এ কথা সত্য, সাহিত্যের তথ্য আপনা হইতেই সরস ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার সরসতা রক্ষা করিয়া প্রকাশ করিবার দায়িত্ব সকলে সমান পালন করিতে পারেন না, অনেকের রচনায় সাহিত্যের তথ্য এবং তত্ত্বও নীরস তথ্য দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। বর্তমান লেখকের রচনায় তেমন কোন দোষ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া কেহই মনে করিতে পারিবেন না। ইহার কারণ, বর্তমান লেখকের

কবিখ্যাতি আছে; সেইজন্য তাঁহার তথ্যমূলক গদ্য রচনাও কবিতার রসে সিক্ত হইয়াছে।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার যে অঞ্চলটি তাঁহার অনুসন্ধানের ভিত্তি করিয়াছেন, তাহার সংস্কৃতিগত একটি অখণ্ড ঐক্য ছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে সেই ঐক্য নানা ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে। সে কথা অবশ্য এই গ্রন্থে আলোচনার বিষয় ছিল না বলিয়া গ্রন্থকার তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াই নিজের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। তথাপি বিষয়টি এখানে একটু সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ বলিতে পশ্চিম বাংলার যে অংশ বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুর-মানভূমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, লেখক প্রধানতঃ সেই অংশ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এই অঞ্চলে দীর্ঘ কাল সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য সমন্বয় সাধনের প্রয়াস দেখা গিয়াছে। ইতিহাসের কোন্ যুগ হইতে কি ভাবে যে তাহার সূচনা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা না গেলেও পরবর্তী কালে ইহার সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনের ধারায় যে বিভিন্ন পর্বগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কি ভাবে যে সে কাজ সম্ভব হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত যে পথ বিস্তৃত ছিল, তাহা এই অঞ্চলের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল, তারপর মধ্যযুগের ইতিহাসের একেবারে শেষ প্রান্তে আসিয়া দেখা গেল, চৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপ হইতে পুরী যাইতেছেন, তখনও তিনি ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়া পুরীর পথে অগ্রসর হইতেছেন। খৃষ্ট পূঃ যুগে মহাবীর এই অঞ্চলেই জৈনধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, অথচ একথাও সত্য, সেই দেশে এমন লোকও ছিল, যাহারা তখন মহাবীরকে নানাভাবে অপমান করিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাও নহে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে জৈন, বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের প্রভাব স্তরে স্তরে আসিয়া সঞ্চিত

হইয়াছিল। তাহার উপর মধ্যযুগে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে এই সমগ্র অঞ্চলটি বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা প্রবল ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। মৌলিক আর্যেতর ধর্মের উপর এই সকল বিভিন্ন উচ্চতর ধর্মের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল, তাহা আজ আর এই অঞ্চলের জনসাধারণের আধ্যাত্মিক জীবনের ধারা অনুসরণ করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে না, বরং এই অঞ্চলের জনসমাজের অলিখিত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন সন্ধান করিলে ফল লাভ হইতে পারে। কারণ, সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের বহির্মুখী পরিচয় কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে তাহার স্বাক্ষর সে কিছুতেই মুছিয়া দিতে পারে না, তাহার অজ্ঞাতেই তাহার ছাপ তাহাতে পড়িয়া যায়। সুতরাং এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের উপকরণ বিশ্লেষণ করিলেই নিরক্ষর জনসমাজের বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিলুপ্ত উপকরণ সমূহ উদ্ধার করা যাইতে পারে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণ এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্যেরই কোন কোন অংশে প্রস্তরীভূত (fossilized) হইয়া অক্ষয় হইয়া আছে।

এই অঞ্চলের জনসংখ্যার মৌলিক ভিত্তি আদিবাসী সমাজ দ্বারা গঠিত। ইহার আদিম সমাজও একই মানব-গোষ্ঠী হইতে যে উদ্ভূত, তাহা নহে; ইহার প্রধান প্রমাণ এই যে, ইহাতে দ্রাবিড় এবং মুণ্ডা ভাষা উভয়ই ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থই এই যে ইহাতে এই দুইটি ভাষাভাষী জাতির আবির্ভাব এবং শেষ পর্যন্ত তিরোভাব দুইই ঘটিয়াছিল। নিজেদের ভাষার মধ্যে তাহাদের জাতির মৌলিক পরিচয় রাখিয়া গিয়া পরবর্তী কালে ইহারা পরস্পর পরস্পরের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বাহ্যতঃ একাকার হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য এই অঞ্চল হইতে যে সকল লোক-কথা আজও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দ্রাবিড় এবং মুণ্ডাভাষীর সংস্কারের পরিচয় এখনও উদ্ধার করিতে পারা যায়। এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতির আদিবাসী

এবং অর্ধ-আদিবাসীর মধ্যে সর্বশেষ যে ঐক্য সূত্র রচিত হইয়াছে, তাহার প্রেরণা বৈষ্ণব ধর্ম হইতে আসিয়াছে, অন্য কোন দিক হইতে আসে নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার ব্যবধানকে দূর করিয়া দিয়া সামগ্রিক একীকরণ (unification)-এর এক অভাবনীয় শক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যেমন ছিল, অন্য কোন ভারতীয় ধর্মের তেমন ছিল না। সেইজন্য বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিবার পর তাঁহাদের রাজ্যের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় লীলা প্রসঙ্গ প্রচার লাভ করতে লাগল এবং তাহাদের আকর্ষণে এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসী এক অখণ্ড ঐক্য অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। একদিন পরস্পর গোষ্ঠী বা শ্রেণীগত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়াও কেবলমাত্র এক ধর্মমতের আকর্ষণে ইহারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের নিয়মিত গোষ্ঠী-সংগ্রাম, উৎসব অনুষ্ঠানের কৌতুক-সংগ্রামে (mock-fight)-র ক্রীড়ারূপ লাভ করিল। এই অঞ্চলের ছো-নাচে যে এত যুদ্ধ-নৃত্যের অভিনয় হয়, তাহার অর্থই এই যে একদিনের গোষ্ঠী-সংগ্রাম বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তনের পর ধর্মীয় আনন্দানুষ্ঠানের রূপ লাভ করিয়া এই প্রকার যুদ্ধনৃত্যে পরিণত হইয়াছে।

এই অঞ্চলের প্রকৃতি কখনও শ্যামল, কখনও ধূসর, কোথাও সুগভীর অরণ্যানী, কোথাও নিস্তৃণ প্রস্তরভূমি। ইহার নরনারীর প্রকৃতিও সেই অনুযায়ীই গড়িয়াছে। এই সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে প্রকৃতির এই রূপের মধ্যে আর কোন বৈচিত্র্য নাই; সেইজন্য ইহার নরনারীও একই অভিন্ন ধাতুতে গঠিত হইয়াছে। ইহাও সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ। এই সকল কারণেই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি সামগ্রিক এবং অখণ্ড রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। বহির্মুখী প্রাকৃতিক অখণ্ডতা ইহার মানব-সমাজের অন্তর্মুখী অখণ্ডতা সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে। এই

অঞ্চলের লোক-সাহিত্য ইহার অন্তর্মুখী ঐক্যেরই সন্ধান দিয়া থাকে।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার নানা বিষয়ে পার্থক্য আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা একদিন উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলিয়া উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভাব ইহার উপর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত বাংলা উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। পূর্বোক্ত অঞ্চলের উপর উড়িষ্যার প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হইতে পারে না; এমন কি, এই অঞ্চলের প্রভাবও উড়িষ্যাকে একদিন স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কারণ সাংস্কৃতিক জীবনের ইহাই ধর্ম; ইহা যেমন অন্যকে প্রভাবিত করে, তেমনই ইহা দ্বারা নিজেও প্রভাবিত হয়। উড়িষ্যার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সেই সম্পর্কই সৃষ্টি হইয়াছে। এই পথেও উড়িষ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসার হইয়াছে।

গ্রন্থকার তাঁহার এই গ্রন্থে প্রথমেই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের সাধারণ পরিচয় দিয়াছেন, সাধারণ পরিচয় বলিতে ইহার প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রকৃতি এবং অধিবাসীদিগের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিই মনে করা হইয়াছে। তাঁহার এই আলোচনার মধ্য দিয়া এই অঞ্চলটির একটি সামগ্রিক ঐক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া সহজেই মনে হইবে।

গ্রন্থকার বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় সম্পর্কিত কিংবদন্তীটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার আজ আর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই, এ'কথা সত্য, তথাপি ইহা এ'দেশের জনসাধারণের একটি সাধারণ বিশ্বাস বলিয়াই তিনি ইহার উল্লেখ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা হইতেই যেন কেহ মনে না করেন যে লেখক ইহাকেই অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে করেন। কারণ, তিনি তাঁহার গ্রন্থের এই সাধারণ ভূমিকা অংশে সেই শ্রেণীর ইতিহাস

রচনা করেন নাই। তাঁহার পরিবেষিত বিষয়বস্তু এই সকল বিতর্কমূলক বহির্মুখী তত্ত্ব এবং তথ্য নিরপেক্ষ ভাবেই বুঝিতে পারা যাইবে।

গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থটিকে পর্বে পর্বে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রথম পর্বে রাঢ় ও পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের সংস্কৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। এখানেও পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ বলিতে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গই মনে করিয়াছেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের কথা বলেন নাই। তাঁহার প্রথম পর্বের এই আলোচনা কেবল মাত্র সংক্ষিপ্তই নহে, সংস্কৃতির সকল বিষয় অবলম্বন করিয়াও তাহা যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে—তিনি প্রধানতঃ ধর্ম এবং লোকোৎসব সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সেই আলোচনাও সম্পূর্ণ নহে। ইহার কারণ, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ ব্যাপিয়াই এই অঞ্চলের সংস্কৃতির পরিচয় আছে, স্বতন্ত্রভাবে সেই জন্য তাহাকে আর বিস্তৃত আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আপাত দৃষ্টিতে এই কথাও মনে হইতে পারে যে, এই গ্রন্থে এই 'পর্ব' বা অধ্যায়টির কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি সমগ্র গ্রন্থের ভূমিকারূপে ইহার স্থান অনস্বীকার্য।

ইহার পর পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এখানে একটি প্রশ্ন সাধারণ ভাবে সকলেরই মনে হইতে পারে যে, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লৌকিক এই কথাসাহিত্যের কি নিজস্ব কোন রূপ আছে, না ইহা বাংলার সর্বত্র প্রচারিত লৌকিক কথাসাহিত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন? যদি ইহার নিজস্ব কোন আঞ্চলিক রূপ থাকে, তবে তাহা লইয়া স্বতন্ত্র আলোচনার বিশেষ একটি অর্থ থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তাহা না থাকে, অর্থাৎ যদি তাহা বাংলার লৌকিক কথাসাহিত্যেরই অভিন্ন রূপ মাত্র হইয়া থাকে,

তবে একটি বিশেষ অঞ্চলের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে পরিচিত করিবার সার্থকতা কি? বিশেষতঃ এ কথাও ত স্বীকার করিতে হয় যে, একটি বিশেষ অঞ্চলের সামগ্রিক সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও যদি তেমনই সামগ্রিক ভাবে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বিচার করিতে পারা যায়, তবে বিশেষ কতকগুলি লোক-কথা বিশেষ অঞ্চলের বলিয়া দাবী করা যায়, নতুবা সেই দাবীই বা কি ভাবে উপস্থিত করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ নানাভাবে লোক-কথা বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। অনেক সময় তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তির মধ্যে বিস্তার লাভ করে, অনেক সময় তাহা সমগ্র সমাজের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিতে পারে। ব্যক্তির উপর যাহা বিস্তার লাভ করে, তাহা সকল সময় সমগ্র সমাজের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং বিশেষ একটি অঞ্চলের ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে একটি মাত্র কথা সংগ্রহ করিয়াই ইহা সমগ্র সমাজ কিংবা অঞ্চলের বিষয় বলিয়া নির্দেশ করা সমীচীন হয় না। একই অঞ্চল হইতে একাধিক সংগ্রহের মধ্য দিয়া যদি একই লোক-কথার মৌলিক অভিপ্রায় অক্ষুণ্ণ থাকিতে দেখা যায়, তবে তাহা সেই অঞ্চলের কথা বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে। কারণ, এ কথা সত্য, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের রূপকথা ইহার ভৌগোলিক কিংবা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মত ইহার একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি নহে। বহুকালের ঐতিহ্যের রসধারায় ইহারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, এক এক ঘাটে যে আকৃতির ঘটে ভরিয়া ইহার রস আহরণ করা হইয়াছে, সেখানে তাহা সেই ঘটের আকার লাভ করিতেছে, পার্থক্য ঘটের আকারে মাত্র, রস-বস্তু এক এবং অপরিবর্তিত; সুতরাং পশ্চিম সীমান্ত বাংলার রূপকথা বুঝিতে এখানে কেবল ঘটের বহির্মুখী পরিচয়ের কথাই বলা হইয়াছে, ইহার অভ্যন্তরস্থ রস-সংগ্রহের কথা বলা হয় নাই। সেইজন্য দেখা যাইবে, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে যে রূপকথা সংগৃহীত

হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র সারা বাংলা দেশেরই রূপকথা নহে, বরং বাংলার বাহিরেও তাহাদের প্রচলন আছে। শাশ্বত মানবিক আবেদন সৃষ্টি করিয়া, এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের বিশ্বব্যাপী প্রচারও সম্ভব হইয়াছে। বাংলাদেশে লোক-কথা সংগ্রহের কাজ এ পর্যন্ত সর্বত্রই শোচনীয় ভাবে অবহেলিত হইয়াছে। এমন কি ছড়া, গান, গীতিকা (ballad), প্রবাদ ইত্যাদি যে পরিমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, লোক-কথা সেই পরিমাণে কিছুই সংগৃহীত হয় নাই। কারণ, ইহার সংগ্রহের পদ্ধতি একটু বেশি জটিল এবং আপাত দৃষ্টিতে সমাজের উপরিস্তরে ইহাদের অবস্থান অনুভব করা যায় না। লোক-কথা লিখিয়া লইবার জন্য যে ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, কেবল মাত্র আমাদের চরিত্রেই যে তাহার অভাব আছে, তাহা নহে, সেই সুযোগও আমাদের কাহারও নাই। যাহারা লোক-কথা পরিবেষণ করিয়া পল্লীসমাজের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে, সহজে আমরা তাহাদের সন্ধান পাই না, সন্ধান পাইলেও আমাদের এমন অবসর নাই যে ধৈর্য ধরিয়া তাহার কথা আমরা শুনি। এই বিষয়ে আমাদের নিজের একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলি। পুরুলিয়া জিলার মাঠা গ্রামে যখন আমরা সংগ্রহ-শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম, তখন সেখানে একজন নিরক্ষর কথাকোবিদের সন্ধান পাইয়াছিলাম। কথার ভাণ্ডার যেমন তাহার অফুরন্ত, কথা বলিবার ভঙ্গিও তাহার তেমনই সরস। কথা লিখিয়া লইবার আমাদের আগ্রহ দেখিয়া সেই ব্যক্তি, যে কথা সংক্ষেপে শেষ করা যায়, তাহাও অত্যন্ত দীর্ঘ করিয়া ধীরে সুস্থে বলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার কোন তাড়া ছিল না, কিন্তু আমাদের তাড়া ছিল; সেইজন্য তাহাকে সংক্ষেপে বলিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, তখন বিরক্ত হইয়া আমাদের সংগ্রাহকেরা তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার উদ্যম শিথিল হইল না,

সে আমাদের সংগ্রাহকদিগের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া যখনই সুযোগ পাইতে লাগিল, তখনই তাহার গল্প শুনাইতে লাগিল। আমাদের সংগ্রাহকেরা তাহার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল; আমাদের নির্দিষ্ট দিন শেষ হইয়া গেল, আমরা সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু সেই বাহাত্তর বৎসরের বৃদ্ধের স্মৃতি ভাণ্ডার হইতে এক কণাও আমরা সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে আনিতে পারিলাম না। আমাদের শহরের লোকের অবসর নাই, অথচ অবসর না থাকিলে পল্লীজীবনের অবসর বিনোদনের জন্য একদিন যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সংগ্রহ কিংবা রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না। বিরামহীন ঘূর্ণীচক্রের মধ্যে যাহাদের জীবনের গতি বাঁধা হইয়া আছে, তাহারা স্থির পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া থাকিলেও তাহাকে ঘূর্ণ্যমান বলিয়া দেখিবে, আমাদের নিকট পল্লীসাহিত্যের মূল্যও আজ তাহাই হইয়াছে।

লোক-কথা যাহারা পরিবেষণ করে, তাহাদের বলিবার ভঙ্গি এবং ভাষার মধ্যেও ইহার বিশেষত্ব প্রকাশ পায়; সুতরাং ইহাদের যে লিখিত রূপ সংগৃহীত হয়, তাহাদের মধ্যে ইহার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু লোক-কথা রস-রূপে প্রকাশ করা বর্তমান গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে, ইহার মধ্যে যে সকল তত্ত্ব কিংবা তথ্য আছে, তাহা যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের গুরুত্বের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই লেখকের উদ্দেশ্য। নতুবা আমাদের দেশে এখনও এমন ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, লোক-কথা শিশু-সাহিত্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা তাহা নহে, লোক-কথার অন্তর্গত রূপকথাই হোক, উপকথাই হোক কিংবা ব্রতকথাই হোক, ইহাদের কোন বিষয়ই শিশুপাঠ্য নহে; ইহাদের মধ্যে জীবনের গভীরতর দিকটিও বার বার ইঙ্গিতে আভাসে কিংবা রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। লেখক ইহাদের মধ্য হইতে যে

সকল তত্ত্ব উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিলেই ইহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্ত্বের ব্যাখ্যা সর্বত্রই যে সর্বজন গ্রাহ্য হইবে, তাহা নহে। ইহা খুব বড় কথা নহে, ব্যাখ্যার নির্ভুলতার উপর এই শ্রেণীর রচনার গুরুত্ব নির্ভর করে না ; ব্যাখ্যাগুলি হইতে এই কথাই বুঝিতে পারা যাইবে, লোক-কথাগুলি যে সমাজ-মানসে স্থায়িত্ব লাভ করে, তাহা ইহাদের নিজস্ব কতকগুলি গুণেই সম্ভব হয়, এই গুণ না থাকিলে ইহারা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন বলিয়া পরিত্যক্ত হইত।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা প্রধানতঃ অরণ্যভূমি ; সেইজন্য এই অঞ্চলের লোক-কথায় পশুপক্ষীর কাহিনী বা উপকথার সংখ্যা অধিক থাকিবে, ইহাই সাধারণ ভাবে মনে হইতে পারে। যতদিন পর্যন্ত এই অঞ্চল হইতে লোক-কথার সংগ্রহ সম্পূর্ণ না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত এই বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা যে কি, তাহা বলিতে পারা যাইবে না। তবে এ পর্যন্ত যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলা দেশের সর্বত্র প্রচলিত সুপরিচিত উপকথাগুলিও এখানে অপরিচিত নহে। অবশ্য ইহার অন্য কারণ থাকিতে পারে। বহুকাল যাবৎ লোক-কথার নানা শ্রেণীর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, কিছু কিছু নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে তাহা পাঠ্যভুক্তও হইতেছে। ইহাদের ভিতর দিয়া কতকগুলি কাহিনী জনসমাজে অন্য ভাবেও প্রচার লাভ করিয়াছে। অন্য ভাবে অর্থ, যে ভাবে সাধারণতঃ লোক-কথা প্রচার করিয়া থাকে, সে ভাবে নহে। এই ভাবে যাহা প্রচারিত হয়, তাহা প্রচারের কোন নীতি কিংবা সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে না। সুতরাং ইহাদের সম্পর্কে নিয়মের কথা কিছু বলাও যায় না ; সেই শ্রেণীর কথাকে সাধারণ আলোচনার বহির্ভূত ধরিয়া লইতে হয়। তবে যে

অঞ্চলটির বিষয় বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে খুব ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার হয় নাই; সেইজন্য ইহার মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনেকখানি রক্ষা পাইবারই কথা। সুতরাং এই ভাবে বহিরাগত লোক-কথার সংখ্যা এখানে নগণ্য বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে।

গ্রন্থকার পশ্চিম সীমান্ত বাংলার ব্রতকথা নামেও এই গ্রন্থে একটি সুদীর্ঘ অধ্যায় যুক্ত করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে ভাদুগানের কথা বিস্তৃত উল্লেখ করিয়াছেন। ভাদুগানে একটি কথা থাকিলেও তাহা ব্রতকথা নহে, ভাদুর ব্রত বলিতেও বিশেষ কিছু নাই, যাহা আছে, তাহা ভাদুর গান। সুতরাং এখানে তিনি ব্রতকথাটি একটু ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্রতকথার নাম ধরম-করম ব্রতের কথা; বিভিন্ন সংগ্রাহকের রচনা হইতে তিনি ইহা বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা দেশের অন্যত্র যে সকল ব্রতকথা প্রচলিত আছে, তাহাদের সঙ্গে ধরম-করমের ব্রতকথার কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে। তথাপি আদিম জাতির উপকরণের সঙ্গে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের সাংস্কৃতিক উপকরণ মিশ্রিত করিয়া যে কি অভিনব সামগ্রী গঠিত হইতে পারে, ইহা তাহার প্রমাণ রূপ গ্রহণ করা যায়। সেই দিক দিয়া ধরম-করম ব্রত কথাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। লেখক তাহার কিছু কিছু বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন। লেখক ইতুব্রত এবং উমনা-ঝুমনার কথাব্রতও উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বিচ্ছিন্নভাবে বাংলার কেন্দ্রীয় অঞ্চল হইতে পশ্চিম সীমান্ত বাংলা অঞ্চলে নীত হইয়া থাকিলেও, ইহাদের সঙ্গে স্থানীয় জন-সমাজের বৃহত্তর যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লৌকিক উৎসব গো-পূজার উৎসব, তাহাকে গ্রন্থকার গো-ব্রত বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন। প্রকৃত ব্রত বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে ; ইহা প্রধানতঃ উৎসব, ইহাতে পূজারও স্থান আছে। গো-মাহাত্ম্য বিষয়ক এক বিপুল এবং সমৃদ্ধ গীতি-সাহিত্য এই উপলক্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে।

লোক-গীতি (folk-song) পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সীমায়িত আলোচনার মধ্যে এই বিষয়ের যথার্থ মর্যাদা দান করা অসম্ভব। তথাপি যতদূর সম্ভব লেখক তাঁহার নিজস্ব সংগ্রহ অবলম্বন করিয়া বিষয়টির হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন।

সংগ্রহের অভাবে লোক-সাহিত্যের কয়েকটি বিষয় এই গ্রন্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে, যেমন প্রবাদ, পুরাকথা (myths) এবং ইতিকথা (legends)। ইহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইলে যে ধৈর্য এবং অবসরের প্রয়োজন, তাহা সর্বদা পাওয়া যায় না। সেইজন্য কেবলমাত্র সাহিত্যের ভিতর হইতে আমাদের ভাষায় ইহাদের সংগ্রহ হইয়াছে, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে তাহার কিছু মাত্র সংগ্রহ হয় নাই। কিন্তু তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহাদের মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা লোক-সাহিত্যের অন্য কোন বিষয় অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ এবং আলোচনা রূপে বর্তমান গ্রন্থখানি সকল দিয়া সম্পূর্ণ না হইলেও, ইহা বাংলা দেশের লোক-সাহিত্যের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সম্পর্কে যে নূতন আলোকপাত করিয়াছে, তাহা অভিনন্দনযোগ্য। পাঠক ইহার ভিতর দিয়া লোক-সাহিত্য সম্পর্কে প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন, তাহা নিশ্চিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ভারতীয় ভাষা বিভাগ

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

নিবেদন

লোক-সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা অঞ্চলে গিয়েছিলাম—গ্রামজীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের জন্য। আমি গ্রামেরই ছেলে—গ্রামে আমার জীবনের অনেকখানি সময় কেটেছে। কিন্তু সেই গ্রামজীবনকে ও তার সংস্কৃতিকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে নিরীক্ষণ করে—তার থেকে সমগ্র জাতির জীবনরস কিভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে—তার বৈজ্ঞানিক ও সমাজতত্ত্ব-সম্মত পদ্ধতিই বা কি, সে বিষয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে বসে বক্তৃতা শুনে আর যাই হোক, কোন উপলব্ধি হয় নি। কিন্তু যখন প্রকৃতির উদার সভার মাঝখানে গিয়ে হাজির হলাম—অশিক্ষাজীবিত ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষগুলার কাছে গিয়ে বসলাম, জীবনে জীবন যোগ করার প্রকৃত তাৎপর্য অনুভব করলাম, তখন বুঝলাম যে বিদ্যালয়ের ও ও লাইব্রেরীর মধ্যে অধীত বিদ্যা আর এখানে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার কি ভয়ঙ্কর পার্থক্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লোক-সাহিত্য শাখার ছাত্র হিসাবে বুঝতে পেরেছিলাম যে লোক-সাহিত্যের পড়া সম্পূর্ণ সার্থক হবে তখনই যখন এর উপকরণ-বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ তার উৎসের ক্ষেত্রে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে যাচাই—অন্বেষণ—বিচার করা সম্ভব হবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত লোকশ্রুতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই বক্তব্য আমাদের সামনে হাজির করে স্বয়ং উদ্যোগী হলেন যাত্রার ব্যবস্থা করতে, স্থান নির্ণয়ও করলেন তিনিই। আমরা উদ্যোগী হয়ে এক অভিনব অভিজ্ঞতার আশায় নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করলাম। গিয়ে যা

দেখলাম—যা শুনলাম—যা শিখলাম তা অতুলনীয়। অযোধ্যা পাহাড়ের নির্মম রুক্ষ প্রকৃতির মাঝখানে জীবনরসের ফল্গুধারাকে সুপ্ত দেখলাম, আবিষ্কার করলাম লোকজীবনের সাহিত্যকে।

এরপর বাংলার পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আরও অনেক জায়গায় গিয়েছি; যেমন, বাঁশপাহাড়ী, ডোমজুড়ি, হাতিবাড়ী, কুইলাপাল অর্থাৎ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে। সেখানকার প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে অভিজ্ঞতা এবং উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু তা দিয়ে যে এখনই কোন গ্রন্থ রচনা করবো এবং ছাপা হয়ে বেরুবে, তা আমার মনের মধ্যে আদৌ স্থান পায় নি। এমন সময় আমার লোক-সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ের শিক্ষা এবং দীক্ষাগুরু প্রখ্যাত লোকশ্রুতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় 'লোকশ্রুতি' নামে একটি ত্রৈমাসিক লোক-সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করেন এবং তার প্রথম সংখ্যার জন্যে আমার কাছে লেখা চাইলেন। আমি পর পর তিনটি সংখ্যাতেই লেখা দিলাম। এবং সবগুলিই আমার ঐ গ্রাম-সমীক্ষাভিত্তিক রচনা। সকলেই এই ধরণের রচনায় উৎসাহ দিলেন এবং শ্রদ্ধেয় ডঃ ভট্টাচার্য দিলেন এক অভিনব প্রেরণা যা আমাকে উদ্বুদ্ধ করলো সমগ্র অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে গ্রন্থ রচনা করতে। একদিন আমার এই বাসনা প্রকাশ করলাম অগ্রজ-প্রতিম অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্রের কাছে। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতা নিয়ে আমার বাসনাকে একটি পরিকল্পনা ও কার্যসূচীর মাধ্যমে বর্তমান গ্রন্থের আকার দিলেন। তিনিই উৎসাহের সঙ্গে এবং সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে তাকে ছাপাবার ব্যবস্থাও করলেন। আমি অতি দ্রুত সমস্ত লেখাটির প্রেস কপি তৈরী করে তাঁর হাতে পৌঁছে দিলাম।

বিরাট বাংলা দেশের সামান্যতম অংশে সমীক্ষা চালিয়ে যতটুকু উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে তার পরিমাণ বিশাল—তা দিয়েই বর্তমান গ্রন্থের বহুগুণ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করা যায়। তা না করে আমি দক্ষিণ-

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের মাত্র কয়েকটি গ্রাম সমীক্ষায় লোক-সাহিত্যের যতটুকু উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছিল তারই একটা অংশ দিয়ে উৎস ও অভিপ্রায় (motif) বিচার করেছি। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রধান যে বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা হচ্ছে পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের লোক-সাহিত্যের উৎসে আছে আদিম প্রেরণা ও অভিপ্রায় এবং বিষয়বৈচিত্র্যে আছে পৃথিবীর তাবৎ লোক-সাহিত্যের সঙ্গে এর সংযোগ।

আমার এই স্বল্প-পরিসর আলোচনায় পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের লোক-সাহিত্যের সব কয়টি প্রধান বিষয়কেই আমি সমাজতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি। এ ধরণের প্রচেষ্টা আমাদের দেশে খুব বেশী হয়নি—তাই বহু ক্ষেত্রেই আমাকে আমার ব্যক্তিগত বিচার এবং নিরীক্ষণ ক্ষমতার উপরই নির্ভর করতে হয়েছে।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত লোক-সঙ্গীত, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতির অধিকাংশই আমি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম থেকে স্বয়ং সংগ্রহ করে এনেছি। অবশ্য অপরাপর গবেষক ও সংগ্রাহকগণের সংগ্রহ থেকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়েছি, এজন্য এ বিষয়ে তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। এই সঙ্গে 'পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদে'র সভ্য-সভ্যাগণের কাছেও আমার ঋণ অপরিসীম—কারণ তাদের সঙ্গেই প্রতিটি গ্রাম সমীক্ষায় আমি গিয়েছি—সংগ্রহ করেছি—আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছি। অনুজাতুল্যা শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য এম. এ. কুইলাপাল গ্রামের সংগ্রহকার্যে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., ডি. ফিল. মহাশয় আমাকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়ে এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, তাঁকে আমার অন্তরের প্রণাম জানাই। 'বিশ্বভারতী লোক-শিক্ষা সংসদে'র হাওড়ার কেন্দ্র-কর্তা

শ্রীতারাকালী বসু, কোলকাতার বিখ্যাত ও রুচিবান তরুণ পুস্তক ব্যবসায়ী শ্রীমলয়েন্দ্রকুমার সেন, সতীর্থ অধ্যাপক ডঃ শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদার, শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীদুলাল চৌধুরী, শ্রীনারায়ণ ইন্দ্র ও শ্রীবলাই মণ্ডলকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করায় আমার অন্তরের প্রীতি জানাই। এই সুযোগে শ্রদ্ধা নিবেদন করি আমার দুই কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং ডঃ ননীগোপাল চৌধুরী মহাশয়কে, কারণ তাঁদের সস্নেহ উৎসাহ দান আমার গ্রন্থ রচনায় বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আমার স্ত্রী শ্রীঅনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. এই গ্রন্থের প্রেস কপি তৈরী করে দিয়েছেন—তিনি আমার ধন্যবাদার্হ।

পূর্বেই বলেছি যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি. এইচ. ডি. মহাশয়ের স্নেহানুকূল্য, নির্দেশ, উপদেশ ও তত্ত্বাবধান ব্যতীত এই গ্রন্থ রচনা করা আদৌ সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। এই গ্রন্থের সূচনায় তিনি যে মূল্যবান পরিচায়িকা লিখে দিয়েছেন তা আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহেরই পরিচায়ক। তাঁকে আমার অন্তরের ভক্তিনম্র প্রণাম নিবেদন করি। পরিশেষে, আমি যে সমস্ত গ্রামে গিয়েছি সেই সমস্ত গ্রামের আপামর অধিবাসীকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই—কারণ গ্রামের সেই সকল সরল, নিরক্ষর জনসাধারণই আমার লোক-সাহিত্য-রত্নের আকর। আমার সাফল্য তাঁদেরই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছার দান।

শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ,
হাওড়া গার্ল কলেজ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

*

পশ্চিম সীমান্ত-বঙ্গের

লোক-সাহিত্য

উৎস ও অভিপ্রায়

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের লোক-সাহিত্য

যাঁরা নিজেকে গ্রন্থকার বলিয়া লোক-সাহিত্যের

উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের লোক-সাহিত্য



চড়ক মেলার থানে পাট পূজা—বাঁশপাহাড়ী, বাঁকুড়া।

ফটো—অধ্যাপক সনৎ মিত্র



পশ্চিম বাংলার একটি গ্রাম্য পূজার থান—বৃক্ষের পাদমূলে লৌকিক দেবদেবীর পূজা ঘট : ডান দিকে একটি সিজ মনসার বৃক্ষ দেখা যাইতেছে।

ফটো—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।



ছো-নাচের মুখোস নির্মাতা শিল্পী সুচাঁদ সূত্রধর, ডান হাতে তাহার নির্মিত একটি মুখোস, বাম বাতে তাহার প্রাপ্ত একটি সরকারী অভিজ্ঞান পত্র। চোড়দা গ্রামে গৃহীত আলোকচিত্র।

আলোকচিত্র— অধ্যাপক সনৎ মিত্র

সূচনা

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের সাধারণ পরিচয়

॥ এক ॥

প্রাচীন বঙ্গের কথা : গল্প দিয়েই শুরু করা যাক্। সেই পুরানো সুর। এক রাজা আর এক রাজকন্যা। বঙ্গদেশের এক রাজা বিবাহ করেন কলিঙ্গের এক রাজকন্যাকে। বিয়ের পর রাজা রাণীকে নিয়ে যখন মগধ যাচ্ছেন এমন সময় পথে লাঢ় অর্থাৎ রাঢ় দেশের বনে এক সিংহ এসে রাণীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। ঐ সিংহের গুহায় রাণীর সাংবাহু বা সিংহবাহু নামে এক পুত্র ও সীহসীবলী নামে এক রাজকন্যা জন্মে। পুত্র কন্যা নিয়ে পালিয়ে এসে ঐ রাণী বঙ্গদেশের এক সেনাপতিকে বিয়ে করেন। পরে বঙ্গরাজ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে মন্ত্রীগণ সীহবাহুকেই রাজা হতে অনুরোধ করেন। সীহবাহু তাঁর বিপিতাকে রাজ্যে বসিয়ে রাঢ় দেশে চলে যায়। রাঢ় দেশে সাহবাহু সীহপুর নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা কোরে, এক নব রাজ্যের সূচনা করে এবং নিজ ভগ্নী সাহসীবালীকে বিয়ে করে। ক্রমশঃ বহু পুত্রের জনক হয় সীহবাহু। এই পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ছিল বিজয়।

বিজয় কুসঙ্গে পড়ে রাজ্যের প্রজাদের উপর নানা অত্যাচার করতে লাগলো। রাজা ও রাণী বহু চেষ্টা করলো বিজয়ের পরিবর্তনের জন্যে। কোন ফল হোল না পরিশেষে বিজয় ও তার সাতশত সঙ্গীর মাথা অর্ধেক মুড়িয়ে স্ত্রী-পুত্র সহ এক জাহাজে চড়িয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলো। বিজয় ও তার সঙ্গীরা ভাসতে ভাসতে অবশেষে একদিন লঙ্কা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলো।

বুদ্ধদেবের আদেশে বিজয়কে রক্ষা করা ও লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার ভার প্রাপ্ত হলেন শক্র। বিজয় ওদিকে যক্ষগণকে পরাস্ত

করে লঙ্কা দ্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো। বিজয়ের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশ থেকে তার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসুদেব লঙ্কার রাজা হলো। এরূপে লঙ্কাদ্বীপে বাঙালী রাজবংশ পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করে। এবং সিংহবাহুর নামানুসারে লঙ্কার নাম হয় সিংহল।

সিংহল দেশীয় মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থে উল্লিখিত আখ্যানটি পাওয়া যায়। খুব বেশী একটা ঐতিহাসিক সত্য না থাকলেও কয়েকটি কারণে উপরোক্ত কিংবদন্তিটি উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে রাঢ় দেশের উল্লেখ। গুপ্ত যুগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার ধারাবাহিক পরিচয় খুব অল্পই মেলে।

ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পূর্ব অঞ্চলের যে উল্লেখ দেখা যায় তাতে বলা হয়েছে যে বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদ জাতি পক্ষীকল্প অর্থাৎ তারা পাখীর মত অস্ফুট ভাষায় কথা বলে ও যাযাবর। পণ্ডিতগণ অনুমান করে এই বঙ্গ মগধ ও চেরপাদের জনগণ পূর্ববঙ্গ মগধ, পশ্চিম বিহারের কোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত চেরজাতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি গল্প আছে:

ঋষি বিশ্বামিত্র 'শুনঃশেপ' নামে এক ব্রাহ্মণ বালককে স্নেহ বশে যজ্ঞ বলি থেকে উদ্ধার করে তাকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ঋষির পঞ্চাশজন পুত্র পিতার এ কর্মের বিরোধিতা করলে ঋষি অভিশাপ দেন যে তাদের সন্তান-সন্ততিগণ পৃথিবীর শেষ সীমা অধিকার করবে। তাদের সন্তানগণই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, জুলিয়াৎ ও মুতির নামে পরিচিত।[1]

মহাভারতের আদিপর্বে অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের যে গল্প আছে তা উপরোক্ত গল্পটিকেই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়। গল্পটি এই: ঋষি দীর্ঘতমস বলির স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি সন্তান উৎপাদন করে'— অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম; এরা যে যে দেশে বাস করেছিল সেই নামানুসারে সে দেশের পরিচয় হয়েছে। কিন্তু এসব কিংবদন্তী ও আখ্যান ঐতিহাসিকদের নিকট খুব বেশী একটা গ্রাহ্য নয়।

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭

খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন বাংলাদেশ যে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল তার উল্লেখ করেছেন গ্রীক্ লেখকগণ 'গঙ্গারিড' নামে। এই 'গঙ্গারিডে'র অধিবাসী যে বাংলাদেশের অধিবাসী এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুব কম।

॥ দুই ॥

জনপদ: বাংলাদেশের ইতিহাসকার ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস : আদি পর্বে' বাংলাদেশের সীমানির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'উত্তরে হিমালয় এবং নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য ; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা ; উত্তর-পশ্চিমদিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি ; পূর্বদিকে গারো খাসিয়া—জৈন্তিয়া—ত্রিপুরা—চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত: পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্ঝর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমা-বিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ় সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি, সমতটবঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল প্রভৃতি জনপদ ; ভাগীরথী, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদী, বিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্ম-ভূমি।' [পৃঃ ৮৬]

আবুল ফজল তার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সবপ্রথম 'বাঙলা' শব্দটি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা হয়েছে। আল বলতে ক্ষেতেরই আল বোঝায় তা নয়, ছোটখাট বাঁধও আলের পর্যায়ে পড়ে। জল-বৃষ্টি-বন্যার দেশ এই বাংলায় ক্ষেতখামার রক্ষার জন্য বাঁধ এবং আলের প্রয়োজন। এই বাঁধ বা আলের সংখ্যাধিক্যের জন্যই আবুল ফজল বঙ্গাল শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

বাংলাদেশ বলতে এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের এক বিরাট পটভূমিকা ভেসে ওঠে। কবির ভাষায় বলা চলে,

'বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুকমালা,
ভালে কাঞ্চনশৃঙ্গমুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোলভরা যার কনকধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী-অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শতভরঙ্গ ভঙ্গে—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।'

ওপরদিকে শ্বেতশুভ্র রজতময় ধ্যানগম্ভীর দেবতাত্মা হিমাচল শ্রেণী আর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোটবড় পাহাড় পর্বত। মধ্যস্থলে একদিকে গঙ্গার সরস পলিমাটি দিয়ে গড়া বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল। আর একদিকে রুক্ষ কঠোর শিলাকীর্ণ প্রান্তর। পদতলে তরঙ্গলাঞ্ছিত বিরাট সমুদ্র।

প্রাচীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমা বহুবার পরিবর্তিত হলেও ভৌগোলিক দিক থেকে তিনটি অঞ্চল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। যথা ১। **বঙ্গ**—এর সীমানা ছিল পশ্চিমে ভাগীরথী উত্তরে পদ্মা, পূবে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র। ২। **বারেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ**—পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী ছিল বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী ও পাবনা জেলার বুক জুড়ে। ৩। **রাঢ় অঞ্চল**—অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগ। এছাড়াও বজ্রভূম, গৌড় ইত্যাদির নামও উল্লেখযোগ্য।

॥ তিন ॥

রাঢ় ও পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গ: প্রাচীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক উক্ত বিভাগের মধ্যেই আবার রাঢ় দেশের দুটি রাষ্ট্র-বিভাগ ছিল: বর্ধমানভুক্তি ও কঙ্কগ্রামভুক্তি। বর্ধমানভুক্তির তিনটি বিভাগ ছিল: উত্তর-রাঢ়, দক্ষিণ-রাঢ়, পশ্চিম-খাটিকা। পাল ও সেন আমলে

দণ্ডভুক্তিমণ্ডল অর্থাৎ দাঁতন পর্যন্ত বর্ধমানভুক্তির সীমা বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম খাটিকা গঙ্গার পশ্চিম তীরের মোটামুটি বর্তমান হাওড়া জেলা। বর্তমান মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার অধিকাংশ এবং সাঁওতাল পরগণারও কিছুটা কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল। কঙ্কগ্রাম কারও মতে রাজমহলের কাছাকাছি কাঁকজোল, কারও মতে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার কাগ্রাম। রাঢ়ের উত্তরাংশে বজ্রভূমি। পরে এই অঞ্চল উত্তর রাঢ় নামে পরিচিত। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশে, সমগ্র বীরভূম, বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমা—এই নিয়ে উত্তর রাঢ়। আর প্রাচীন সুহ্ম দেশ বলতে বোঝাত মেদিনীপুর থেকে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত সীমানা অর্থাৎ বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর হুগলী ইত্যাদি। বর্তমান গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল বলতে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াকেই বলা হয়েছে।

লাঢ় থেকেই এসেছে রাঢ় কথা। এ অঞ্চলের মাটির মত এ অঞ্চলের লোকও রুক্ষ-কঠোর, রূঢ় এবং কর্কশ। এবং সেজন্যই বোধ হয় এ অঞ্চলের নাম হয়েছে রাঢ় দেশ। এদেশের অধিবাসীদের আচরণ যে চোয়াড়ে একথা জানতে পারা যায় বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন মহাবীর ধর্মপ্রচার করতে এদেশে এসেছিলেন তখন তাঁর পিছনে ছু ছু করে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় প্রাচীন রাঢ় অঞ্চল জঙ্গলাবৃত ছিল এবং তার অধিবাসী ছিল অনার্য আদিম জনগণ।

॥ চার ॥

প্রাকৃতিক পরিচয়: মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে গুজরাট নগর পত্তনের সময়ে বন কর্তণের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তা হচ্ছে এই,

'মহাবীর, হাতে গাণ্ডী ফিরয়ে কাননে।
বন কাটে বেরুনিয়া জনে ॥

শর নল-খাগড়া ইকড়ি টাঙ্গ,
ওকড়া ধুতুরা কাটে আপাঙ্গ,
আকড়া কাটে লিয়লি সিয়লি।'

অথবা

'আমড়া বহেড়া হরিডা ধব
শুকনা কাননে মেজাইল দব
সরল ছাড়ি কাটিল সামলা।
তেফল কাফল করঞ্জাবন
করন্দি মহিন্দি কাটে আসন
এরণ্ড মামুড়ি কাটিল বাবলা।'

প্রাচীন রাঢ় অঞ্চল যে একদিন কিরূপ জঙ্গলাবৃত ছিল তার পরিচয় আছে এইসব প্রচীন গ্রন্থে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীচৈতন্যের যাত্রা-পথের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই,

'প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাইনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ নাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে 'কৃষ্ণ' বলে, নাচে মত্ত হৈয়া॥'

একদিকে ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণার ছোট ছোট পাহাড়, শিলাময় পার্বত্যভূমি, কাঁকুরে লাল মাটি, ঘন জঙ্গল, অন্যদিকে সুজলা-সুফলা বাংলার গাঙ্গেয় পলিমাটি উর্বর সমভূমি অঞ্চল। মাঝখানে না-ভূমি না-জল অংশের মত না-সমভূমি, না-পার্বত্যভূমি রাঢ় অঞ্চল তাই মেদিনীপুর আর বীরভূমের উঁচুনীচু পার্বত্যভূমি, লাল কাঁকর আর পাথরে মেশানো রুক্ষ মাটি, গভীর জঙ্গলে শাল, পিয়াল, মহুয়া পলাশ, আমড়া, শিরীষ ইত্যাদির বন। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়, পাথুরে জমি শালের গভীর বন আর পুরুলিয়ার

পঞ্চকোট, বাগমুণ্ডি, বানশা, কঁচ পাহাড় এবং চাণ্ডিল পাহাড়, পাথুরে নীরস অনুর্বর মাটি, গভীর জঙ্গল সব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়ের প্রকৃতি মিশ্র প্রকৃতি। একদিকে রুক্ষতা এবং কঠোরতা অন্যদিকে সরসতা আর কোমলতা, একদিকে অনুর্বর নীরসতা অন্যদিকে সবুজের সমারোহ—অদ্ভুত এই রাঢ়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ।

'বীর' কথার অর্থ জঙ্গল। বীরভূম মানে জঙ্গলভূম। ঝাড়গ্রাম, শালবনী, বাঁশপাহাড়ী, হাতীবাড়ী ইত্যাদি নামের মধ্যে জঙ্গলের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। ডঃ সুকুমার সেন ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরামের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে 'বাংলা সাহিত্যের কথার' একটি জায়গায় বলেছেন, "আড়ুই গ্রাম পিছনে ফেলিয়া বাসা গ্রাম ডাইনে রাখিয়া তিনি ঘরমুখে যে পথ ধরিলেন তাহা সোজা কিন্তু দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল।

অড়ুয়্যা করিল পাছে ডানি দিকে বাসা।
পুরানো জাঙ্গালে নাঞি জীবনের আশা॥

পুরাতন জাঙ্গাল ধরিয়া কিছুদূরে গিয়া রূপরাম পথ হারাইলেন এবং দিশাহারা হইয়া পলাশবনেব বিলে ঘুরিতে লাগিলেন। একবার উপরে চাহিয়া দেখিলেন আকাশে দুইটা শঙ্খচিল উড়িতেছে, নীচে চোখ নামাইয়া দেখেন, 'দুটা বাঘ দুদিকে বসিয়া নেজ নাড়ে।' দেখিয়াই রূপরাম ভয়ে দৌড় দিলেন এবং 'গোটা দুই আছাড় খাইল গোপাল দিঘির পাড়ে।'" [পৃঃ ১০৯]

পুরানো জাঙ্গালে পথ হারানো, দুটো বাঘের লেজ নাড়া, শুকনো জমিতে আছাড় খাওয়া—রূপরামের জীবনের এইসব ঘটনাগুলি রাঢ়ের রুক্ষ পার্বত্যজঙ্গলময় শ্বাপদসঙ্কুল ভূমিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

যুগযুগান্তর ধরে বাঙলার নানা পরিবর্তন হলেও ভূ-প্রকৃতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। পশ্চিম বাঙলার এই রাঢ় অঞ্চল যা রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণ থেকে প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলটি গভীর শালবন, পার্বত্য আকরিক ও কয়লার সম্পদে

পরিপূর্ণ। এটি একান্তভাবেই পর্বত সঙ্কুল, জঙ্গলাকীর্ণ, জনহীন, রিক্ত, অনুর্বর প্রান্তর। রাজমহল, সাঁওতালভূম মানভূম, সিংভূম, বীরভূমের পূর্বদিকের মালভূম এই পার্বত্যভূমির মধ্যে।

এরই পূর্বদিকে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া. মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশ পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিক প্রান্তর। দক্ষিণ রাঢ়ের রাণীগঞ্জ আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, মেদিনীপুরের শালবনী-ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুরের বনজ অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, পুরুলিয়ার পঞ্চকোট, বাগমুণ্ডি পাহাড়। এই পার্বত্য অঞ্চলের বুক চিরে প্রবাহিত হচ্ছে ময়ূরাক্ষী, দামোদর রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, শিলাই, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, হলদি প্রভৃতি নদনদী। এদেরই পলিমাটিতে গড়ে উঠেছে এ অঞ্চলের কিছুটা শস্যশ্যামল প্রান্তর।

ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিম তীরবর্তী সব নদনদীরই উৎস হ'ল ছোটনাগপুরের মালভূমি। ময়ূরাক্ষী রাজমহল পাহাড়ের উৎস থেকে জন্মলাভ করে সাঁওতাল পরগণার ডুমকায় পৌঁচেছে। দ্বারকেশ্বর—মানভূমের উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হয়ে শুশুনিয়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে বাঁকুড়ায় পৌঁচেছে; পরে তা হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার পাশ দিয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করে ঘাটালের কাছে নাম নিয়েছে রূপনারায়ণ। এখানেই রূপনারায়ণের সঙ্গে মিশেছে শিলাই, মানভূমের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে। সুবর্ণরেখা প্রবাহিত হয়েছে বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্য দিয়ে। দামোদর কথাটি এসেছে 'দা-মুণ্ডা' থেকে। একথার অর্থ হল মুণ্ডাদের জল। এই নদী ছোটনাগপুর, হাজারীবাগ, মানভূমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ও বর্ধমানের সীমানির্দেশ করে, বর্ধমান-হুগলীর মধ্যে দিয়ে ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া, ভূপ্রকৃতি, নদনদী ইত্যাদি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূমের মালভূমি

থেকে উৎপন্ন সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের নদনদী গঙ্গার শাখা ভাগীরথী-হুগলীতে এসে মিশেছে। এর থেকেই একদিকে অনার্য-নিষাদ সংস্কৃতি অন্যদিকে আর্য সংস্কৃতির মিলন বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে পড়েছে। এছাড়া রাঢ় অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির একদিকে যেমন আপাতরুক্ষতা ও আপাত-সরসতা ও অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টি হয়েছে সাঁওতাল, ওঁরাও মুণ্ডা ভূমিজ প্রভাবিত নমঃশূদ্র, বাউরী বাগদী, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নজাতি—অপর দিকে তেমনি বৈদিক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের জাতি। তাই রাঢ় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, তার নদনদীর উৎস, সব কিছু থেকেই এর মিশ্র সংস্কৃতির রূপটি সুপরিস্ফুট।

॥ পাঁচ ॥

অধিবাসী: বাংলাদেশের দ্বার প্রান্তে রাজমহল পাহাড়। বনে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই পার্বত্যভূমিতে কুটীর বেঁধে বাস করে পাহাড়ী জাতের মালেরা। 'মাল' কথার দ্রাবিড়ি অর্থ পাহাড়ী। নাক চ্যাপটা, গায়ের রঙ কুচকুচে কাল, বেঁটে খাটো চেহারা। সিংহলে ভেড্ডাদের মত দেখতে বলে এদের নৃতাত্ত্বিক নাম ভেড্ডিড। এরাই রাঢ় অঞ্চলের তথা পশ্চিমবঙ্গের আদিম অধিবাসী। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ আর. সি, মজুমদার বলেন, "বাংলাদেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় অন্ত্যজ জাতি দেখা যায়, ইহারাই বাংলার আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এবং বাহিরেও এই জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষায় মূলগত ঐক্য হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই সমুদয় জাতি একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর বংশধর। এই মানবগোষ্ঠীকে 'অষ্ট্র-এশিয়াটিক' অথবা 'অস্ট্রিক' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কেহ কেহ ইহাদিগকে 'নিষাদ জাতি' এই আখ্যা দিয়াছেন।" [বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ১০]

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ জাতি নির্ণয়ের দিক থেকে মস্তিষ্কের গঠন প্রণালীর দুটি প্রধান ভাগ করেছেন: ১। 'দীর্ঘ-শির' (Dolichocephalic)

২। ‘প্রশস্ত-শির’ (Brachy-cephalic)। আর্যগণ ছিল দীর্ঘ-শির কিন্তু বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর হিন্দুই প্রশস্ত-শির। তাই নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে ভারতবর্ষের অপর প্রদেশের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বাংলাদেশের কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত প্রভৃতির সঙ্গেই অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আর্যগণের উপনিবেশের ফলে আর্যগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি এবং সভ্যতার বিবিধ অঙ্গ বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অনার্য ভাবধারা বাংলার জনমানস থেকে আজও লুপ্ত হয়নি। যেমন বাঙ্গালীর খোকাখুকি ডাক, বাঙ্গালীমেয়ের শাড়ী সিঁদুর ও পান-হলুদ ব্যবহার, মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুরের জনপ্রিয়তা, গাজন ইত্যাদি লোক-উৎসব, ইতুপূজার মত মেয়েলী ব্রত আজও সমাজ জীবনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।[২]

রাঢ় অঞ্চল আদিম জাতির বাসভূমি। ‘পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল জাতির মোট জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে আটলক্ষ। তার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনলক্ষ সাঁওতালের বাস বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া জেলায় এবং মেদিনীপুর জেলায় দু’লক্ষ। এই চারটি জেলাতেই পশ্চিমবঙ্গের মোট সাঁওতালদের চারভাগের তিনভাগ বাস করে। তার মধ্যে মেদিনীপুর-বাঁকুড়া জেলাতেই সর্বাধিক। এইসব জাতি প্রাধান্যের দিক থেকে দেখা যায়, বাঁকুড়া জেলা—সাঁওতাল, ডোম ও বাউরী প্রধান; বর্ধমান জেলা—সাঁওতাল, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, বাউরী ও ডোম প্রধান; বীরভূম জেলা—সাঁওতাল ও ডোম প্রধান; মেদিনীপুর জেলা—মাহিষ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয় ও সাঁওতাল প্রধান। ‘জাতি প্রাধান্য’ অর্থে সব জাতির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, তথাকথিত উচ্চবর্ণবহির্ভূত প্রধান জাতি।’ [পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৭১] এছাড়া পুরুলিয়ার অধিবাসী প্রধানতঃ কুর্মক্ষত্রিয় বা কুর্মী জাতি। এরা মাহাতো নামে সাধারণভাবে পরিচিত।

---

২ দ্রষ্টব্য: হিন্দুসমাজের গড়ন, নির্মলকুমার বসু।

এদের আচার ও সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙালী হিন্দু সমাজ ও আদিম সমাজের মিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রাঢ়দেশে মৎসজীবী ধীবর, বাউরী, হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু ও সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি আদিবাসীর বাসই বেশী। পশ্চিমবঙ্গে বাউরী ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়ের সংখ্যা যথাক্রমে তিন লক্ষ ও নয় লক্ষ। এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের নিয়ে যে এক বিরাট লৌকিক সংস্কৃতি জনমানসে গড়ে উঠেছিল তার পরিপূর্ণ পরিচয় উপস্থিত করলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে। বাংলার বহু লোক শিল্প, বাঙ্গালীর বহু বলবীর্য, বহু লোক-উৎসব, নৃত্যগীত, এইসব সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষেরই দান। উদাহরণ স্বরূপ একটি পংক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে যাতে বোঝা যাবে লৌকিক-সংস্কৃতির সঙ্গে কিভাবে আর্য-সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। 'পশ্চিমবঙ্গের ধর্মে গাজন একটা লৌকিক ধর্ম উৎসব। ইহা সাধারণতঃ চৈত্রী পূর্ণিমার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্যন্ত যে কোন পূর্ণিমা বা সংক্রান্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়। কামারকুলির শিবমন্দিরটি পূর্বে ধর্মঠাকুরের মন্দির থাকাও অসম্ভব নয়। যদি তাহাই হয়, তবে বৈশাখ সংক্রান্তির দিনে ইহার বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে কোন বাধা নাই। তারপর শৈবধর্মের প্রভাব বশতঃ ধর্মঠাকুরের মন্দির যখন শিবমন্দিরে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে তখনও ইহার বাৎসরিক অনুষ্ঠানের তারিখটি পরিবর্তিত হয় নাই।' [বাংলার লোকশ্রুতি—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ৪৩] এরই সমর্থনে আর একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে 'পূর্ববঙ্গে এখনও ধর্মঠাকুরের গাজনের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে চৈত পরবের 'পাট'-পূজায়......সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ধর্মঠাকুর, শিব অথবা বিষ্ণু অথবা উভয়ের সহিত একীভূত হইতে আরম্ভ করেন এবং ধীরে ধীরে ধর্মপূজা বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজার মধ্যে হারাইয়া যাইতে থাকে।' [বাংলা সাহিত্যের কথা—ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৮৯।] এই ধর্মঠাকুর লৌকিক দেবতা, আর বিষ্ণু ও শিব বৈদিক দেবতা। রাঢ় অঞ্চলে

এই উভয় দেবতার মিশ্রণ এদের অধিবাসী ও তাদের অধিমানসটিকেই সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়ে দেয়। ঐতিহাসিকের ভাষায় বলা চলে, 'বর্তমানকালে প্রচলিত হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ—যেমন কর্মফল ও জন্মান্তর বাদে বিশ্বাস, বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞের বিরোধী পূজাপ্রণালী, শিব শক্তি ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর আরাধনা এবং পুরাণবর্ণিত অনেক কথা ও কাহিনী—তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অনেক লৌকিক ব্রত, আচার, অনুষ্ঠান, বিবাহ ক্রিয়ায় হলুদ সিন্দূর প্রভৃতির ব্যবহার, নৌকা নির্মাণ ও অন্যান্য অনেক গ্রাম্য শিল্প, এবং ধুতি শাড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট পরিচ্ছদ প্রভৃতিও এই যুগের সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া মনে হয়।' [বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ১২]

॥ ছয় ॥

অর্থনৈতিক জীবন: রাঢ় অঞ্চলের মাটি পাথুরে, কঙ্করময়, রুক্ষ-কঠোর হলেও বহু নদীর জলসিঞ্চনে কিছু অংশ উর্বরও বটে। তথাপি এদেশের মানুষকে ধরিত্রীর সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করেই ফসল ফলাতে হয়। রাঢ়ের অর্থনৈতিক জীবন তাই সুসম নয় বরং অসামঞ্জস্য পূর্ণ। রাঢ়ের মানুষের প্রধান উপজীব্য কৃষি। অসংখ্য নদী নালা থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের কৃষকেরা বৃষ্টি-নির্ভর। তাই এদেশের ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে আর পূজা অনুষ্ঠানে মেঘ ও আকাশের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনার সুর। যেমন,

'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেবো মেপে
ধানের মা বুড়ি
কখানা কাপড় পেলি
ছ'বৌকে দিলি
আপনি মলি জাড়ে
কলাগাছের আড়ে।
কলা পড়ে ধুপধাপ
বুড়ি খায় গুপগাপ'

অথবা খনার বচনে,

'চৈত্রেতে থর থর
বৈশাখে ঝড় পাথর ॥
জৈষ্ঠেতে তারা ফুটে
তবে জানয়ে বর্ষা বটে ॥

কৃষিজীবী রাঢ় অঞ্চলে এর একটা বিশেষ ব্যবহারিক মূল্য আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজে যে মাসে বৎসরের নূতন শস্য গৃহে আসে, নবান্ন অনুষ্ঠিত হয় সেই মাসই প্রথম মাস। তাই অগ্রহায়ণ মাস রাঢ় অঞ্চলের মার্গশীর্ষ রূপে পরিচিত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

'মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ আপনি ভগবান,
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।'

ছড়ায় গানে এভাবে বাংলা সাহিত্যের লোকবচনে রাঢ় অঞ্চল যে কৃষি প্রধান তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই গড়ে উঠেছে ধান রোপার গান, ধান বোনার গান, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান আরও কত কি। তাই কৃষকলক্ষ্মী পৌষকে আবাহন জানায়,

'এস পৌষ যেও না
জন্ম জন্ম যেও না
ভাতের হাড়িতে থেকো
জন্ম জন্ম যেও না।

এছাড়াও নানারকম শিল্প এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। যেমন. বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, শঙ্খশিল্প এবং ডাকের কাজ এ অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। উদাহরণ হিসাবে পুরুলিয়ার ছো-নাচের মুখোসে ঐ অঞ্চলের সোলার এবং ডাকের উল্লেখযোগ্য নমুনা মেলে। বাঁকুড়ার পোড়ামাটির পুতুল, ঘোড়া ও নানারকম তৈজসপত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কুইলাপালের হাটে ও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের মেলায় এরকম ধরণের মৃৎশিল্পের প্রচুর আমদানী ও রপ্তানী হয়। মেদিনীপুরের মৃৎশিল্প, ও বয়নশিল্প বিখ্যাত। ঘাটাল মহকুমার বহু অঞ্চলে যথা নিমতলা, খড়ার

ইত্যাদি অঞ্চলে বয়নশিল্প ও ধাতুশিল্প প্রসিদ্ধ। তাই কর্মকার, সূত্রধর শ্রেণীর লোক এই অঞ্চলে অত্যধিক বেশী।

রাঢ় অঞ্চলের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার বহু অধিবাসী একদিকে নমঃশূদ্র, বাউড়ী, বাগদী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর অপরদিকে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, মালো ইত্যাদি আদিবাসীর দল। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় কৃষিজীবি অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষক, নয় মজুর শ্রেণীর। অপরের জমিতে ভাগচাষ করা, নয় মুনিষের কাজ করা এদের প্রধান উপজীবিকা। ফলে এরা চিরদারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায়। আজ এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কালো ছায়ায় এদের জীবন অর্ধেক বিপর্যস্ত হলেও এরা চিরকালই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়েই জীবন অতিবাহিত করে। কবি, মুকুন্দরামের ফুল্লরার বারমাস্যায়,

পাপিষ্ঠ জৈষ্ঠ মাস, পাপিষ্ঠ জৈষ্ঠ মাস।
বঁইচির ফল খেয়ে করি উপবাস।

রাঢ় অঞ্চলের এইসব জেলায় ক্ষুধার অন্নের জন্যে হাহাকার আর দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য সংগ্রাম আজও প্রতিদিনকার চিত্র। পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে, নিমডিতে, বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামে, মেদিনীপুরের হাতীবাড়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলে, পুরুলিয়ার কুইলাপালের হাটে ভূমিহীন কৃষক, নমঃশূদ্র, মাহাতো, ওঁরাও, মুণ্ডা ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষের কুটীরে কুটীরে যে রিক্ততা ও হাহাকার দেখেছি তাতে বেদনা আর বিস্ময়ে শিউরে উঠেছি। দারিদ্র্য যে কত কঠিন হতে পারে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রাম না দেখলে বোঝা যায় না। বৃষ্টিহীন অনুবর এই রুক্ষ প্রান্তরের মানুষগুলোর অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হলেও সাংস্কৃতিক জীবনের স্তরে স্তরে তার সৃষ্টিপ্রবাহ আজও অক্ষুন্ন রেখেছে। দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক ভাঙ্গন এদের জীবনকে যে বিপর্যস্ত করতে পারেনি তার পরিচয় আছে এদের লৌকিক ধর্মে, লোক-উৎসবে, লোকশিল্পে ও লোক-সাহিত্যের বিচিত্র সম্ভারে।

প্রথম পর্ব

রাঢ় ও পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের সংস্কৃতি

॥ এক ॥

ধর্ম : একজন নৃতত্ত্ববিদ্ বলেছেন, 'অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাসের নামই Religion বা ধর্ম'। রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তবর্তী এইসব আদিবাসী ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের মূলে এই অতিপ্রাকৃত জগতের প্রতি বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বিশেষভাবে বর্তমান। গ্রাম্যদেবতা মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, ওলাইচণ্ডী, বাশুলী খুটামূল, রঙ্কিণী ইত্যাদি গেরামঠাকুর এই অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসকেই প্রমাণ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'মানভূম জেলার পুঞ্চা থানার অধীনে লাউলাড়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণের বসতি আছে। এই গ্রামে একটি বাঁধের তারে কয়েকটি অপরিচিত কণ্টক বৃক্ষের নীচে গ্রামদেবতা অবস্থান করে। তাহার নাম খুটামূল। একটি ভগ্ন জৈন প্রস্তর মূর্তিকে বৃক্ষের নীচে আনিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার চারিধারে অগণিত পোড়া মাটির ঘোড়া স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। পৌষসংক্রান্তির সময় বার্ষিক পূজা হয়। ১২ই মাঘ তারিখে এখানে বাৎসরিক মেলা বসে, সেই সময় গাজন হয়। গাজন শব্দ মেলা অর্থেই এখানে ব্যবহৃত হয়। দেবতার পুরোহিত সর্দার জাতীয় ভূমিজ শ্রেণীর অস্পৃশ্য লোক। বাৎসরিক পূজার সময় মুর্গী, পাঁঠা, হাঁস, কবুতর ইত্যাদি বলি হয়। বারোয়ারীভাবে সমগ্র গ্রামের পক্ষ হইতে যেমন বলি হয়, আবার ব্যক্তিগত মানসিক থাকিলেও যে যাহার অবস্থা মত পশুপাখী বলি দিয়া থাকে, অবস্থায় একেবারে না কুলাইলে মাটির ঘোড়া দেবতাকে উপহার দিয়া থাকে।

খুটামূল দেবতার সম্মুখেই একটি হাড়কাঠ পোতা আছে। বাৎসরিক পূজার সময় ব্যতীতও অনাবৃষ্টি, মড়ক ইত্যাদিতে

দেবতার নিকট পূজা ও বলি হইয়া থাকে। দেবতা যেখানে অবস্থান করেন তাহা বাঁধের তীর বলিয়া উচ্চভূমি ; তাহার সংলগ্ন একদিকে বাঁধ অপরদিকে ধানক্ষেত, অন্য একদিকে অনতিদূরে ডিস্ট্রিকট্ বোর্ডের পুকা যাইবার রাস্তা। দেবস্থানটি অপরিষ্কৃত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ পূজার সময় ঘাস চাঁচিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। একমাত্র অনাবৃষ্টি, মড়ক ও বাৎসরিক পূজার সময় ব্যতীত গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এই পূজায় বড় একটা উৎসাহ দেখায় না!' [বাংলার লোকশ্রুতি, পৃঃ ১১০]

রাঢ় অঞ্চলের ধর্মের মূল ভিত্তিভূমিই এই সব লৌকিক দেবতা এবং লৌকিক ধর্মচর্চা। যদিও এই অঞ্চলে লৌকিক ধর্মের পাশাপাশি বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের অবস্থান বিদ্যমান। তবে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলায় ধর্ম, শিব, মনসা এবং শীতলার প্রচার এবং প্রভাব সর্বাধিক। একটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই তিন জেলার কি উচ্চবর্ণের হিন্দু, কি নিম্নবর্ণের হিন্দু, কি আদিবাসী সমাজ সকলেই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দার প্রারম্ভেই বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই এ অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারলাভ করতে শুরু করে। এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে, লোকসংগীতে রাধাকৃষ্ণের প্রভাব এই কারণেই অত্যধিক। ঝুমুর গান তারই একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফল যে কি তা ঐতিহাসিকের বক্তব্য উপস্থিত করলে সঠিক বোঝা যাবে, 'The new life breathed into Bengal Hinduism by Chaitany's creed, burst forth in another direction. The Vaishnav Gosains set themselves to converting the aboriginal tribes and thus brought a new light into their lives after ages of neglect conlumely and supersition.' (*History of Bengal*, Vol II, p. 222—Sir Jadunath Sarker.) অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম

আদিবাসী মানুষ আর নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণকে প্রচলিত কুসংস্কার এবং অবহেলা থেকে মুক্ত করে এক সংযত, সংহত ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মানস গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। তাই কুইলাপাল কিংবা বাঁশপাহাড়ী অথবা হাতিবাড়ী—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার এইসব গ্রামগুলিতে মানুষের গলায় কণ্ঠী আর কীর্তনের সুর যেমন শোনা গেছে, তেমনি গৃহাঙ্গণে তুলসীমঞ্চের পাশেই কুক্কুট শাবকের অবাধ বিচরণ, গেরাম ঠাকুরের কাছে নিরামিষ ফলমূলের সঙ্গে মুর্গী বলি এই অঞ্চলের মিশ্রধর্মের রূপটি অর্থাৎ আদিম ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে হিন্দু-বৈষ্ণবের ধর্মীয় ধারাটি যে কিরূপে এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে গেছে তার পরিপূর্ণ পরিচয় দেয়।

॥ দুই ॥

লোক-উৎসব : পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জীবনে বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলের মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার—প্রধান লোক-উৎসব গাজন। তিনটি লৌকিক দেবতাকে নিয়েই সাধারণতঃ গাজন উৎসব পরিচালিত হয়। যথা : ধর্মঠাকুর, শিব ও মনসা। শিবের গাজন সাধারণতঃ চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। বাঁশপাহাড়ীতে কিংবা ঘাটালের গাজন উৎসবে দেখা গেছে যে, সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্বে ভক্ত্যাগণ, যারা শিবের এই গাজনে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তারা, সকলে শিবমন্দিরে সমবেত হয়। পুরোহিত পূজা অনুষ্ঠানের পর প্রসাদী পুষ্প ও বিল্বপত্র ভক্ত্যাদের হাতে দেন এবং পরে একটি করে 'উপবীত' ও এক খণ্ড করে 'বেত' দেওয়া হয়। তারা সেদিন থেকে উপবাস ব্রত গ্রহণ করে, সামান্য ফলমূল ও হবিষ্যি করেও অনেকে ব্রত পালন করে। এই ব্রতানুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে ভক্ত্যাগণ কখনো 'বাণ ফোঁড়ে', কখনো 'কাঁটা ঝাঁপ' দেয়। সন্ধ্যাবেলায় হিন্দোলা বলে একটি অনুষ্ঠান পালন করে। সেই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে এই : প্রথমে কাঠের মঞ্চ তৈরী হয়। তিনদিকে কাঠ দিয়ে ফাঁসী মঞ্চের মত একটি কাঠামো তৈরী হয়। ওপর দিক থেকে দুটি ফাঁস

ঝোলানো থাকে ; আর নীচের দিকে গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালান থাকে। এক এক জন ভক্ত্যা মাথা নীচুর দিকে করে পা দুটি ওই ফাঁসে আটকায়, তখন তাকে দোলান হয় এবং নীচের আগুনে ধূনার ছিটে দেওয়া হয়। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আর ঝুলন্ত ভক্ত্যার মাথা তার মাঝখান দিয়ে দুলতে থাকে। এভাবে কৃচ্ছ সাধন করে ভক্ত্যাগণ শিবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। এই গাজন উৎসবকে এই অঞ্চলে নীলের গাজনও বলে।

'চড়ক' গাজনের একটি প্রধান উৎসব। কয়েকদিন আগে থেকে নিকটবর্তী সরোবর থেকে চড়কের কাঠ নামক একটি বিরাট শাল-খুঁটি তোলা হয় এবং শিব মন্দিরের সামনে সেটি পোঁতা হয়। এই খুঁটির মাথায় একটি কাঠের ঘূর্ণায়মান বস্তু থাকে, যার দুপাশে মোটা বাঁশ বাঁধা থাকে। বাঁশের একদিকে থাকে একটি বাঁকানো লৌহ-শলাকা এবং অন্যদিকে ভারী কোন কাঠ বা লোহা। এবার এক এক জন ভক্ত্যাকে ঐ লৌহ শলাকায় বিঁধে অথবা গামছা বাঁধা পিঠে আটকে বন্ বন্ করে ঘোরানো হয়। ভক্ত্যা তখন কোঁচড় থেকে জিলিপী বাতাসা ইত্যাদি দর্শকের দিকে ছুঁড়তে থাকে। আর দর্শকদের মধ্যে এই বাতাসা জিলিপী কুড়ানোর জন্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। এই চড়ক উৎসবের সঙ্গে মেলা বসা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। গাজনের সময় গান গাওয়াও একটি প্রচলিত বিধি। আদিবাসী নরনারী ও উচ্চ-নিম্নবর্ণের হিন্দু নরনারী পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। মেদিনীপুর জেলার বাঁশপাহাড়ী থেকে সংগৃহীত একটি আদিবাসী রমণী কর্তৃক এই প্রসঙ্গে গীত একটি গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সাধারণতঃ এই গানগুলি শিবের মাথায় জল ঢালার সময় গাওয়া হয়। যথা,

ঘাটশিলা বহিল পুরুলিয়ার দালান ডুবিল রে।
ছাদের উপরে কেনে রাণী কেনে কাঁদিছ রে।
অগম জলে ঝাঁপ দিতে কারে বলিব রে।
কারে বলিব রে॥ —বাঁশপাহাড়ী

'করম উৎসব' পশ্চিম সীমান্তবর্তী বাংলার প্রধানতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষী আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজের একটি বর্ষাকালীন উৎসব। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীই করম উৎসবের তিথি। করম গাছের একটি ডাল বন থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেটে এনে গ্রামের কোন একটি জায়গায় পোঁতা হয় এবং সেটি ঘিরে নৃত্য-গীত চলতে থাকে। মাদল ও বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু হয় :

বার মাসে বারো পরব
ভাদর মাসে ইঁদ করো,
চল, দেওরা, বাইড়াম যাব
ইঁদ দেখতে যাব,
শাঁখা পরা লো রে
ঘর ফিরিবার বেলা
মার খাইল রে। —বাঁশপাহাড়ী

কিংবা পুরুলিয়ায় অযোধ্যা পাহাড়ের আদিবাসী মানুষের গানে :

তুমি যাবে পর দেশে আমি যাব সঙ্গে
রাঁধিব বেগুন ভাত পারশিব রঙ্গে। —পুরুলিয়া

'টুসু' রাঢ় অঞ্চলের একটি লৌকিক শস্যোৎসব (harvest festival)। অঘ্রাণ-পৌষ মাসে যখন মাঠে মাঠে ধান পেকে ওঠে, গৃহাঙ্গণ শস্যে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন এই উৎসব চলে। অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তি থেকে মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত এই উৎসব ও ব্রত উৎযাপন চলে। মেয়েলী ভাষায় পশ্চিমবঙ্গে এই ব্রতের নাম তুষতুষলী ব্রত। বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশে এবং পুরুলিয়া জেলায় এই উৎসবকে টুসু বলা হয়। এই জেলায় টুসুর উৎসব এভাবে পালন করা হয় : যথা : ছোট একটি মাটীর সরায় তুঁষ ভরা থাকে। তার গায়ে একটি নারীর মুখ অঙ্কিত থাকে। মাটির সরাটি ফুল দিয়ে সাজানো হয়, তাতে টুসুকে নানা মিষ্ট দ্রব্যের নৈবেদ্য দিয়ে সাজানো হয়, তিনদিন মাটির সরাটি পূজা করার পর মকর-সংক্রান্তির

দিন তা বাঁধ অথবা নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। পুরুলিয়ায় সংগৃহীত একটি টুসু উৎসবের গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

কুইল্যা পালে লৈতন সড়ক ভুপাশ সারি লোক চলে,
আমার টুসুর এমনি চলন বিন্ বাতাসে গা দোলে।
যা চলে যা হাওয়ার গাড়ীতে।
চোকে নাগলি বসে হাওয়াতে ॥ —পুরুলিয়া

'জাওয়া পরব' : কুর্মী উপভাষা প্রধান পুরুলিয়ার পশ্চিমাংশে বর্ষাকালীন একটি শস্যোৎসবের নাম জাওয়া পরব। টুসু যেমন ফসল পরবর্তী (Post-harvesting festival) উৎসব, জাওয়া তেমনি ফসল পূর্ববর্তী (Pre-harvesting festival) উৎসব। জাওয়া উৎসব ভাদ্রমাসের একাদশীর পনর দিন আগে আরম্ভ হয় এবং একাদশীর দিন সম্পূর্ণ হয়। এই উৎসব-পদ্ধতি এই প্রকার : গ্রামের মেয়েরা একটি ডালা ভর্তি বালিতে নানারকম শস্যের বীজ রোপণ ক'রে জলসিঞ্চনের দ্বারা মুকুলিত ক'রে গৃহস্থের আঙ্গিনায় রেখে নানা রকম নৃত্যগীত করে। এটি আসলে নারীগণের উৎসব, তাদের মনের কামনা-বাসনা এতে বেশী প্রতিফলিত হয়। যথা :

একদিনকার হলুদ বাটা
তিন দিনকার বাসি লো,
মা বাপকে বলে দিবি
বড় সুখে আছি লো। —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

'পাতা পরব' বা 'পাতানাচ' পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সখা নির্বাচন, বন্ধুত্ব, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনী মনোনয়ন করা হত বলে এর নাম পাতা পরব বা পাতানাচ। পাতা শুদ্ধ করম গাছের একটি ডালকে ঘিরে নাচ ও গান চলে, মাদল ও ধামসার তালে তালে :

শাক তুলতে গেলি মিনা তুললি লতাপাতা,
কি শাক তুললি মিনা বুড়ার সঙ্গে দেখা।
ওরে মিনা মইরা গেলো,
এমন সুন্দর মিনা বর হইল বুড়া। —বাঁশপাহাড়ী

'বাঁধনাপরব' : গো-পূজা উৎসব। রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিম সীমান্তবর্তী স্থানে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গো বা মহিষ নাচানো এ উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ। একটি শক্ত খুঁটিতে একটি বলিষ্ঠ মহিষ বা ষাঁড়কে বেঁধে তাকে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষিপ্ত করে আনন্দ ও উত্তেজনা লাভই এ উৎসবের উদ্দেশ্য। এ উপলক্ষে কাঁড়া বা মহিষের জন্মকথা কীর্তন করা হয় যথা :

শিকড় ভূঁইয়ে রে কাঁড়া তোরি জনম রে।
সাত ভূঁইয়ে লিল্হে গৃহবাস॥
গোলায় ভাঁজি পালবে গুলিনে পুষিবে
বাগালে তো ডাকে ভোমরা নাম রে ওহিরে।
—বাঁশপাহাড়ী, মেদিনীপুর।

এছাড়াও কতকগুলি পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব এই সব অঞ্চলে প্রচলিত আছে। যেমন বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি। এছাড়াও 'ভাদুপূজা' বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলের অন্যতম একটি লৌকিক উৎসব। ভাদ্রমাসের প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত গৃহে বালিকা, বধূ সকলে সমবেত হয়ে ভাদু পূজা করে এ প্রসঙ্গে ভাদুর একটি মূর্তিও গড়া হয়। লোকশ্রুতিবিদ বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিবাসীর করম উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ মাত্র।' ভাদুগানের সঙ্গে পঞ্চকোটের রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীর নামে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ভাদ্রমাসের প্রথমদিনে কুমারীগণ গান গেয়ে ওঠে,

'ভাদুর আগমনে।
কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে॥
ভাদু আজকে এ'লো ঘরে গো, এলো গো শুভদিনে'।—বাঁকুড়া

রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী ও হিন্দু সমাজ পরস্পর কিরূপ সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান করেছিল এ উৎসবটি তার অন্যতম প্রমাণ। এছাড়াও রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে মেয়েদের বহু ব্রত অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে যেমন অশ্বত্থপাতা ব্রত, কুক্কুটীব্রত, পুণ্যিপুকুর, পৃথিবীব্রত, জলসংক্রান্তি, যমপুকুর, সেঁজুতি ইত্যাদি।

॥ তিন ॥

লোক-সাহিত্য: পশ্চিম-সীমান্ত বাংলা অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর জেলা লোক-সাহিত্যের স্বর্ণখনি। ময়ূরাক্ষী, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, শিলাবতী, কংসাবতীর তীরে তীরে শাল আর মহুয়া বনের গভীরে গভীরে, শুশুনিয়া, বাগমুণ্ডি, অযোধ্যা—বানশা, কঁচ, চাণ্ডিল পাহাড়ের আনাচে-কানাচে, আদিবাসীর কুটিরে কুটিরে নিম্নবর্ণের মানুষের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, লোক-সাহিত্যের এক অজানা ভাণ্ডার লুকিয়ে রয়েছে। এই রুক্ষ রাঢ় প্রকৃতির মানুষের জীবনে দারিদ্র্য চিরসঙ্গী হলেও লোক-সাহিতের ও লোক-সংস্কৃতির ধারাটি এরা আজও অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। তাই যে হারাধনের ঘর পুড়েছে, যোগ্য ছেলে মারা গেছে, সে আজও গান গায়, তার একতারার সুরে আজও পল্লীমানুষের হৃদয়ে বেদনার সুর-ভারতী রচিত হয়। সুর্বণরেখার তীরে বাস করা ঝাড়াপাড়া গ্রামের কাদম্বরী দেবী বয়সে বৃদ্ধা হলেও অজস্র উপকথা সঞ্চিত করে রেখেছে মনের মণিকোঠায়। কুইলাপালের ভোলানাথ কালিন্দীই হোক বা নূতনডির আদিবাসী মহেশ্বর টুডুই হোক এরাই হচ্ছে সেই সব মানুষের দল যারা যুগযুগান্তর ধরে বয়ে নিয়ে চলেছে লোক-সাহিত্যের এক বিরাট ভাণ্ডার। ছড়ায়, গানে, উপকথায়, রূপকথায়, ধাঁধায়, প্রবাদে পশ্চিম-সীমন্ত বাংলার এই অঞ্চলগুলি একেবার জমজমাট। কারণ হিসাবে বলা চলে এই অঞ্চলের মিশ্র প্রাকৃতিক অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশ, অধিবাসীদের মধ্যে মিশ্রণ, বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সীমান্তসূত্রে যোগসাধন এই অঞ্চলের লৌকিক-সাংস্কৃতিক মানসটিকে অত্যন্ত জীবনীশক্তিপূর্ণ করে তুলেছে; যা পূর্ববর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে। এবার পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার লোক-সংস্কৃতি ও লোক-সাহিত্যের জেলাগত একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করা যেতে পারে।

॥ চার ॥

মেদিনীপুর: মেদিনীপুর সীমান্ত বাংলার একটি অন্যতম বৃহৎ অঞ্চল। এর প্রাকৃতিক পরিবেশ কিছুটা মিশ্র ধরণের। একদিকে পার্বত্যময়—কঙ্করপূর্ণ বিশাল ভূভাগ—গড়বেতা, শালবনী, গদাপিয়াশাল, ঝাড়গ্রাম। চারিদিকে শালবন—ছোট বড় মাঝারী অগণিত শালের সারি আর লাল পাথুরে মাটি। তাই এ অঞ্চলের গ্রামের নাম শালবনী, নদীর নাম শিলাবতী। শাল আর শিলাময় প্রান্তরে পূর্ণ অধিকাংশ মেদিনীপুর। অন্যদিকে কিছু অংশ নদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা পরিসিক্ত। ফলে তা সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা। কিন্তু এ অঞ্চলের চেয়ে পশ্চিমদিকের ঐ অজলা-অফলা শিলাময় প্রান্তরে কিন্তু লোক-সাহিত্যের অনেক ফসল। কিন্তু কেন? এর উত্তরে লোকশ্রুতিবিদের একটি মন্তব্য উপস্থিত করা যেতে পারে! 'একমাত্র ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্যেই আঞ্চলিক সংস্কৃতি একটি বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছিল। কারণ ইহার পশ্চিম সীমান্ত ব্যাপিয়া আদিবাসী সমাজের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে উড়িষ্যার সংস্কৃতির সংমিশ্রণ অনুভব করা যায় এবং উত্তর-পশ্চিম অংশে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে ইহার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। নানাদিক হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবন একটা বিশেষ রূপ লাভ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছে। কারণ, এই অঞ্চল দুর্গম অরণ্যাকীর্ণ বলিয়া বহির্জগতের প্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে।" [পশ্চিম বাংলার লোক-সংস্কৃতি—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৭৩, পৃঃ ৮৪]। মেদিনীপুরের সীমারেখার একদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ বিহারের সিংভূম, উত্তরদিকে বাঁকুড়া-হুগলী, পূর্বদিকে ২৪-পরগণা, দক্ষিণে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলা ও বঙ্গোপসাগর। সুতরাং কেবল ঝাড়গ্রাম কেন, মেদিনীপুরের পশ্চিম অংশেই লোক-সংস্কৃতি ও লোক-সাহিত্যে বিহার ও উড়িষ্যার প্রতিবেশী রাজ্যের প্রভাব একান্ত

লক্ষণীয়। এই গ্রন্থের পরবর্তী অংশে ঝাড়গ্রামের হাতিবাড়ী অঞ্চলের লোক-কথা ও ধাঁধা ইত্যাদির আলোচনায় এর বিস্তারিত প্রমাণ উপস্থিত করা যাবে। উত্তর-পশ্চিমের কিছু অংশে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলের লোক-সংগীতের আলোচনায় পরবর্তী অধ্যায়ে এর বহু নিদর্শন উপস্থিত করা যাবে। এইসব অঞ্চলে লোক-সাহিত্যের মধ্যে বৈচিত্র্যময় রূপকথা, উপকথা, ধাঁধা, বিভিন্ন ধরণের লোক-সংগীত যথা—ভাদু, টুসু, পাতানাচের গান, কাঠিনাচের গান, বিয়ের গান, করম সংগীত, ঝুমুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সাঁওতালদের মধ্যে সোহরায় পরব, ইন্দ্রধ্বজের উৎসব, টুসু উৎসব, বালিকা পূজা, করম উৎসব ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলের গাজন এবং ঘাটাল মহকুমার গাজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোহরায় পরব সাঁওতালদের শস্য উৎসবের পরব। যার সঙ্গে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার করম উৎসবের মিল লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্রপূজার মধ্যে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের পরিচয়টি স্পষ্ট। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল সিংভূম, মানভূম ও পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার কিছু অংশ নিয়ে এক লৌকিক সাংস্কৃতিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে।

এই অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ, মালো, বাউরী, বাগদী ইত্যাদি শ্রেণীর পূজা-পার্বণের মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। করম পূজা, ভৈরব-ভৈরবীর পূজা, শীতলা-চণ্ডী, মনসা এইসব গ্রাম দেবতার অধিষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাল গাছ কিংবা অশত্থ আর বট গাছের গোড়ায়, এবং সেখানে পোড়া মাটির ঘোড়া, হাতি ইত্যাদির স্তূপ। মুর্গী বলি দিয়ে এই সব গেরাম দেবতার তুষ্টি হয়। সুবর্ণরেখার তীরে হাতিবাড়ী অঞ্চলে এরকম ধরণের বহু 'গেরাম থান' লক্ষ্য করা গেছে।

বিভিন্ন ধরণের নৃত্যগীত আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে প্রচলিত। যেমন কাঠিনাচ, পাতানাচ, জাওয়া নাচ, মাদল, কিঁদরী,

ধামসার তালে তালে এক বিরাট লৌকিক সংস্কৃতির পীঠস্থান রচিত হয়েছে মেদিনীপুরের শালবনে, মহুয়ার জঙ্গলে, লাল পাথুরে মাটিতে; আর অজস্র গল্প কথা জমে উঠেছে সুবর্ণরেখা, শিলাবতী, কাঁসাই নদীর তীরে তীরে, অজস্র কুটীর প্রাঙ্গণে এবং চণ্ডীমণ্ডপে ও গেরাম ঠাকুরের থানে।

॥ পাঁচ ॥

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার একদিকে মেদিনীপুর অন্যদিকে পুরুলিয়া জেলা; বিহারের সীমান্তও এসে মিশেছে এ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে। এ জেলা মূলতঃ সাঁওতাল ডোম ও বাউরী প্রধান। বাংলাদেশে ডোম, বাউরী ও ধীবরদের শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের অসংখ্য কিংবদন্তি, ছড়া, লোককথা প্রচলিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি রবীন্দ্র সংগ্রহের ছড়া উদ্ধৃত করা যেতে পারে;

'আগড়ুম বাগড়ুম, ঘোড়া ডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥
বাজতে বাজতে চলল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলা পুলি।'······ইত্যাদি

আসলে দৃশ্যটি ডোম চতুরঙ্গের বর্ণনা। লোকশ্রুতিবিদের ভাষায়, 'যেমন আগ্‌ডুম অর্থ অগ্রবর্তী (Advance guard) ডোম সৈন্যদল, বাগ্‌ডুম অর্থাৎ বাগ পার্শ্বরক্ষী ডোম সৈন্যদল এবং ঘোড়াডুম অর্থাৎ অশ্বারোহী সৈন্যদল। একদিন ডোম সৈন্যই বাংলার পশ্চিম-সীমান্ত রক্ষা করিত। বিষ্ণুপুর রাজনগর প্রভৃতি স্থানের সামন্ত রাজাগণ ডোম সৈন্যদল রক্ষা করিতেন, মধ্যযুগের—বাংলার লৌকিক সাহিত্য তাহাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনীতে পরিপূর্ণ।' [বাংলার লোক-সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৮]

এ অঞ্চলের প্রধান তিনটি লৌকিক দেবতা ধর্ম ঠাকুর, মনসা ও শিব। এই তিন দেবতাকে কেন্দ্র করেই গাজন উৎসব এ অঞ্চলে অধিক প্রচলিত। এছাড়া ভাদু উৎসব বাঁকুড়া জেলার লোক

সাধারণের জাতীয় লৌকিক উৎসব। এই সব উৎসব প্রসঙ্গে অজস্র গাজনের গান ও ভাদুগান রচিত হয়ে থাকে। এগুলি বাংলার লৌকিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাগণের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ ও প্রচারের পর থেকেই এ অঞ্চল বৈষ্ণবিকতায় পরিপূর্ণ হয়—আদিবাসী জনসমাজ ও উচ্চ নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়ে;—রচিত হতে থাকে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার প্রধানতম প্রেম সঙ্গীত ঝুমুর। এছাড়া রাধা-কৃষ্ণ প্রেম সঙ্গীতের আর এক রূপ খেমটী গান। নৃত্য-সহযোগে এই গান বাঁকুড়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে নৃত্য ও গীত হয়ে থাকে।

আচারমূলক ধাঁধা এ অঞ্চলের বাউরী ডোম ইত্যাদি শ্রেণীর মধ্যে বহুল প্রচলিত। এই ধাঁধার অত্যধিক প্রচার এ অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। বাঁকুড়া জেলার পোড়া মাটির হাতি ও ঘোড়া তৈরী একটি প্রসিদ্ধ লৌকিক শিল্প। এ অঞ্চলের বিশেষ করে বিষ্ণুপুরের দেবালয়ে পোড়া মাটির কাজে এই অঞ্চলের শিল্প ও স্থাপত্যের চাতুর্যের পরিচয় মেলে।

লোক-সাহিত্যে, লোক-শিল্পে, কথা ও কাহিনী বাঁকুড়ার লৌকিক সাংস্কৃতিক মানসটি আজও অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান।

॥ ছয় ॥

পুরুলিয়া: পুরুলিয়া পূর্বে ছিল বিহারের অন্তর্গত এখন বাঙলা দেশে। টুসু গান গেয়ে পুরুলিয়ার বঙ্গভাষী যুবকযুবতীর দল সেদিন বঙ্গভুক্তির জন্যে আর্তনাদ করে উঠেছিল:

মোদের বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষাতে
(মোরা) বেঁচে আছি আনন্দেতে ॥
পঞ্চায়েতের শাসন হলে মানভূমি বাংলা ভাষী,
গাঁয়ের ভাষায় কাজ চালাবে মাথা হয়ে গাঁ বাসী।

কিন্তু তথাপি এর সাংস্কৃতিক মানসের অধিকাংশেই বিহারের আর ছোট নাগপুরের মালভূমির পার্বত্য উপজাতিদের প্রভাব।

পুরুলিয়া মাহাতো প্রধান অঞ্চল। এই মাহাতোদের পূর্ব পুরুষই কূর্ম ক্ষত্রিয় বা কূর্মি রূপে পরিচিত হলেও—এর আসল পূর্বপুরুষ আদিবাসী। এই মাহাতো শ্রেণীর মধ্যে একটি সংহত লোক-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাই এ অঞ্চলে ঝুমুর, ভাদু, করম-গীত ইত্যাদি লোক-সঙ্গীত এবং বহু বৈচিত্র্যময় রূপকথা, উপকথা প্রচলিত আছে।

এই পুরুলিয়া জেলার দুটি অঞ্চল যথা অযোধ্যা পাহাড় ও কুইলাপালে দেখা যায় নিম্নবর্ণের হিন্দু হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দী ইত্যাদি নমঃ শূদ্র এবং আদিবাসী, টুডু, হাঁসদা, সরেশ, কিসকু ইত্যাদি পাশাপাশি বাস করে একটি অবিচ্ছিন্ন লৌকিক সাংস্কৃতিক মানস গড়ে তুলেছে। বৈষ্ণব ধর্ম ও লৌকিক ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান এ দুটি অঞ্চলের লৌকিক সংস্কৃতিকে জীবনী শক্তিতে পরিপূর্ণ করেছে। তাই নূতনডি গ্রামের মহেশ্বর টুডু তার গানে যেমন রাধা-কৃষ্ণ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী নাম-ধাম ইত্যাদি গ্রহণ করেছে অন্যদিকে কুইলাপাল গ্রামের 'চরকাসিনী দেবী'র ফলমূল ইত্যাদি পূজা-দ্রব্যের সঙ্গে মুর্গী বলিও হচ্ছে।

আদিম জনসমাজ ও লৌকিক উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজের মিশ্রণের ফলে পুরুলিয়ার এ অঞ্চলে একটি অদ্ভুত ধর্ম সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে। কুইলাপাল গ্রামের 'ইন্দ্রপূজার' বিবরণ দিলে এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের ইন্দ্রধ্বজের উৎসব ও বিষ্ণুপুরের ইঁদপরবের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

এটি প্রধানতঃ গ্রামের জমিদারের উৎসব। পূজার দিন গ্রামের মধ্যস্থলে একটি ৫০।৬০ হাত শাল গাছের খোঁটা পোঁতা হয় এবং ঐ খোঁটার মাথায় এক টুক্‌রো লাল কাপড় ছাতার মত করে ঢেকে দেওয়া হয়। গ্রামের সকলে সেখানে নানা রকম দ্রব্য দিয়ে পূজা দেয়। মুর্গী ইত্যাদিও বলি হয়। অনেকদিন ধরে নাচ গান ও উৎসব চলে। ঐন্দ্রজালিক উপায়ে অতিবৃষ্টি নিবারণের জন্য ভাদ্র মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এর পৌরাণিক কাহিনী হচ্ছে দেবাসুরে দ্বন্দ্ব এবং বিষ্ণু কর্তৃক ধ্বজা প্রদানে দেবতাদের জয়লাভ। তাই অনেকে মনে করেন অনার্য আদিবাসীদের বৃক্ষ পূজার সঙ্গে পৌরাণিক ধ্বজা পূজা মিশ্রিত হয়ে এই ইন্দ্র পূজার রূপ লাভ করেছে।

পুরুলিয়া খরা অঞ্চল এবং অনুর্বর প্রান্তর বলে এর বহু অধিবাসী বনে জঙ্গলে বাস করে। কুইলাপাল ও অযোধ্যা পাহাড়ের বনে জঙ্গলে বসবাসকারী এই আদিবাসী জনগণের বনে ফল-মূল মধু ইত্যাদি সংগ্রহ, করা, মাছধরা, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে হাটে বিক্রয় করা অন্যতম উপজীবিকা। তাই এদের উপকথায় ও রূপকথায় পশু পক্ষীর বিচিত্র আচরণ ও মানুষের বিচিত্র মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। বন বিভাগের সঙ্গে এদের চিরকালের সংগ্রামের চিত্রও এদের গানে ফুটে উঠেছে। যথা :

গোকুল ঘোষ ফরেষ্টার ছিল,
শিশির বিনয় 'গাড' (গার্ড) হল,
সবাই মিলে যুক্তি করে ঘরগুলান ভেঙে দিল।
করব মামলা করো না মানা,
আমরা ডরাই নাকো জেলখানা। —পুরুলিয়া

নানা দিক থেকে বাধা পেয়েও পুরুলিয়ার আদিবাসী মানুষ তাদের লৌকিক সংস্কৃতির ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। তার পরিচয় আছে এ অঞ্চলের ঝুমুর, ঢুয়া, করম, পাতা, টুসু, কাঠিনাচ, বিয়ের গান, আর ধাঁধা প্রবাদ ও রূপকথা-উপকথায়—এমন কি ছো-নাচের আসরে, যাত্রাগান ও কথকতাতেও।

দ্বিতীয় পর্ব

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের রূপকথা

॥ সূচনা ॥

এই পর্বে পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের লোককথার একটি বিস্তৃত বিবরণ উপস্থিত করা হবে। কি বিরাট সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেষ্টনী থেকে রূপ লাভ করে, কি ভূপ্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশে এই পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের বিরাট লোক-সাহিত্য ও লৌকিক জনমানসটি গড়ে উঠেছে তার পরিচয় সূচনা ও প্রথম পর্বে উপস্থিত করা হয়েছে। উক্ত অংশে পশ্চিম সীমান্তবর্তী রাঢ় অঞ্চলের তিনটি বিশেষ জেলার, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া উপর কি ভাবে প্রাকৃতিক, ধর্মীয়, ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছিলো এবং তার ফলে এক বিরাট সংহত লৌকিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই পর্বে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার লোক-কথার সংগ্রহে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত ও সন্নিহিত কয়েকটি গ্রাম যথাক্রমে কুইলাপাল, নূতন-ডি, হাতিবাড়ী, দহমুণ্ডা ও ডোমজুড়ি ইত্যাদি গ্রামের অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেষ্টনী প্রতিবেশী প্রদেশের প্রভাব ইত্যাদি আলোচনা করে উক্ত গ্রামগুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে সংগৃহীত উপকথা, রূপকথা ইত্যাদি লৌকিক কথাসাহিত্যের আলোচনা উপস্থিত করা হবে।

পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার যে গ্রামগুলির লোককথা এখানে আলোচনা করা হবে সেই গ্রামগুলির একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে ঐ সব গ্রামগুলি কোনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অবিচ্ছিন্ন গ্রাম নয় বরং পরস্পর নির্ভরশীল। যেমন, কুইলাপাল গ্রামটি পুরুলিয়া জেলায় অবস্থান হলেও প্রতিবেশী জেলা বাঁকুড়ার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাবে একান্তভাবে

প্রভাবিত। অপরদিকে হাতিবাড়ী গ্রামটি মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় অবস্থিত হলেও প্রতিবেশী প্রদেশ বিহারের সিংভূম ও উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক মানসে প্রভাবিত। অপর দিকে ডোমজুড়ি গ্রাম বিহারের সিংভূম জেলায় অবস্থান করলেও প্রতিবেশী প্রদেশ বাঙলাদেশের মেদিনীপুর জেলার সাংস্কৃতিক অধিমানস দ্বারা পরিবেষ্টিত তাও বলা চলে—পশ্চিম সীমান্ত বাংলার রাঢ় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া ইত্যাদি জেলার সঙ্গে বিহারের সিংভূম, মানভূম ও উড়িষ্যার সংলগ্ন অঞ্চলের যোগসাধনে একই ধরণের লৌকিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি গড়ে উঠেছিল। তাই দেখা যাবে হাতিবাড়ী সংগ্রহ শিবিরে সংগৃহীত লোককথাগুলি মাঝে মাঝে সামান্য পরিবর্তিত—হয়ে পাশাপাশি প্রদেশে আদান প্রদান হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার দহমুণ্ডা গ্রামে যে 'নেউলের গল্প'টি পাওয়া গেছে, সেই গল্পটিই আবার ঐ অঞ্চলের প্রতিবেশী প্রদেশের সীমান্ত গ্রাম বিহারের সিংভূম জেলার ডোমজুড়ি গ্রামেও পাওয়া গেছে। তাই বলা হয়ে থাকে যে লোককথার একটি ধর্ম পরিবর্তন ও স্থানান্তরীকরণ। এবিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলগুলিতে লোককথার যে সব বিষয় পাওয়া গেছে। তা হচ্ছেঃ ক। উপকথা (Aninal tale) ; খ। রূপকথা (Marchen or Fairy tale) ; গ। ধাঁধাঁ-মূলক কাহিনী (Tale based on riddle)

নূতন-ডি গ্রামের আদিবাসী টুডু, হাঁসদা, কিসকু, সরেণ, বাসকে ইত্যাদি পদবীধারী যে কেউ হোক, হাতিবাড়ী অঞ্চলের ডোমজুড়ি গ্রামের সুরেন পাত্র, জিতবাহন কুইলাই হোক আর কুইলাপাল গ্রামের ভোলানাথ কালিন্দী, শশাঙ্কশেখর পাণ্ডাই হোক সকলেই হাস্যমুখে এগিয়ে এসেছে, আদর করে বসিয়েছে খাটিয়া পেতে, তারপর তাদের রূপকথা ও উপকথার অজস্র ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে বলতে শুরু করেছেঃ 'এক যে ছিল শিয়াল' কিংবা

'এক রাজার সাত রাণী' ইত্যাদি গল্পের একটানা স্রোত বহে চলেছে। লিখে লিখে হাত ব্যথা হয়ে গেছে, চারদিকে ভিড় করে এসেছে উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ, শিশুর দল, অবগুণ্ঠিতা কৌতূহলী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বৈষ্ণব গায়ক, যুবক-যুবতীর দল। গল্পে-কথকতায় আসর জমে উঠেছে।

পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের—কয়েকটি গ্রামের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে—লৌকিক সাহিত্যের বিস্ময়কর উপাদানের সরেজমিন তদন্তের ফলাফল ও উপকরণ সংগ্রহ ও উপস্থিত করে তার বিচার ও বিশ্লেষণ এখানে উপস্থিত করেছি; এর ফলে মৌখিক উপাদান সংগ্রহের কাজ ও বিচার বিছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে না পড়ে, সংহত ও গভীরতর হয়ে উঠবে বলেই আমার বিশ্বাস। অবশ্য এর সাফল্য কতখানি তার বিচারের ভার পণ্ডিত ও রসজ্ঞের উপর।

পরবর্তী অংশে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার উপকথা ও রূপকথার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, উৎস ও অভিপ্রায় (Motif) আবিষ্কার ও বিচার করে গ্রামপ্রদক্ষিণে গ্রামভিত্তিক উপকথা ও রূপকথা সংগ্রহের উপাদান উপস্থিত ও বিচার করা হবে।

॥ এক : রূপকথার উৎস ও অভিপ্রায় ॥

"এক যে ছিল রাজা।"

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চী কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাঁহার রাজত্ব এ সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল, আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ বেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা……

গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দু'টি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনো তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিঃস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তারপরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়মন্ত্র পড়িয়া—তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে।

ছেলেবেলায় সাত সমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম সেখানে স্নেহময়—সুমিষ্ট স্বরে শুনিতাম—

"আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়ালো।"

[বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ]

লোকরসিক কবির মনে রূপকথার যে বৈশিষ্ট্য রেখাপাত করেছিলো তার সরল উপস্থাপনা সত্য সত্যই প্রসংশনীয়। তাই বার বার মনে হয়েছে কোন বিচিত্র উৎস থেকে এরা জন্ম পরিগ্রহ করে মানুষের কুঠিরে কুঠিরে. জনগণের হৃদয়ের দ্বার দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে, বাংলাদেশের চণ্ডীমণ্ডপে, বঙ্গনারীর হেঁসেল ঘরে, ঠাকুমা দিদিমার ভাঁড়ার ঘরে, আদিবাসীর নিকানো দাওয়ায়, ঢেঁকি ঘরের কোণে, অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে। এই সব লৌকিক গল্পকথা কিভাবে জন্মলাভ করে দেশ থেকে দেশান্তরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, বংশ থেকে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হচ্ছে তা এক বিস্ময়ের বিষয়।

বাংলাদেশের লোককথার উৎস বা আবির্ভাবের কথা বলতে গিয়ে সুপ্রসিদ্ধ লোককথাবিদ্ Rev. Lalbeheri De তাঁর *Flok-Tales of Bengal* গ্রন্থে বলেছেন:

'I had myself, when a little boy, heard hundreds —it would he no exaggeration to say thousands — of fairy tales from that same old woman, Shmbhu's

mother—for she was no fictitious person ; she actually lived in the flesh and blood and bore that name ; [Page viii] অর্থাৎ লেখক বলছেন যে তিনি যখন বালক তখন, একথা বললে হয়ত অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে যে, শম্ভুর মা আমাকে প্রায় হাজার হাজার রূপকথা শুনিয়েছিলো। এছাড়াও তিনি তাঁর সংগ্রহের উৎস বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন :

'An old Brahmin told me two stories ; and old barbar three ; an old servant of mine told me two ; and the rest I heard from another old Brahmin. [ibid, p. ix] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে তাঁর গল্পগুলির উৎস কখনও এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কখন এক নাপিত, কখনও বৃদ্ধ ভৃত্য। এবং উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণই হোক আর নিম্নবর্ণের ক্ষৌরকারই হোক সকলেই লেখককে গল্প শুনিয়েছে। সুতরাং এর থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে গল্পগুলি উচ্চ-নীচ সর্বস্তরের মানুষই উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে বংশ পরম্পরাক্রমে পুত্র-পৌত্রাদি থেকে ব্যক্ত করেছে। লেখক পরিসমাপ্তিতে তাই বলেছেন :

I have reason to belive that the stories given in this book are genuine sample of the old old stories told by old Bengali women from age to age through a hundred generations. [ibid, p. ix] এই যে 'old old stories' অর্থাৎ 'বহু পুরাতন গল্পের' কথা লেখক বলেছেন,—এই পুরাতন দিনগুলি কবে এবং কোথায়? কিংবা লেখক যখন বলেছেন 'told by old Bengali women from age to age through a hundred generations'—এই 'age to age' অর্থাৎ 'যুগের পর যুগে'র কাল কোথায়—এবং কবে—তা আবিষ্কার করতে পারলে রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলার এই গ্রামগুলির রূপকথার উৎস আবিষ্কার করা সহজসাধ্য হবে।

এবার সাঁওতাল সমাজের গল্পের উৎস প্রসঙ্গে Mildred Archer এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে :

From the circumstances in which Santal tales are told, it will he obvious that whatever other functions they serve, their primary use is to provide entertainment in a manner that is Santal. [Man in India Vol. XXIV pp. 25,] অর্থাৎ যে সমস্ত পরিবেশে সাঁওতাল গল্প বলা হয়ে থাকে, এটা নিঃসন্দেহ যে সেই গল্পগুলি যে প্রয়োজন সিদ্ধ করে থাকুক না কেন, তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দ-বর্দ্ধন এবং অবসর-বিনোদন এবং সেটি সম্পাদিত হয়েছে পুরোপুরি সাঁওতাল পদ্ধতিতেই। এ প্রসঙ্গে তাঁর আরও অভিমত :

'Stories are told at night when the days work is finished and young and old collect round a village teller. Stories are recounted when men and boys are guarding the paddy crop on the threshing floors in winter or are watching mahua trees, while in the hot weather a party often in collects round a verandah in the village street. Old women who are cooking food in his house amuse a crowd of children by telling them a tale. Cow-herds tell each other stories when grazing their cattle and stories are also told when villagers are assembling for a village meeting oi waiting for guests to arrive at a wedding. On all these occasions there is time to be whiled away and the folk tale is at once a diversion and a recreation. [Ibid, pp. 225] অর্থাৎ সমস্ত দিনের কাজের শেষে যখন তারা একত্রে সমবেত হয় তখন তাদের অন্তর্নিহিত গল্পের উৎস হঠাৎ সুপ্ত ফল্গুস্রোতের মতো বেরিয়ে আসে। গ্রামের যুবক,

যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, রাখাল, শস্যপ্রহরাকারী যেই হোক না কেন, অন্য গ্রাম থেকে আহুত বরযাত্রী আসুক না কেন, তারা অবসর বিনোদন ও স্মৃতি পর্যালোচনা এবং আনন্দ উপভোগের জন্যেই গল্প বলে এবং গল্পের অজস্র উৎস বেরিয়ে আসে।

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার আলোচ্য গ্রামগুলিতে দেখা গেছে সাঁওতাল, ডোম ও বাউরি ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাধিক্য। এছাড়াও লোধা, কোড়া, ভূমিজ শ্রেণীর আদিবাসী ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ইত্যাদি শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এক কুইলাপালের নিকটবর্তী নূতনডি গ্রামে যেমন মহেশ্বর টুডুর মত সাঁওতাল উপজাতির লোক বেশী বাস করে; ঠিক তেমনি কুইলাপালে বাস করে ভোলানাথ কালিন্দী, রসরাজ সহিস এর মত বাউরী শ্রেণীর নিম্ন-হিন্দু। নৃ-বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে, দেখেছেন যে বাংলাদেশে ব্যগ্রক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মাল-পাহাড়িয়া প্রভৃতির মধ্যে দৈহিক সাদৃশ্য আছে। তাই মহেশ্বর টুডু কিংবা ভোলানাথ কালিন্দীকে যদি পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দৈহিক পার্থক্য খুব অল্পই মনে হবে।

এইসব শ্রেণীর মানুষের, অর্থাৎ আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যে কেবল দৈহিক মিলই নয়—সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যটিও লক্ষ্য করবার মত। মহেশ্বর টুডুর গানে যেমন রাধা-কৃষ্ণ ও মহাভারত-রামায়ণের কথা শুনা গেছে, তেমনি ভোলানাথ কালিন্দীর গল্পেও আদিম উপজাতির লোক-বিশ্বাস এবং আচার-আচরণের নানা কাহিনী অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। অপরদিকে তারা ছো-নাচের আসরে বসে তাদের নিজকৃত পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের রস গ্রহণ করেছে। সুতরাং এই অঞ্চলের রূপকথা ও উপকথার উৎস ও অভিপ্রায় আবিষ্কার করতে গেলে সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম অধিবাসীগণের গল্পের উৎস আবিষ্করা করতে হবে এবং

তবেই পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার লোককথার উৎস ও অভিপ্রায় বুঝতে পারা যাবে।

শালবন আর কাঁকুরে মাটির এই শিলাময় প্রান্তরে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে, শাল আর মহুয়াবনের জঙ্গলের ভেতরে, সুবর্ণ-রেখার ধারে ধারে কুটির বেঁধে বাস করে এইসব সরল প্রকৃতি-বিশ্বাসী আদিম অধিবাসীর দল। কুসংস্কার আর প্রহেলিকাপূর্ণ আদিম বিশ্বাসে পরিপূর্ণ তাদের মন। তাই পদে পদে তাদের জীবনে নিষেধাজ্ঞা (Taboo)। তাই একদিকে 'সর্দার' আর অন্যদিকে 'গুণিন' এদের কাছে দেবতার তুল্য। কারণ তারা বিশ্বাস করে প্রকৃতিদত্ত অনেক ক্ষমতা এদের হাতে। নানারকম' টোটেম' এদের মধ্যে প্রচলিত। শবরের বংশধর বলে যারা পরিচিত তাদের মধ্যে শবর বিদ্যা বা ডাইনী তন্ত্র (witch craft) প্রচলিত। এইসব আদিম প্রকৃতি-বিশ্বাস এবং কুসংস্কার থেকেই এদের রচিত নানা গল্পকথা গড়ে উঠেছে এবং তার থেকেই আবির্ভূত হয়েছে এ অঞ্চলের যত রূপকথা আর উপকথা। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত লোকশ্রুতিবিদ ও লোককথা সংগ্রাহক P.O. Boodding-এর একটি সাঁওতাল লোককথা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'In Booding 85 there is a long and beautiful story of how Sabai grass first grew. Seven brothers killed their sister for when she cut her finger and blood went into the curry, it tested so delicious that they decided to eat more of her. Six of the brothers ate her flesh but the seventh burried his share and from it grew a beautiful bamboo. A man came along, cut it and made a fiddle from it. Suddenly a emerged from the fiddle. He made her part of his family and one day her brother visited the house. She told them who she was and they were so ashamed of their

crime that the eldest brother trampled on the ground and made a large hole. They all ran into it but before him last brother disappeared, the girl caught his hair and pulled it out. She spread it on the ground and it turned 'Sabai'.

[Man in India, Vol-XXIV page 227]

উপরোক্ত গল্পটিতে একটি আদিম বিশ্বাস কিভাবে কাহিনীর মাধ্যমে রূপলাভ করেছে তার পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। সাবাই ঘাস এইসব অঞ্চলের উপজাতিদের একটি অর্থনৈতিক উপকরণ। এটি দড়ি, চাটাই ইত্যাদি বোনার কাজে ব্যবহৃত হয়। সেই সাবাই ঘাসের কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে তারই কাহিনী এটি। গল্পটি যে আদিম উপজাতির সৃষ্টি তার প্রমাণ 'ভ্রাতৃগণ কর্তৃক ভগিনীর মাংস ভক্ষণ'। এইসব জাতি পূর্বে নরখাদক ছিল পরে কৃষিকার্য ইত্যাদি অনুধাবনের পরে নরখাদক আদিম উপজাতি কিভাবে কৃষিজীবী গ্রাম্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তারই ইঙ্গিত আছে গল্পটির মধ্যে। 'নরমাংস ভক্ষণ' আদিম অধিবাসীদের গল্পের একটি সুপরিচিত অভিপ্রায় (Motif)। এই 'নরখাদক' অভিপ্রায়টি আমরা যখন বাঙলার লোককথায় দেখতে পাই তখন এর উৎসের সন্ধান পেতে আমাদের বেশী বেগ পেতে হয় না। ১৯৬৬ সালে মেদিনীপুরের হাতিবাড়ী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি গল্পেও উক্ত অভিপ্রায়টি লক্ষ্য করা গেছে। গল্পটি হলো: 'পাঁচ ভাই আর এক বোন, বোনের নাম চাঁপা। তার বাবা মারা গেল। মা রান্না করতে পারে না, চাঁপা রান্না করে। একটানে শাক কাটতে কাটতে একদিন চাঁপার আঙুল কেটে গেল। রক্ত শাকে লেগে গেল। তার ভাইদের খেয়ে খুব ভালো লাগলো, তারা ভাবলো চাঁপার রক্ত এতো মিষ্টি নিশ্চয়ই ওর মাংস আরও মিষ্টি হবে। এদিকে চাঁপার বয়স হয়েছে, মা বললেন, মেয়ে এত বড় হলো, বিয়ে দাও।

পাঁচ ভাই মিলে চাঁপাকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে চললো, সঙ্গে নিল তীর ধনুক। চাঁপা জিজ্ঞেস করলো—তীর ধনুক নিয়ে কি করবে? ভাইরা, বললো পথে বন পড়বে তো, তাই তীর ধনুক নিয়েছি। তারা পথ চলতে লাগলো। পথে পড়লো একটা বড় পুকুর। ভাইরা চাঁপাকে বললো—চাঁপা জল খেয়ে আয়। চাঁপা যেই জলে নামলো, অমনি ভাইরা তীর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেললো। তারপর তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে খেয়ে ফেললো। ছোট ভাই কিন্তু খেলো না। ছোট ভাই এর ভাগটা তারা মাটিতে পুঁতে দিলো। সেখানে একটা পদ্মফুল ফুটলো। তারপর তারা বাড়ী ফিরে এলো।

এদিকে বৌ শ্বশুরবাড়ী যায় না। শ্বশুরবাড়ী থেকে তার ডাক এলো। চম্পার মা তো অবাক। বললেন, চাঁপা তো শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। শ্বশুর আর কি করবে? ফিরে এলো। যেতে যেতে সেই পুকুরের ধারে গিয়ে শ্বশুর উপস্থিত হলো, আর দেখলো—পুকুরের ধারে একটা গাছ, তাতে একটি ফুল ফুটে রয়েছে। আসলে সেটা চাঁপা। শ্বশুর সেই ফুলটা তুলতে গেছে, অমনি ফুলটা বলে উঠলো: 'শ্বশুর, পাতা ভেঙো না, ডাল ভেঙো না।' শ্বশুরের মনে সন্দেহ হলো, সে গিয়ে চাঁপাব মাকে সব কথা বললো। মা ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন। ছোট ভাই সবকথা বলে দিলো। তখন চাঁপার শ্বশুর মন্ত্রপড়ে চার ভাইকে পাষাণ করে দিলো। তাই দেখে চাঁপা সেই গাছ থেকে নেমে এল, আমার কথাটিও ফুরোল।'

উপরোক্ত গল্পটির সঙ্গে Bodding এর 85 নং এর গল্পটির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ গল্প দু'টিতেই ছোট বোনের রান্নার সঙ্গে রক্ত খেয়ে তার মাংস খাবার সাধ জেগেছে ভাইদের। দ্বিতীয়তঃ উভয় গল্পেই ছোটভাই বোনের মাংস খায়নি এবং পুঁতে রেখেছে। তফাৎ এই যে Bodding-এর গল্পে পুঁতে রাখা মাংস বাঁশ গাছ হয়েছে আর হাতিবাড়ীর গল্পে পদ্মফুল

ফুটেছে। সুতরাং বলা চলে গল্পটির উৎস আদিম জনসমাজ থেকে, পরে তা কিছু কিছু রূপান্তরিত হয়ে গ্রাম্যসমাজে প্রচারিত হয়েছে। এর উৎস যে আদিম জনসমাজ তার আরও উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ Verrier Elwin এর *Folk-Tales of Mohakoshal* গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

'The sister cooks her brothers, food and accidentally allows some of her blood to fall upon it. They decide to kill her, but the youngest brother objects. They take her to his jungle and persude her to sleep on a, machan The six elder brothers shoot at her, but all miss and then call the youngest and force him on pain of death to shoot. He aims his arrow in the opposite direction but it flies straight into his sister's body, and she dies. The brothers then cut up and roast their sister's body, giving the youngest brother the entrails and legs. He takes them some distance away but cooks fish and crabs instead, burying the entrails and legs of his sister in the ground. Before long a bamboo stalk shoots up from the hole where the girl's leg were buried. [Page 368]

তাহলে দেখা যাচ্ছে সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে ভগিনীর নরমাংস ভক্ষণের (Cannibalism) যে অভিপ্রায়টি প্রচলিত সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে মধ্যভারতের বীরহোড় উপজাতির মধ্যে। আবার এই নরমাংস ভক্ষণের অভিপ্রায়টি পাওয়া গেছে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার হাতিবাড়ী অঞ্চলে। ঝাড়গ্রাম জেলার শালের জঙ্গলে আদিবাসিদের

বহুকালের বাস। সুতরাং এই আদিবাসী সমাজ-জীবন এসব গল্পের উৎস একথা সহজেই অনুমান করা চলে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন রূপকথার যে রাজা-চরিত্র তার কোন নাম নেই। সে শিলাদিত্য, কি শালিবাহন, তার রাজত্ব কাঞ্চি কিংবা কাশী তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। সুতরাং একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক—রূপকথার এই যে রাজা এটি কে? রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকার' 'গল্প' কথিকাটিতে এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> 'যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়—সেই ঘর-ছাড়া মানুষ তেপান্তরের মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করছে। ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা, ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ—সে রাজপুত্তুর।'

কিন্তু বার বার প্রশ্ন জাগে এই রাজপুত্তুরটি কে, কি তার স্বরূপ, কোথায় তার উৎস। এবার আমরা যদি রাজপুত্তুরের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করবার চেষ্টা করি তাহলে তার উৎসটি সহজে আবিষ্কার হয়ে যাবে। এ অঞ্চলে সংগৃহীত একটি রূপকথায় দেখা যায় রাজা গাড়ু হাতে চলেছেন প্রাতঃকৃত্য করতে, গোমদা দেখতে পেয়ে বলে উঠেছে, 'রাজা প্রাতঃকৃত্য করতে করতে কুল খেয়েছে একথা সবাইকে বলে দোব।' তারপর রাজা তাকে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে তবে লোকলজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। একটি গল্পে দেখা গেছে রাজার রাণী নিজের হাতে বাসন মাজেন, মাছ কোটেন। কোন কোন গল্পে দেখা গেছে রাজা রাজকন্যার সঙ্গে অন্য এক রাজপুত্রের বিয়ে দিয়ে রাজ্যে রেখে দিয়েছেন, আবার নিজের পুত্র ভাগ্য সন্ধানে বহির্গত হয়ে অন্যদেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করে সেখানেই রাজত্ব শুরু করেছে। এসব থেকে মনে হয় রাজার সঙ্গে এসব অঞ্চলের উপজাতি প্রধান (tribal chief) এর কোন পার্থক্য নাই। পুত্র অপেক্ষা কন্যার পিতৃসম্পত্তিতে অধিক অধিকার—রূপকথার মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক আদিম সমাজের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অলৌকিক জন্মকথা ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া [Supernatural birth and Magic action] এ দুটি পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার রূপকথার সাধারণ অভিপ্রায় (Motif)। এ দুটি অভিপ্রায়ের জন্ম কথা আবিষ্কার করতে গেলেও সেই আদিম জনসমাজের কাছে আমাদের যেতে হবে। ঐন্দ্রজালিক উপায়ে পুত্র বা কন্যালাভ, ঐন্দ্রজালিক উপায়ে জীবনরক্ষা, অলৌকিকভাবে জন্মলাভ—এ সমস্তই যে আদিম বিশ্বাসের ফল তার একটি সার্থক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সাঁওতাল পরগণায় মাল্টো উপজাতির একটি লোককথার মধ্যে। [*'Malto Folk-Tales'*, Man in India, pp. 220.]

মাল্টো উপজাতির গল্পটির মধ্যে বাঙ্‌লা দেশের প্রচলিত বহু রূপকথার বিভিন্ন অভিপ্রায়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা বিক্রমপুর থেকে ১৩২০ সালে সংগৃহীত 'বেণুবতী' গল্পে (বাংলার লোক-সাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬:৫) দেখা যায় অনুরূপ অভিপ্রায়গুলিই প্রকাশ পেয়েছে। যথা: এক কন্যার প্রতি নিষ্ঠুরতা (cruelity), ভ্রাতৃবধূগণের দুষ্কার্য (misdeed) এবং তার শাস্তি (misdeed punished)। মাল্টো গল্পে যেমন পাতা ছিঁড়তে গেলে করম গাছ ছড়া কেটে গান গেয়ে উঠেছে, বেণুবতী গল্পেও তাই হয়েছে। ফুল তুলতে যাওয়া মাত্র বেণুবতী গেয়ে উঠেছে :

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না মোরে আমি ঝুমকালতা।
রাজকন্যা বেণুবতী সহি মর্মব্যথা॥
কাপড়ে লাগিল চুণ হৈল প্রাণনাশ।
বিধিবাম হৈল তাই মোর সর্বনাশ॥

চতুর্থতঃ রূপান্তর (Transformation)। মাটিতে প্রোথিত মৃতের হাড় মাংস থেকে লতা বা ফুলের আবির্ভাব। এই অলৌকিকতা একটি আদিম বিশ্বাসের ফল, Stith Thompson এই অভিপ্রায়টি সম্পর্কে বলেছেন: Reincarnation in plants (tree) growing on grove (E. 63)। পঞ্চমতঃ মৃতের পূর্ণ জীবন লাভ

উপরোক্ত দুটি গল্পেরই অন্যতম অভিপ্রায়। ষষ্ঠতঃ বাক্‌শক্তি সম্পন্ন লতা বা পুষ্প (Taking bird or plant) মাল্টো লোককথা ও বাঙলা দেশের রূপকথা উভয়েরই অভিপ্রায়।

পার্থক্যের মধ্যে বলা যায়। প্রথমতঃ মাল্টো উপজাতির লোককথার সর্দার 'বেণুবতী'র রূপকথায় 'রাজায়' রূপান্তরিত। উপজাতিদের 'সর্দার'-এর বাংলাদেশের 'রাজায়' রূপান্তরের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মাল্টো উপজাতির সাত ভাই এখানে চার পুত্রে রূপান্তরিত। এছাড়া অন্যান্য যে সব পার্থক্য আছে তাব পিছনে লোককথার পরিবর্তন-বিবর্তনের ধর্মই স্পষ্টভাবে ক্রিয়াশীল, ঐ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এইসব আদিম অধিবাসীদের লোককথাই বাঙলাদেশের রূপকথার উৎস এবং ঐসব আদিম বিশ্বাস বা সংস্কারই অনেক ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের এই পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের রূপকথার অভিপ্রায়গুলি সৃষ্টি করেছে। এ'কথার আরও সার্থক প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে মাল্টো উপজাতির 'নিষ্ঠুর বধূদে'র কাহিনীর অনুরূপ একটি লোককথা ঝাড়্গ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত 'শাঁখার সাধ'-এর সঙ্গে তুলনা করলে; পার্থক্যের মধ্যে মাল্টো লোককথার সাত ভাই ও এক বোনের বদলে ঝাড়গ্রামের লোক-কথায় সাতভাই এবং ছয় বউ-এ পরিণত হয়েছে। আর ওখানে বোনের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল, 'amarlata sari' আর ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের এই গল্পটিতে 'শাঁখা' তার স্থান অধিকার করেছে। গল্পটি হলো এই :

'সাত ভাই শিকারে গেল। ছয় ভাই তাদের ছয় বউকে শাঁখা কেনার টাকা দিয়ে গেল। একদিন ছয় বৌ মিলে শাঁখা কিনতে যাবে ঠিক করলো। ছোট বউ বললো, আমিও যাব। ছয় বৌ বললো, আমাদের স্বামীরা টাকা দিয়েছে, আমরা যাব, তোর স্বামী কি টাকা দিয়েছে ? ছোট বউ তাতেও যাবার জন্যে বায়না করলো। তখন ছয় বৌ মিলে ছোট বৌকে ঢেঁকিতে কুটে ফেলে হাড় মাসগুলো একটা পুকুরে ভাসিয়ে দিলো। দিন যায়

মাস যায়, ছয় বৌ মিলে একদিন স্নান করে ঐ পুকুরটার পাশ দিয়ে ফিরছিলো, দেখলো, পুকুরে বড় বড় শুশ্‌নি শাক হয়েছে। বাড়ীতে এসে শ্বশুরকে বললো, পুকুরে অনেক শুশ্‌নি শাক হয়েছে, তুলে আনুন। শ্বশুর তুলতে শাক গেলে শাকগুলো বলে উঠ্‌লো,

ছুবনে ছুবনে শ্বশুরা গো।
মুই তো শুশনাবতী॥
দাঁতিয়া শাঁখার তরে গো।
ঢেঁকিরে দিলান কুটি॥

শ্বশুরের শাক তোলা হোল না ফিরে এলো। কিছুদিন পরে আবার ছয় বৌ স্নান করে আসার পথে দেখলো সেই পুকুরে অনেক কলমী শাক হয়ে রয়েছে। আবার তারা শ্বশুরকে বললো, শ্বশুর শাক তুলতে গেলে শাকগুলো বলে উঠলো:

ছুবনে ছুবনে শ্বশুরা গো।
মুই তো কলমীবতী॥
দাঁতিয়া শাঁখার তরে গো।
ঢেঁকিরে দিলান কুটি॥

শ্বশুরের সন্দেহ হলো ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলো, ছোট বউ কোথায়? ছয় বৌ বললো বাপের বাড়ী গেছে। দিন যায়—মাস যায়। ছয় বৌ ঐ পুকুরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে এক দিন দেখলো ছাঁইচা শাক হয়েছে। ছয় বউ আবার শ্বশুরকে শাক তুলতে পাঠালো। শাকগুলো অমনি বলে উঠলো,

ছুবনে ছুবনে শ্বশুরা গো।
মুই তো ছাঁইচাবতী॥
দাঁতিয়া শাঁখার তরে গো।
ঢেঁকিরে দিলান কুটি॥

দিন গেল, মাস গেল, বছর গেলো। সাতভাই বাড়ী ফিরে আসার পথে পুকুরে একটা পদ্মফুল দেখতে পেল। সেই পুকুর

ধারের এক গৃহস্থ সাত ভাইকে ঐ পদ্মফুলটা এনে দিতে বললো। ছয় ভাই একে একে ফুল তুলতে গেল। কিন্তু ফুল কারো কাছেই এলো না। তখন ছোট ভাই গেলো, হাত নেড়ে ডাকতেই ফুলটি চলে এলো। ফুলটি নিয়ে সবাই বাড়ীতে এলো। বাড়ীতে এসে ফুলটি সব খুলে বললো। তখন সাত ভাই ছয় বৌকে তাড়িয়ে দিলো। ফুলটি ছোট ভাই যত্ন করে রেখে দিলো। ভোর বেলায় সকলে উঠে দেখতো সব কাজ কে করে রেখে গেছে। ছোট ভাই একদিন না ঘুমিয়ে লক্ষ্য করলো যে ছোট বউ ফুলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সব কাজ করে দিচ্ছে। ছোট ভাই ছোট বউকে ধরলো। বৌ বললো আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু ছোট ভাই তাকে আর ছাড়লো না। তারপর তারা সুখে ঘরকন্না করতে লাগলো।

উপরোক্ত লোককথাটির উৎস সন্ধান করলে মাল্টো উপজাতির লোককথাটির সঙ্গে বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে এ অঞ্চলের লোককথা বিশেষ করে রূপকথা ও উপকথার উৎস হচ্ছে ঐ সব আদিম উপজাতির নানা কথা ও কাহিনী থেকে। তাই উপরোক্ত গল্পটি বিচার করলে নিম্নলিখিত অভিপ্রায়-(Motif) গুলি পাওয়া যাবে : ক। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন লতা ও ফুল (Talking plant and flower) খ। সমাধিস্থান থেকে ফুলের জন্ম (Reincarnation in flower or plant growing on grave) গ। দুষ্কার্যের দণ্ড (Misdeed punished) ঘ। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় জীবন লাভ। এসব অভিপ্রায়ের উৎসও আদিম বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ডঃ ভেরিয়র এলউইন এর বক্তব্য উপস্থিত করা যেতে পারে। ভেরিয়ার এলউইন মধ্য ভারতের আদিম উপজাতির পুরাকাহিনী (myth)-র মধ্যে বাক্‌শক্তি সম্পন্ন গাছ ও ফুলের অভিপ্রায়টি লক্ষ্য করেছিলেন। কাহিনীটি তার ভাষায় এই : 'Mohadeo made a garden of Champa, Jasmine and

Keonra flowers in korbasera's enclosure. When his flowers blossomed they began to talk to each other, 'what lovely flowers we are, yet no one comes to play with us or marry us and we have to live here ignored by men.' Then they said again, 'let us go and put our grievance before the person who made us.' They asked the Jasmine, who is the Raja of flowers, to go to Mahadeo on their behalf.

সুতরাং এরকম উদাহরণ থেকেই সহজে অনুধাবন করা যেতে পারে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার রূপকথার মধ্যে বিশেষ করে বৃক্ষ, ফুল, ইত্যাদির যে বাক্-প্রবণতা দেখতে পাওয়া তার উৎস আদিম বিশ্বাস ও আদিম উপকথা। পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ করে মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের রূপকথায় আদিবাসী জনসমাজের সংস্কার, বিশ্বাস যে বিশেষভাবে জড়িত তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ অঞ্চলে সংগৃহীত আরও কয়েকটি গল্পের অভিপ্রায়ের মধ্যে। যথা, 'ট্যাবু' (Taboo) অর্থাৎ বিধিনিষেধ। এটি একটি আদিম সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ। এ সম্পর্কে অভিধানে বলা হয়েছে—A system of religious and social interdiction, and prohibition, the most famous and fundamental of the social institutions of Polynesia. ......Tabu sets apart a person, thing, place name (sometimes even the distinctive syllable of a name) or an action as untouchable, unmentionable. unsayable. [S. D. F. L. Page 1098]

বাংলাদেশের রূপকথাতেও এই অভিপ্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত। 'ঠাকুমার ঝুলি'র নীলকমল-লালকমলকে খোক্কসদিগের নিকট নীলকমলের নাম করতে নিষেধ করেছিল, এবং লালকমল সেটি অমান্য করায় বিপদে পড়েছিলো। 'ঠাকুরদার ঝুলি'র কাঞ্চনমালার

কাহিনীতে ইন্দ্র মালঞ্চমালাকে একটি পাখা দিয়ে উল্টো বাতাস করতে নিষেধ করেছিলো এবং সেটি অমান্যের ফলে বিপর্যয় ঘটেছিলো। আদিম সমাজে এইসব বিধিনিষেধ (Tabu)-গুলি কেবল নিছক সংস্কার ছিল না বরং প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় ছিল। তাই পরবর্তী ক্ষেত্রে এইসব বিধিনিষেধ কাহিনীর মধ্যে রূপলাভ করে নূতনতর কাহিনী সৃষ্টি করেছে। কোল উপজাতির মধ্যে একটি আদিম বিশ্বাস 'বসন্ত' রোগ হলে কয়েকটি জিনিষ আহার সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা (Tabu) কিভাবে পড়ে উঠেছে তার একটি কাহিনী উপস্থিত করা যেতে পারে :

'The coming of Diseases' : There were once seven sisters in heaven who were sent from there to the earth to live among men. As they left Bhagawan, they asked him for boons, for they said, unless they had power of some kind no one would respect them nor would men worship them. It happened that each was granted a boon. Khermai, called Bhagavati, chose the power of smallpox. If anyone should fail to please her, she will appear in that person in the form of smallpox. Or if not that, some other in the family will be with the pox, euphemistically called 'mata', 'mother'. She was given the power to remain in full control of their person for two and a half days, and during that time the sick person should be worshipped, for it really mans the worshipping of Bhagavati, and so men must respect and honour her for her power. Further honour must be shown by the whole family in the avoidance of certain foods such as pulses and 'ghi'. No frying pan should be used, and the inmates of the house should not wear leather shoes." ['Folklore of the Kols', Man in India Page 263]

উপরোক্ত গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে ভয়ঙ্কর বিভীৎসা বসন্তের আবির্ভাব সম্পর্কিত কাহিনী এবং ঐ রোগ সংক্রান্ত নানা আহার্য-

বস্তু সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা (Tabu)। ঐ ভাবেই আদিম জনসমাজ থেকে এইসব নিষেধাজ্ঞাগুলির উদ্ভব হয়ে আজ লোককথায়, গ্রাম্য মানুষের আচার-বিচারের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

এ ছাড়া বাংলার এ অঞ্চলের রূপকথার মধ্যে আরও বহু অভিপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া যায়, যার উৎসও আদিম সমাজ। 'আত্মার রূপান্তর (Transformation of soul), অলৌকিক জন্মকথা (Supernatural birth-motif), পশু-সন্তানের জন্ম (birth of animal child), পুনর্জীবন লাভ ইত্যাদি অভিপ্রায়-গুলি এ অঞ্চলের রূপকথাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। পরবর্তী আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে অর্থাৎ কুইলাপালের রূপকথা, হাতিবাড়ীর রূপকথা, নূতনডির লোককথা, দহমুড়ার উপকথা ইত্যাদিতে এর সুবিস্তীর্ণ আলোচনা, সংগ্রহ এবং বিচার বিশ্লেষণকে উপস্থিত করা হবে।

॥ দুইঃ হাতিবাড়ির রূপকথা ॥

হাতিবাড়ী একটি গ্রামের নাম। একদিকে সুবর্ণরেখা, অনুর্বর মাটির চড়াই উৎরাই, আর একদিকে ঘন অবিচ্ছিন্ন শালবন। সুবর্ণরেখার তরতরে নির্মল কাচলা জলে সোনা হয়তো ছড়ান নেই, কিন্তু তার তীরে তীরে গ্রামীণ মানুষের স্মৃতির মধ্যে জমা হয়ে আছে লোককথার এক এক বিরাট স্বর্ণখনি। সুবর্ণরেখা তাই রূপকথার যেন মায়াবী নদী। তাই তার স্বচ্ছ দেহের উপর পড়ে থাকা নানা রংয়ের অজস্র পাথরের নুড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে যখন জলস্রোত বয়ে যায়, তখন কান-পাতলেই শুনতে পাওয়া যায় সুবর্ণরেখা মৃদু স্বরে সেই কালো কাচলা পাথরগুলোকে বিচিত্র ধ্বনির মধ্য দিয়ে গল্প বলে চলেছে—এক রাজা আর এক রাজপুত্র। সাত সমুদ্র তের নদীর পার ইত্যাদি। সুবর্ণরেখার উজান বেয়ে যতই এগিয়ে যাই, ততই নির্জন, নিরাসক্ত, বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। মনে হয়,

ওগুলো যেন অজস্র গল্পের সমারোহ। নির্জন, রৌদ্রস্নাত দুপুরে—কিংবা চন্দ্রালোকিত রাতে ফিসফিস আওয়াজে কান পাতলেই শোনা যায়, সুবর্ণরেখার ছোট ছোট দ্বীপগুলো যেন গল্প বলে। কোন অতীত যুগের অনেক ভাঙ্গা গড়ার, অনেক ব্যথা বেদনার ইতিকথা যেন জমাট হয়ে আছে সুবর্ণরেখার দ্বীপগুলোর মধ্যে। আমি শুনেছি সেই আদিম দ্বীপগুলোর না-বলা গল্পের কাহিনী, আর জেলেদের দাঁড়ের সঙ্গে অনেক সংগীতের রেশ।

তুমিও পাবে অনেকখানি পথ পার হয়ে, বহু প্রান্তর অতিক্রম করে যদি পৌঁছাতে পার শালবনের প্রান্তে সুবর্ণরেখার ধারে। শুনতে পাবে, শালবনের শনশনানি, আর বাতাসের কানাকানি। অনেকখানি গল্প আর অনেকটা রূপকথার যেন মায়াবন বলে মনে হবে। এইতো সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীদের রাজ্য, একটু এগিয়ে গেলেই বুঝি সাতভাই চম্পার দেখা পাওয়া যেতে পারে। কলাবতী রাজকন্যা তার মেঘবরণ কেশ নিয়ে হয়তো তোমারই জন্য অপেক্ষারত। আর একটু এগিয়ে গেলেই বুঝি সেই রূপকথার গাছ—যেখানে বসে আছে হিরামন পাখী। এই বুঝি সেই অরণ্য, যেখানে রাজা তার ছোট মেয়েকে দিয়েছে বিসর্জন। শালবনের পাতার মর্মরধ্বনি আর শন্‌শন্‌ শব্দে মনে হবে এরা বুঝি এই সব কাহিনীই বলে চলেছে। তাই সুবর্ণরেখা আর শালবন বুঝি রূপকথার সোনার খনি।

শালবনের ধার ঘেঁসে রাঙ্গা কাঁকরের পথ, ঐ পথ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই একটা খাড়াই উঁচু জমি, আসলে এটা সুবর্ণরেখার বাঁধ। ঐ বাঁধ ধরে আস্তে আস্তে একটু নামলেই পড়বে সুবর্ণরেখা নদী। নামতে কিন্তু একটুও কষ্ট হবে না। দুপাশে বালি আর কাঁকরে মাটির উপরে ফুটে আছে অজস্র ফুল আর নানা জাতীয় গুল্ম। দেখতে ভারি সুন্দর—একটু পরেই বালির চর চক্‌চিক্‌ করছে সূর্যের সোনালী আলোয়। যেন মনে হচ্ছে অজস্র ছোট ছোট স্বর্ণকণা ছড়িয়ে রয়েছে সুবর্ণরেখার বালুচরে। সামনেই হয় তো জেলেদের

ডিঙ্গি বাঁধা, পার হয়ে ওপারে গেলেই বিস্তীর্ণ বালুচর—মাঝখানে একটা বটগাছ, তার তলায় অজস্র নুড়ি আর পোড়ামাটির পুতুলে সজ্জিত বনদেবতার আস্তানা। ক্লান্ত হয়ে থাকলে এখানে বসে একটু বিশ্রামও নেওয়া যেতে পারে। তারপর কিছুদূর গেলেই গ্রামের পথ। একহাঁটু ধূলো, তুপাশে ক্ষয়ে যাওয়া নিক্—গরুর গাড়ীর চাকার যাতায়াতের চিহ্ন। মোষ হয়তো নদীর দিকে চলেছে, কয়েকটি মেয়ে কলসী নিয়ে চলেছে নদীর ঘাটে, দূর থেকে ভেসে আসছে ঢেঁকির আওয়াজ, আর একটু এগিয়ে গেলেই ডান দিকে একটা ধানের মরাই, ভেতরের দিকে একটু এগিয়ে গেলেই সুরেন পাত্রের বাড়ী। এটি ডোমজুড়ি গ্রাম। বিহারের সিংভূম জেলায় এটির অবস্থান, সুরেন পাত্র কিন্তু বাংলা ভাষাতেই আহ্বান জানবে। খাটিয়া এগিয়ে দেবে বসতে, চক্চকে মাজা কাঁসার ঘটিতে দেবে জল, আর ডালায় করে একডালা মুড়ি। অতিথি সৎকারের পর জিজ্ঞেস করলেই খুলে দেবে তার অজস্র রূপকথার ভাণ্ডার।

"এক রাজা। তার ছ'টি মেয়ে। কোনো ছেলে নেই। একদিন রাজা তার মেয়েদের জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কে কার ভাগ্যে খাও?' সবাই বললো বাবার ভাগ্যে। ছোট মেয়ে বললো নিজের ভাগ্যে। রাজা ছোট মেয়েকে বনে নির্বাসন দিলেন। ছোট মেয়ে বনে পাতার ঘর বাঁধলো, আর ঘুঁটে কুড়োতে লাগলো। তারপর অনেক দিন চলে গেল। রাজা দেশান্তরে যাবে। মেয়েদের কি কি চাই জিজ্ঞেস করলে। সকলেই নিজের পছন্দমত জিনিস আনতে বললো। রাজা লোক পাঠালো বনে ছোট মেয়ের কাছে; ছোট মেয়ে কাজ করছিল। লোকটাকে বলল, 'সবুর কর।' সে ফিরে রাজাকে বললো ছোট মেয়ে 'সবুর কর' আনতে বলেছে। রাজা সবার জন্য জিনিস কিনলো কিন্তু 'সবুর কর' আর পেলো না। ফিরবার পথে দেখলো যে একজন লোক বাক্স করে 'সবুর কর' বিক্রী করছে। রাজা সাত হাজার টাকা দিয়ে সেটা কিনে নিলো। ঘরে ফিরে মেয়েকে জিনিসটা পাঠিয়ে দিলে। ছোট মেয়ে বাক্সটা

একপাশে ফেলে রাখলো। একদিন দুপুরবেলা সে বাক্স খুলে দেখলো যে তার ভেতরে একটা পাখা। যেমনি সে পাখায় হাওয়া করলো অমনি এক পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এক রাজপুত্র এসে হাজির হলো। জিজ্ঞাস করলো 'আমায় ডেকেছো কেন?' ছোট মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কে।' রাজপুত্র বললো, 'এই পাখাটা যার আমি তার।' তারপর রাজপুত্র ছোট মেয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে চলে গেলো। যাবার সময় বলে গেল যখন দরকার পড়বে আমায় ডাকবে। তারপর একদিন আবার পাখার হাওয়া করলো। রাজপুত্র বললো, 'তোমার বাবা মাকে একদিন নেমন্তন্ন কর।' বোনেরা এলো সঙ্গে কাঁচের গুঁড়ো নিয়ে। খেয়ে দেয়ে বিছানার নীচে কাঁচের গুঁড়ো ফেলে দিলো। বললো, 'কে তোর রাজপুত্র আছে ডাক?' রাজপুত্র এসে বিছানায় শুলো, কাঁচ ফুটতে বিরক্ত হয়ে চলে গেলো। রাজপুত্রের কাঁচের গুঁড়োয় কেটে গিয়ে ঘা হল। হাওয়া করলে আর আসে না। ছোট মেয়ে দেখলো বিছানায় কাঁচের গুঁড়ো। তখন সন্ন্যাসীর বেশে ছোট মেয়ে গভীর জঙ্গলে এসে পৌঁছালো। রাত্রি গভীর হওয়াতে একটা গাছের নীচে শুলো। গাছে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী থাকে, তাদের বাচ্চা হয়েছে। একটা সাপ বাচ্চাগুলোকে খেতে এলে সন্ন্যাসী সাপটাকে কেটে বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে দিলো। পাখীর মা ফিরতে বাচ্চারা সব খুলে বললো। সন্ন্যাসীও সব খুলে বললো। তখন ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী সন্ন্যাসীর উপকার করতে চাইলো। বললে, আমাদের বিষ্ঠা রাজপুত্রকে মাখালে রাজপুত্র ঠিক হয়ে যাবে। পাখীর পিঠে চেপে রাজকন্যা রাজপুত্রের দেশে গেলো। রাজপুত্রের বাবাকে বললে, 'আমি সারাবো রাজপুত্রকে।' কিন্তু আমাকে একা ঘরে থাকতে দিতে হবে। রাজপুত্র ভাল হলো। রাজা রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি চাই'; ছোট মেয়ে রাজপুত্রের আংটি আর খড়ম জোড়া নিয়ে ফিরে এলো বনে। ছোট মেয়ে আবার হাওয়া করলো পাখায়। রাজপুত্র এসে হাজির হলো। ছোট মেয়ে সব খুলে বললে, তারা সুখে ঘর সংসার করতে

লাগলো। [বিহারের সিংভূম জেলার ডোমজুড়ি গ্রাম থেকে সংগৃহীত। সুরেন পাত্র কর্তৃক কথিত। ১. ৫. ৬৬.]

উপরোক্ত সংগ্রহটি কয়েকটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ লোক-চিন্তা যে কোনো বিশেষ আঞ্চলিকতা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় এই লোক-কথাটি তারই প্রমাণ দেয়। বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা তিনটি প্রদেশ এখানে একত্র হলেও মোটামুটি বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যই প্রভাব ফেলেছে। বিহারের সীমান্তেও বাংলার লোকশ্রুতির বিস্তার যে কতদূর এই সংগ্রহটিই তার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে Archer Taylor-এর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। Folklore consists of materials that are handed on traditionally from generation to generation without a reliable ascription to an inventor or author' অর্থাৎ লোকশ্রুতি হচ্ছে এমন বিষয় যা লেখক বা আবিষ্কারক বহির্ভূত, ঐতিহ্যগত ভাবে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত। বিহার হলেও সুরেন পাত্রের পূর্বপুরুষ হয়তো বাংলাদেশেরই অধিবাসী ছিল। তাদের বংশপরম্পরাক্রমে এই লোকশ্রুতি প্রচলিত। তাই বিহারের অধিবাসী হলেও বাংলাদেশের রূপকথার ঐতিহ্যকে সে ধারণ করে আছে।

দ্বিতীয়তঃ গল্পের এই মূল কাঠামোটি অন্যান্য লোক-কথার মধ্যেও পাওয়া যায়, অর্থাৎ লোক-কথার একটি ধর্ম হচ্ছে বিবর্তন এবং পরিবর্তন। তার কারণ হিসাবে Stith Thompson-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'The common idea present in all Folklore is that of tradtion, something handed down from one person to another and preserved either in memory or in practice rather than written record'— সুতরাং যেহেতু কেবলমাত্র 'স্মরণে'র এবং 'ব্যবহারে'র মধ্যেই লোকশ্রুতি সীমাবদ্ধ সেই হেতু তার পরিবর্তনও স্বাভাবিক। এই লোক-কথাটির সঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক-

সাহিত্য' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে 'সবুর' নামক একটি গল্পের মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে কিছু কিছু অংশে পার্থক্যও বিদ্যমান। যথা, ক। এই সংগৃহীত লোক-কথাটিতে ছোট মেয়েকে রাজার কন্যা হিসাবে বলা হয়েছে। 'সবুর' গল্পে রাজার পরিবর্তে সদাগর উপস্থিত, কন্যাসংখ্যা সেখানে সাত, কিন্তু বর্তমান গল্পে ছয়। খ। 'সবুর' গল্পে ছোট মেয়ে সেলাই করার জন্যে ছুঁচ-সূতোর বাক্স ঘরে নিয়ে গেছে, আর ধাত্রীমাতা ময়ূরের পাখা তৈরী করে জীবন ধারণ করেছে। কিন্তু সংগৃহীত গল্পটিতে ঘুঁটে কুড়িয়ে রাজকন্যা জীবন-ধারণ করছে। গ। সবুর গল্পটিতে সবুর বলতে একটি পাখা এবং আয়না দুই-ই বলা হয়েছে। কিন্তু সংগৃহীত গল্পটিতে সবুর বলতে একটি পাখার কথাই বলা হয়েছে। ঘ। 'সবুর' গল্পে যেখানে বিষের উল্লেখ করা হয়েছে, সংগৃহীত গল্পটিতে সেখানে কাঁচের গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য—'বিষ দিয়া ভগ্নী হত্যা করিবার মধ্যে বৈদেশিক প্রভাব থাকা সম্ভব।' কিন্তু সংগৃহীত গল্পটিতে বাংলাদেশের রূপকথার বহুপ্রচলিত কাঁচের গুড়ো ছড়ানোর মধ্যে দেশীয় ভাব অধিক পরিলক্ষিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগের লোক-সাহিত্য বিশেষ পত্রের এবং পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের সভ্যসভ্যাগণ পরিচালিত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের মে মাসে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার হাতিবাড়ীতে যে লোক-সাহিত্য সংগ্রহ শিবির স্থাপিত হয়, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলের লোক-সাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ, তার শ্রেণীবিভাগ, বিচার এবং পর্যালোচনা করা। এই শিবিরের আর একটী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, সুবিপুল লোক-কথার স্বর্ণভাণ্ডারের আবিষ্কার। সুবর্ণরেখা নদীকে কেন্দ্র করে হয়তো একদিন সুদূর অতীতে স্বর্ণসংগ্রহণকারী বিদেশী নানা জাতির অভিযান পরিচালিত হয়েছিল এই অঞ্চলে। অনেক দূরাগত রহস্য

আবিষ্কারের উন্মাদনা, দ্বন্দ্বসংঘর্ষ, যুদ্ধবিগ্রহের সম্মুখীন হয়েছিল এই অঞ্চলের পূর্বপুরুষেরা এবং সেই সঞ্চিত বিস্ময়কে কেন্দ্র করে যুগযুগান্তর ধরে যে বিশাল লোক-কথার ভাণ্ডার রচিত হয়েছে তা আজও জমা হয়ে আছে এই অঞ্চলের বহু নরনারীর অন্তরের মধ্যে। আমরাও এই অঞ্চলে প্রচলিত লোকশ্রুতিসংগ্রহের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বহু লোক-কথা সংগ্রহ করেছি। এই লোক-কথার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার পূর্বে বিশ্বে প্রচলিত লোকশ্রুতিসংগ্রহ এবং পর্যালোচনার পদ্ধতিগুলি বিচার করে দেখা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে R. D. Jameson-এর আলোচনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি পাঁচটি পদ্ধতিতে লোকশ্রুতি সংগ্রহ এবং আলোচনার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, 'The methods of the study of Folklore are : 1. Collection of the data as they actually occur........; 2. a comparison of the data to determine what are the similarities and differences of these phenomena in the several ethnic groups ; 3. an examination of the beliefs implicit in the data ; 4. of the social and psychological impulses which produce them ; 5. the functions of folkore performs for the individuals and social groups through which they operate' [S. D. F. L. pp. 400.] অর্থাৎ লোকশ্রুতি পর্যালোচনার পাঁচটি দিক আছে। প্রথমতঃ যথাযথ সংগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্দেশ, তৃতীয়তঃ সংগৃহীত বিষয়গুলির মধ্যে লোক-বিশ্বাসের স্বরূপ নির্ণয় করা, চতুর্থতঃ কোন্ সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এর সৃষ্টি তা নির্ণয় করা, পঞ্চমতঃ ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনের উপর সংগৃহীত লোকশ্রুতির প্রভাব কতখানি তা বিচার করা।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে হাতীবাড়ী সংগ্রহ শিবিরের লোক-কথাগুলি এবার পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ অধ্যাপক Stith Thompson লোক-কথার অভিপ্রায় (motif) অনুযায়ী যে motif index তৈরী করেন হাতিবাড়ী লোক-কথার সংগ্রহগুলি সেই অনুসারে বিভাগ করা যেতে পারে। যেমন, পশুপক্ষী সংক্রান্ত (animals), নিষেধাজ্ঞা (taboo), ইন্দ্রজাল (magic), রাক্ষস (ogres). পণ্ডিত এবং মূর্খ (the wise and the foolish), প্রতারণা (deception), ভাগ্যবিপর্যয় (reversal of fortune) ইত্যাদি A থেকে Z পর্যন্ত তাঁর যে বিভাগ তার, সমস্ত শ্রেণীরই গল্প হাতিবাড়ী অঞ্চলে সংগৃহীত হয়েছে। এই সংগ্রহের বিভিন্ন শ্রেণীর গল্প সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক-সাহিত্য' (৪র্থ খণ্ড) অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। সেখানে তিনি এই গল্পগুলিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অলৌকিক জন্মকথা, ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া, নির্বুদ্ধিতার কথা ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং বিভিন্ন নামকরণ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ এই সংগ্রহগুলির সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য নির্ণয়। এই প্রবন্ধের প্রথমে সুরেন পাত্র কথিত যে রূপকথাটি উপস্থিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে ঐ অঞ্চলেই সংগৃহীত একই ধরণের আর একটি রূপকথা ডঃ ভট্টাচার্যের ঐ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আমি আলোচনা করে প্রমাণ করেছি যে, একই বিষয়বস্তু নিয়ে একই রূপকথা বা উপকথা অনেক সময় বিভিন্ন ভাবে বিবর্তিত হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে ঐ একই শিবিরে সংগৃহীত আর একটি লোক-কথা উপস্থিত করা যেতে পারে। গল্পটি শ্রীজীতবাহন কুইলা কর্তৃক কথিত এবং ৩. ৫. ৬৬. তারিখে সংগৃহীত। গল্পটি হলো এই :

চার বন্ধু ॥ রাজার পো, মন্ত্রীর পো, কোটালের পো, নাপিতের পো। এই চার বন্ধু ঠিক করলো বিদেশে যাবে। চারটে ঘোড়া নিয়ে বেরুলো। ঘোড়ারা রাজার ছেলেকে নিয়ে যেতে চাইলো না। পক্ষীরাজ ঘোড়া বললো 'আমি রাজার ছেলেকে নিয়ে

যাবো।' অন্য ঘোড়াগুলো বড়। পক্ষীরাজ ছোট ঘোড়া। তাই যেতে যেতে রাত হয়ে গেল। সামনে ছিল মালিনীর বাড়ী। মালিনী রাজাকে ফুল জোগায়। চার বন্ধু ঠিক করলো চার প্রহরে চারজন জেগে থাকবে। প্রথম প্রহরে মন্ত্রীর পো দেখলো, মালিনী ঘরের একটা কোণ থেকে কতকগুলো হাড়গোড় জড়ো করলো। মন্ত্রীর পো দেখলো যে সে হাড়গোড়গুলো জুড়ে দিলো। কোটালের পো দেখলো মালিনী মন্ত্র পড়ে হাড়গুলোর গায়ে মাংস লাগালো। রাজার পো দেখলো মন্ত্র পড়ে মালিনী তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলো এবং তার মাংস খেয়ে হাড়গোড়গুলো আবার পুঁতে রাখলো। ভোর হতেই সকলে চলে এসে একটা নদীর ধারে পৌঁছল। রান্না হবে। রাজার পো রাঁধবে। আর বাকী সব কাঠ জোগাড় করতে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলো, একটা শিকারী বাঘ শিকার করেছে। তার হাড়গোড়গুলো তারা নিয়ে এলো। তারপর তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে বাঘটা আবার বনে চলে গেল। চার বন্ধুই মালিনীর কাছ থেকে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র শিখে এসেছিল। এরপর তারা খাওয়া দাওয়া সেরে ঠিক করলো তারা চারজন চারদিকে যাবে। তবে একটা সর্ত হলো যে, একটা দাঁতনকে তারা রোজ চার টুকরো করে তিন টুকরো পুঁতে দেবে। আর প্রত্যেকের খাবার চারভাগ করে তিনভাগ পুতে রাখবে। এদিকে রাজপুত্র অন্য এক রাজ্যের মালিনীর বাড়ীতে এসে উঠলো এবং কিছুদিন পরে সেই দেশের রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হলো। রাজপুত্র বললে, 'আমার এক ব্রত আছে। বারো বছর ধরে বালক ভোজন করাতে হবে।' বারো বছর শেষ হতে আর দু'মাস বাকী। এমন সময় অন্য তিনজন বালক এসে হাজির হলো। কিন্তু নিয়ম ছিল যে কারো ছাঁদা বাঁধা চলবে না। এরা সেই রাজপুত্রের তিন বন্ধু। তারা ঠিক করলো ছাঁদা যখন বাঁধা চলবে না, তখন তারা চারটে করে পাতা আর সব চারটে করে নিলো। রাজপুত্র তাদের চিনতে পারলো না। ছাঁদা বাঁধার

জন্য সেপাই এসে জোর করে নিয়ে গেলো। তিন বন্ধু সব খুলে বললো, আর বললো, রাজার ছেলে মারা গেছে। রাজপুত্র বললো, 'আমিই সেই রাজপুত্র।' কিন্তু তারা দেখলো যে রাজপুত্রও চারটে করে সব জিনিস নিয়ে তিনটে করে পুঁতে রাখছে। তখন তারা সব বুঝতে পারল। রাজপুত্র তার বৌকে নিয়ে আর তিন বন্ধুকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেল।

অনুরূপ একটি গল্প আমরা ডঃ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক-সাহিত্য' (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থের ৬৭৬ পৃষ্ঠায় দেখতে পাই। 'বন্ধুত্বের কথা' এই পর্যায়ে 'চারবন্ধু' নামক গল্পটির সঙ্গে সংগৃহীত গল্পের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ বৈসাদৃশ্য হিসাবে বলা চলে যে, চার বন্ধু যেখানে সংগৃহীত গল্পে মালিনীর বাড়ীতে রাত কাটিয়েছিল, এখানে তারা এক মন্দিরে সন্ন্যাসীর আস্তানায় রাত্রি যাপন করেছে। ওখানে মালিনীর মন্ত্রপাঠে হাড়গোড় একত্রিত হওয়ার কথা আছে, এখানে সন্ন্যাসীর মন্ত্রে তা ঘটেছে। ওখানে চার বন্ধুর মধ্যে একজন নাপিতপুত্র আছে, এখানে একজন সদাগরপুত্র। সংগৃহীত গল্পে চার বন্ধু চারদিকে গিয়েছিলো এবং চুক্তি ছিল যে চার ভাগ করে তারা তাদের অন্ন খাবে এবং দাঁতন-গুলি চারভাগ করবে। অর্থাৎ তারা বন্ধুত্বের কথা কখনও বিস্মৃত হবে না। এই গল্পে সে রকম কিছু উল্লেখ নেই। এই গল্পে তিনজন রাক্ষসীর উল্লেখ আছে, সংগৃহীত গল্পে তার কোনো উল্লেখ নেই। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর গল্পটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'চারি বন্ধুতে রাত্রির চারি প্রহর জাগিয়া থাকিয়া চারি প্রকার বিদ্যালাভের কাহিনী বাংলা এবং বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলে নিতান্ত সাধারণ। এই কাহিনীর শেষাংশের সঙ্গে প্রথমাংশের যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ, মনে হয়, ইহা স্বতন্ত্র কোনো কাহিনী হইতে আসিয়া প্রথমাংশের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।' ['বাংলার লোক-সাহিত্য,' ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৭৯]

অভিপ্রায় বিচার করা লোক-কথা সংগ্রহের এবং পর্যালোচনার

একটি অন্যতম বিষয়। উপরোক্ত সংগৃহীত গল্পটিতে কয়েকটি অভিপ্রায় (motif) ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমতঃ মন্ত্রদ্বারা পুনর্জীবন লাভ বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি সুপরিচিত অভিপ্রায়। দ্বিতীয়তঃ নরমাংস ভক্ষণ, যাকে আমরা রাক্ষস (ogres) অভিপ্রায় রূপে অভিহিত করতে পারি। তৃতীয়তঃ বন্ধুত্ব (friendship)। এ প্রসঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্যের অভিমত প্রণিধানযোগ্য, 'বাংলার লোক-কথার একটি বিশেষ অংশে বন্ধুব সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কাহিনী প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রথমতঃ কৃতজ্ঞ বন্ধুর কথা এবং দ্বিতীয়তঃ অকৃতজ্ঞ বন্ধুর কথা।' [বাংলার লোক-সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৬১]। সংগৃহীত গল্পটিতে বন্ধুত্বের প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ কৃতজ্ঞতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। বন্ধুত্বের এই নিবিড় সম্পর্ক কেবলমাত্র বাংলাদেশের লোকসমাজেই নয়, বাংলার আদিবাসী সমাজেও কিরূপ প্রচলিত P. O. Bodding-এর একটি মত উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে। 'The matter here referred to is a peculiar custom by which an intimate and life-long friendship is established between two persons of the same sex.' [*Santal Folk Tales, V. I.*]

'কৃতি কনিষ্ঠ সন্তান' (Successful Youngest Child) কেবল বাংলাদেশেরই নয় সমস্ত পৃথিবীর লোক-কথারই একটি প্রধানতম অভিপ্রায় (motif)। সংগৃহীত প্রথম গল্পটিতে ছোট মেয়ের কৃতকার্যতার কথা বলা হয়েছে। হাতিবাড়ী সংগ্রহশিবিরে ঝাড়াপাড়া গ্রাম থেকে কাদম্বরী দেবী কথিত ১. ৫. ৬৬. তারিখে সংগৃহীত একটি রূপকথায় ছোট ছেলের কৃতকার্যতার কথা পাওয়া যায়। লোককথাটি এই :

'এক রাজার তিন ছেলে। বড় ছেলে, মেজ ছেলে, ছোট ছেলে। একদিন রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললো, 'কার হাতে রাজত্ব দেবো, বল ?' মন্ত্রী বললো, 'ছোট ছেলেকেই রাজত্ব দিন।' রাজার বড় ও

মেজ ছেলে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো—কেবল মতলব আঁটতে লাগলো ! কি করে ছোট ভাইকে মারা যায়। তারপর একদিন ভুলিয়ে তাকে বনে নিয়ে যেয়ে মেরে একটা গাছের তলায় ফেলে রেখে চলে গেল। এদিকে অন্য এক রাজ্যের রাজার মেয়ে এলো দাসীকে সঙ্গে নিয়ে বনদেবতার পূজা করতে। দাসীকে বলল ঐ যে সুন্দর ছেলেটি শুয়ে আছে, ওকেই আমি বিয়ে করবো। কিন্তু কাছে যেয়ে তিনবার ডেকে যখন তার সাড়া পেলো না তখন বলল, 'আমি যখন মনে মনে ঠিক করেছি, তখন একেই বিয়ে করবো। দাসী কিন্তু মরা রাজপুত্রকে ছুঁতে চাইলো না। তখন রাজকন্যা নিজেই কাঁধে করে মরা রাজপুত্রকে রাজপুরীতে নিয়ে এলো। রাজ্যের লোকেরা ভাবলো রাজকন্যা বুঝি ডাইনী। তখন তারা সবাই মিলে রাজকন্যাকে মৃতদেহটার সঙ্গে বেঁধে সমুদ্রের ধারে ফেলে দিয়ে এলো। রাজকন্যা ভাবতে লাগলো, একে তো এক্ষুনি কুমীরে খেয়ে নেবে। এমন সময়ে শবটা 'রাম রাম' বলে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কে'? রাজকন্যা তখন তাকে সব খুলে বললো। রাজপুত্র বললো, 'তুমি এখানে থাকো, আমি বন থেকে ফলমূল নিয়ে আসি। তবে কারও সঙ্গে তুমি কোনো কথা বোলো না। এদিকে রাজপুত্রের বড় এবং মেজো ভাই বাণিজ্য করে ফিরছে। মেয়েটিকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কে?' রাজকন্যা কোনো উত্তর দিল না। তারা মেয়েটিকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলো। এদিকে রাজপুত্র খুঁজতে খুঁজতে রাজকন্যার বাবার রাজ্যে এসে উপস্থিত হলো। রাজা রাজকন্যার নির্বাসনের পর মন্ত্রীকে রাজ্য দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলো। রাজপুত্রের মুখে সব শুনে রাজা তাকে রাজত্ব দিলো এবং রাজপুত্র তার ভায়েদের পরাস্ত করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো এবং দুজনে সুখে ঘরকন্না করতে লাগলো।

উপরোক্ত লোক কথাটিতে চারটি প্রধান অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়। ১। নিষেধাজ্ঞা (taboo), ২। প্রতারণা (deception),

৩। কৃতি-কনিষ্ঠসন্তান (successul youngest child), ৪। পুনর্জন্ম (reincarnation) অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা যে কটি রূপকথার প্রচলিত অভিপ্রায় সে প্রসঙ্গে একটি আভিধানিক উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। The basic motif of countles folk-tales occurring every where in the world, in which the life, happiness, success or failure of the character depends upon the observation or violation of some tabu.·······There are numerous stories also involving eating and drinking tabus. looking, touching, speaking, saying tabus, boasting, laughing, etc. (S. D. F. L. Page 1099). উপরোক্ত হাতিবাড়ী অঞ্চলে প্রাপ্ত গল্পটিতে দেখা যাচ্ছে ছোট রাজপুত্র রাজকন্যাকে কারো সঙ্গে কথা বলতে বারণ করে দিয়ে ছিলো। এবং সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কথা বলার জন্যে ছোট রাজপুত্রের বড় ভায়েরা রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো এবং নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। সুতরাং বলা যেতে ঐ গল্পে যে নিষেধাজ্ঞাটি প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে 'কথা বলা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা' অর্থাৎ অভিধানের ভাষায় 'speaking and saying tabu'।

আর একটি অভিপ্রায় সমগ্র গল্পটি নিয়ন্ত্রিত করেছে তা হচ্ছে প্রতারণা (Deception)। মন্ত্রীর কথায় ছোট ছেলেকে রাজত্ব দেওয়ার পর থেকে অন্যান্য ভায়েরা কিভাবে তাকে প্রতারণার দ্বারা হত্যা করে রাজত্ব পাবার চেষ্টা করতে লাগলো তার আনুপূর্বিক কাহিনী রূপকথাটিতে উপস্থিত করা হয়েছে। এই প্রতারণার অভিপ্রায়টির উৎস হিসাবে বলা যেতে পারে, আদিম মনোবৃত্তি। কারণ রাজত্ব নিয়ে এই যে ভ্রাতৃবিরোধ বা ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এর উৎস আদিম জনসমাজ। কারণ বাংলাদেশের রূপকথার 'রাজা' যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আচার-আচরণে সর্দার বা উপজাতি প্রধান (tribal chief) রূপে প্রতিভাত হয়, তাহলে তার সন্তানগণ যে সর্দার বা

দলপতির পুত্র হবে এটাই স্বাভাবিক। এদের আচার-আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই হিংসা, দ্বেষ, শঠতা, অবিশ্বাস আর প্রতারণায় পরিপূর্ণ। প্রাচীন বৈদিক সমাজে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। রাজার জীবিতকালে তিনি যুবরাজ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রাজা নির্বাচন করে যেতেন। অবশ্য গোলোযোগ যে হোত না তা নয়, রামায়ণে রামচন্দ্রের নির্বাসনে কৈকেয়ীর হিংসা আর তার ফলে বনগমন তাই-ই প্রমাণ করে। কিন্তু তথাপি বলা চলে ভরতের উদাহরণে ভ্রাতৃবিরোধ অল্পই। ধর্ম ও সমাজ একটা নিয়ম করে দেওয়াতেই এটা সম্ভবপর হয়ে ছিলো। কিন্তু আদিম উপজাতির মধ্যে দেখা গেছে সর্দারের মৃত্যুর পর সর্দারের পুত্রই হয়ত দলনেতা নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—অন্যান্য পুত্রদের গোলযোগও দেখা গেছে। তাই মনে হয় এরই প্রভাবে সমগ্র বাংলাদেশের তথা সীমান্ত-অঞ্চলের রূপকথাগুলিতে রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে সর্বদা বিরোধ বেঁধেছে, ভ্রাতাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ এবং প্রতারণা ইত্যাদি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

তৃতীয়তঃ যে অভিপ্রায়টি এখানে বিশেষ কার্যকরী হয়েছে ত হচ্ছে কৃতি কনিষ্ঠসন্তান (successful youngest child)। বাংলাদেশের রূপকথার কনিষ্ঠপুত্র বা কনিষ্ঠকন্যা সর্বক্ষেত্রেই অন্যান্যের চেয়ে অধিক সাফল্য লাভ করেছে 'youngest son' সম্পর্কে শুধু এদেশেই নয়, অন্যান্য দেশের রূপকথাতেও নানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য উপস্থিত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে—The central figure of widespread group of folk-tales about the victorious youngest child (Lo-199). The youngest son (usually of three) performs a required, seemingly imppossible task or quest (H 1242) at which the elders fail or are caught and put to death during their efforts, or are rescued by the youngest (R 155. 1). [ibid page 1192]। হাতিবাড়ীতে সংগৃহীত

গল্পটিতে দেখা যাচ্ছে রাজার কনিষ্ঠপুত্র রাজ্যপ্রাপ্তির পর তাকে—অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দের নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাজকন্যার জন্যে জীবন ফিরে পাওয়ার পরও জ্যেষ্ঠ ভায়েদের প্রতারণার সম্মুখীন হতে হয়েছ। কিন্তু পরিশেষে অন্যান্য রূপকথার মত কনিষ্ঠ রাজপুত্রই জয়যুক্ত হয়েছে—ও সুখে ঘরকন্না করেছে।

চতুর্থতঃ রূপকথাটিতে যে অপর অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হয়েছে তা Reincarnation অর্থাৎ পুনর্জন্মলাভ। এটি পৃথিবী ব্যাপী রূপকথার একটি সাধারণ অভিপ্রায়। এই গল্পটিতে রাজপুত্রর মৃতদেহ কোলে করে রাজকন্যা সমুদ্রের তীরে জীবনলাভের আশায় বসে থাকতে থাকতে মৃতদেহ 'রামরাম' বলে উঠেছে। স্ত্রী হয়ে মৃত স্বামীকে নিয়ে অনির্দেশ্য যাত্রা এবং পরিশেষে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে পাওয়া মনসা মঙ্গলে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীর মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত।

হাতিবাড়ী অঞ্চলটির অবস্থান বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। একদিকে উড়িষ্যা অন্যদিকে বিহারের সীমান্ত, একদিকে সুবর্ণরেখা অন্যদিকে গভীর জঙ্গল আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ী টিলা। লাল কাঁকর বা বালিতে মেশানো মাটি। বাঙালী, বিহারী আর ওড়িয়া মানুষ পাশাপাশি বাস করে—ভাষার মধ্যে তাই মিশ্রণ। ডোমজুড়ি গ্রামের মানুষ হিন্দিতে কথা বলে, ঝাড়াপাড়া গ্রামের অধিবাসী ওড়িয়া ভাষায় কথা বলে এবং যখন মানসিক চর্চা শুরু হয় তখন তাদের আসল যে পরিচয়টি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে বাঙালীত্ব, সাংস্কৃতিক মানসের দিক থেকে এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঙালী হলেও ভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মিশ্রণ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আবার এরই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে আদিবাসী সম্প্রদায়। ফলে এদিকে বিভিন্ন প্রাদেশিক মিশ্রণ, অন্যদিকে আদিবাসী প্রভাব এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতিকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছে। তাই বিভিন্ন অভিপ্রায়ের গল্প সংগৃহীত হয়েছে এই অঞ্চল-সন্নিহিত বিভিন্ন গ্রাম থেকে।

নরমাংসাহার (cannibalism) আদিম জনসমাজের কথা ও কাহিনীর একটি সুপরিচিত অভিপ্রায়। কিন্তু পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এই গ্রামগুলিতে আদিম সমাজের গভীর মিশ্রণের ফলে আদিবাসী জনসমাজের কতকগুলি জীবনাচারণ এই গল্পগুলির মধ্যে রূপলাভ করেছে। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার হাতিবাড়ী অঞ্চলে সংগৃহীত একটি গল্পে ভ্রাতৃগণকর্তৃক ভগ্নীর মাংসাহারের একটি মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী পাওয়া যায়। গল্পটি এই :

‘এক রাজার সাত ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েটির নাম কাঞ্চনী। বিয়ের পর কাঞ্চনী বাপের বাড়ী এসেছে, কয়েকদিন থেকেই চলে যাবে। কিছুদিন পর সাত ভাই মিলে কাঞ্চনীকে শ্বশুরবাড়ী দিয়ে আসতে গেল। পথে যেতে যেতে সাত ভাই বোনটিকে নিয়ে এক জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছল। সেই জঙ্গলে বোনকে মারবার জন্যে সাতভাই মিলে যুক্তি করলে।

প্রথম ভাই বলল—যাইতে যাইতে তিরিকার।

কাঞ্চনী বলল—আস্তু আস্তু, ভাই, বাঁদি কাঁদি যাও পরায়ি।

দ্বিতীয় ভাই বলল—যাউচি যাউচি, দিদি তিরিকার

ডাহন দিগদি, দিদি, যাউ পরায়ি।

কাঞ্চনী—যাতি দিগদি যাউ পরায়ি।

৩ ভাই—যাউচি যাউচি, দিদি, তিরিকার।

কাঞ্চনী—যাউ যাউ, ভাই, মাথা উপরদি যাও পরায়ি।

৪ ভাই—যাউচি যাউচি, দিদি, তিরিকার।

কাঞ্চনী—পাপ তরদি যাউ পরায়ি।

৫ ভাই—যাউচি যাউচি, দিদি, তিরিকার।

কাঞ্চনী—ডাহন পাদদি যাউ পরায়ি।

৫ ভাই—যাউচি যাউচি দিদি তিরিকার।

কাঞ্চনী—আস্তু আস্তু, কম মুলে দে যাও পরায়ি।

৭ ভাই—যাউচি যাউচি, দিদি, তিরিকার।

কাঞ্চনী—আস্তু আস্তু ভাই কণ্ঠ উপর যাউ পরায়ি।

তারপর কাঞ্চনীকে মেরে ফেলা হলো। তখন সাত ভায়ের খাবার জন্য কাঞ্চনীর দেহের মাংসকে ভাগ করা হ'ল। সেই সময় ছোট ভাই নদীতে গিয়ে মাছ আর কাঁকড়া ধরে আনল এবং সেগুলি পুড়িয়ে খেল এবং তার ভাগের মাংসটা মাটিতে পুঁতে রাখল। সেখানে একটা ফুলের গাছ হলো, তাতে একটি মাত্র ফুল ফুটলো। এদিকে কাঞ্চনী শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে না দেখে শ্বশুর ও শাশুড়ী কাঞ্চনীকে নিতে তার বাপের বাড়ী এলো, পথে সেই ফুল গাছটায় একটি মাত্র ফুল দেখতে পেল। শ্বশুর বলল, 'তোমার বৌয়ের জন্য ফুল নিয়ে যাব।' ফুলটা বললো,

সন্তাগো কাঞ্চনীর ফুল নিয়ে গো ভারে গেঞ্জিব।
পত্র না বিনাশ করিব। মুই তো সধবার ঝি॥

গানটা শুনে শ্বশুর ফুলটা ছিঁড়লো না। তারপর কাঞ্চনীর বাপের বাড়ী গিয়ে হাজির হলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, 'কাঞ্চনী বউ কই।' কাঞ্চনীর বাপ বল্‌লো সাত ভাই কাঞ্চনীকে তোমাদের বাড়ীতে দিয়ে এসেছে। শ্বশুর-শাশুড়ী তখন সবাইকে ডেকে সেই গাছটার নীচে নিয়ে গেল এবং সেই ফুলটা দেখিয়ে কাঞ্চনীর মাকে বলল, 'এই ফুল তোল দেখি।' মা ফুলটা তুলতে গেলে ফুলটা গান গেয়ে উঠলো ঃ

মাগো মা ফুলটাকে নিয় গো গভারে গেঞ্জিব।
পত্র না বিনাশ করিব। মুই তোমার ঝিঅ॥

তখন সকল ভায়ের বৌ ফুলটা তুলতে গেল। বড় ভাইয়ের বৌকে ফুলটা বললো,

বৌদি, ফুলটাকে নিয়ে গভারে গেঞ্জিব।
পত্র না বিনাশ করিব, মুই তো তোমার ননন্দ।

ছোট-বৌ এলেও ঐ গান গাইল ফুলটা। তাই কাঞ্চনীর মা ফুলটির কাছে আবার গেল এবং দুধ খেতে দিল। ফুলটা তখন মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং কাঞ্চনী হয়ে গেল। তাকে গয়না জামাকাপড়ে সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিল।

উপরোক্ত কাহিনীর মূল অভিপ্রায়টি হচ্ছে নরমাংসাহার (cannibalism)। এই নরমাংস আহারের রীতি পৃথিবীর সব দেশের আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা একই টোটেমের অন্তর্গত কারো মাংস আহার করতো না। তাই বলা হয়েছে, 'Some tribes eat only enemies, and never eat their totem or kinsmen'. [S. D. F. L. Page. 187]. কিন্তু এই গল্পটিতে আত্মীয়কে অর্থাৎ ভগ্নীর মাংসই ভায়েরা মিলে আহার করেছে। অথচ একই রক্ত উভয় দেহেই প্রবাহিত। আবার এই নরমাংসাহারের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে : Other explanations of cannibalism may be listed briefly. Thus because food gives strength one can assimilate the qualities of a person or animal by-eating it or by eating only parts of it : heart, liver, lips etc'. [ibid, pp. 188] কিন্তু উপরোক্ত কারণগুলির মধ্যে কোনটিই এই গল্পের ভগ্নীর মাংস ভক্ষণের কারণ হিসেবে প্রযোজ্য নয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছাতেই মাংসাহার সম্ভব হয়েছে। অপর দিকে সাঁওতাল পরগণা থেকে সংগৃহীত মাল্টো উপজাতির একই অভিপ্রায়ের একটি কাহিনী উপস্থিত করা যেতে পারে। যেখানে মোরগের ঝুঁটির ফুলের উৎপত্তির কাহিনী বলতে গিয়ে ভ্রাতৃগণকর্তৃক মাংস ভক্ষণের কথা উপস্থিত করা হয়েছে এবং সেখানেও দেখা যাবে এই ভক্ষণের কারণ একান্ত ব্যক্তিগত স্বাদগ্রহণ মাত্র :

'The Story of the Cockscomb Flower' : once upon a time there lived in a village six brothers and their only sister. They were very poor and spent their whole day working in the fields. Their sister stayed at home and cooked their curry and rice and then brought it to them in the fields. One day while she was cutting up the vagetables for the curry, she cut

her finger and her blood soaked the vagetables. That day when her brothers were eating their food, one of them asked, 'what did you put into the curry to-day that it should be so delicious ?' The girl laughed and told them how, when she was cutting up vagetables, she had cut her finger and some of the blood had gone into the curry.

When she returned home, the brothers began to talk about this. One of them said, 'Our sister's blood is so delicious, let us kill her and eat her.' All except youngest agreed and he was told to go and fetch her, and take her to the bear field. 'Then we shall shoot her with our arrows.' The girl was brought and five of the brothers shoot at her but missed her. Then the youngest was told that it was his turn. But instead of shooting, he stood there weeping. The other got angry with him and said, 'If you won't shoot her, we shall kill you too.' Out of fear he shoot an arrow but he aimed in the opposite direction. Never the less the arrow killed the sister. Then five of the brothers cut her up, but the sixth did not help. He went off and caught some fish and crab from the river. When his brothers called him to come and share the meal he joined them, but while they were eating their sister's flesh he ate the fish and when they were crunching her bones, he ate the crab. Then he threw away his share of the girl's flesh. After four days he saw a beautiful Cocks-Comb

plant was growing in that place, after another two days he saw that it had a flower and a day later he saw that the flower became his sister. [Man in India, Vol-XXIV, 'Malto Folk-Tales' p. 218].

উপরোক্ত মাল্টো উপজাতির কাহিনীটির সঙ্গে ঝাড়গ্রামের হাতিবাড়ী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গল্প দুটির বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববর্তী 'রূপকথার উৎস ও অভিপ্রায়' অংশেও একটি কাহিনী উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে কিভাবে, আদিম আচার-আচরণ সীমান্ত-অঞ্চলের লৌকিক-কথা ও কাহিনীর মধ্যে সংমিশ্রিত হয়ে এক একটি বিস্ময়কর রূপকথা ও উপকথার সৃষ্টি করেছে। এই নরমাংস গ্রহণের প্রবৃত্তিটি কেবল বাংলা দেশের আদিবাসী ও গ্রাম্য মানুষের লোক-কথায় প্রচলিত তা নয়, এ পৃথিবীর তাবৎ লোককথার একটি উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায়। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে :

Cannibalism is a motif in many myths, legends, and folk-tales: Odysseus and Cyclops, Tantalus and Pelops. In such folk-tales 'Hansel and Gretel' and 'Jack the giant Killer' and their many analooges, the hero outwits a cannibitiste witch or ogre. [S. D F. L. page 189]

সুতরাং এটা দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর অনেক দেশের লোককথাতে —এই নরমাংসাহার প্রবৃত্তি বিশেষভাবে কার্যকরী। কিন্তু বিহারের সাঁওতাল পরগণা, মধ্যপ্রদেশের উপজাতির মধ্যে প্রচলিত লোককথার এবং বাংলাদেশের পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের লোককথার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের লোককথার একটি বিশেষ পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে নরমাংসাহার প্রবৃত্তিটি বিষয়ে। প্রথমতঃ এ দেশের লোককথায় এই নরমাংস ভক্ষণ হয়েছে সম্পূর্ণ নিজস্ব 'টোটেম' এবং আত্মীয়তার মধ্যে, ভগ্নীর মাংসই ভায়েদের

কাছে লোভনীয় হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ এই মাংস ভক্ষণের পিছনে অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য কার্যকরী না হয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত আস্বাদনের ব্যাপারটাই বড় হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের রূপকথায় রাজপুত্র সাধারণভাবে বুদ্ধিমান, অসীম তার সাহস, দুর্জয় অভিযানে সে সর্বদা জয়যুক্ত, তার অদ্ভুত বুদ্ধির মারপ্যাঁচে দস্যু, রাক্ষস, খোক্কস সকলেই পরাজিত। তাই বলা চলে বাংলাদেশের রূপকথার রাজপুত্রের প্রধান ও প্রথম পরিচয় তার বুদ্ধিমত্তায় ও সাহসিকতায়। সেই বুদ্ধিমান ও সাহসী রাজপুত্র পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলে ক্রমে কিভাবে নির্বোধ ও দুর্বলে পরিণত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় হাতিবাড়ী অঞ্চল থেকে ২. ৫. ৬২. তারিখে সংগৃহীত একটি রূপকথার মধ্যে। রূপকথাটি হলো এই ঃ

'এক রাজার ছেলে আর মন্ত্রীর ছেলে; দুজনে মিলে বিদেশে গিয়েছিলো। বিদেশ থেকে ফিরে এসে তারা নিজেদের মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করলো যে তাদের এখনও বিয়ে হয়নি কেন। উত্তরে তাঁরা জানালো যে ছেলেবেলায় তাদের বিয়ে হয়েছে এবং বৌ আছে শ্বশুর বাড়ীতে। তখন দুজনে একসঙ্গে শ্বশুর বাড়ীর দিকে যাত্রা করলো। মন্ত্রীপুত্র বললো আগে তারা রাজপুত্রের শ্বশুর বাড়ীতে যাবে। তারা রাজপুত্রের শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হলো। রাত্রে তারা বিশ্রাম করতে লাগলো। রাজার মেয়ে রাত্রের খাবার তৈরী করে নিয়ে এলো, কিন্তু রাজপুত্র তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন সেই খাবার নিয়ে সে এলো তার উপপতির কাছে। রাজকন্যার স্বামী এসেছে বলে উপপতির বড় রাগ। তখন রাজকন্যাকে বললো যে সে যদি তার স্বামীর মাথা কেটে আনতে পারে তাহলে সে খাবে। একথা শুনে রাজকন্যা প্রাসাদে গিয়ে—তার স্বামীর মাথা কেটে নিয়ে এলো। তখন উপপতি এই ভয়ানক কাণ্ড দেখে ভয়ে সেখান থেকে চলে গেল। এদিকে মন্ত্রীপুত্র সমস্ত ব্যাপারটাই লক্ষ্য করেছে। রাজকন্যা ফিরে এসে স্বামীর মৃত দেহের

কাছে বসে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। কান্নার শব্দে সকলে জেগে উঠতে রাজকন্যা বললো যে এই মন্ত্রীপুত্রই তার স্বামীকে কেটেছে। মন্ত্রীপুত্রকে কারাগারে দেওয়া হলো।

এদিকে এক চোর সেই রাজবাড়ীতে চুরি করতে গিয়েছিল। রাজপুত্রের মাথা যখন কাটা হয় চোর তখন আড়াল থেকে সবই লক্ষ্য করেছিলো। সকালে যখন বিচার সভা বসেছে চোর এই বলতে বলতে রাজসভায় পৌঁছল, 'যে নারীজাতিকে বিশ্বাস নাই'; পেছনে পেছনে তার বউও কাঁদতে কাঁদতে সভায় উপস্থিত। রাজা এর কারণ জিজ্ঞেস করতে, চোরের বউ জানালো যে তার স্বামী তাকে মেরেছে। চোরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলেই চোর সমস্তই রাজাকে জানিয়ে দিলো। পরিণামে রাজার মেয়ের ফাঁসী হল। মন্ত্রীপুত্র ছাড়া পেয়ে তার নিজের শ্বশুর বাড়ী চলে গেল।

শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে মন্ত্রীপুত্র নিজের স্ত্রীর কাছেই চাকর সেজে থাকলো। কাজ হচ্ছে মন্ত্রীকন্যার জন্যে পূজার ফুল সংগ্রহ। মন্ত্রীকন্যা তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলল তার নাম— 'মোরপতি'। সেখানে একদিন সে পূজার ফুল সাজিয়ে রেখেছে এমন সময় দেখলো একটা ব্যাঙ সেই ফুল নোংরা করে দিয়েছে। আবার ফুল সংগ্রহ করার পরও যখন একই ঘটনা ঘটলো তখন সে রেগে ব্যাঙটাকে মেরে ফেললো। মন্ত্রীকন্যা এসে জল ছিটিয়ে দিতেই ব্যাঙটা বেঁচে উঠলো। এই ভৃত্যরূপী মন্ত্রীপুত্র বললো যে তার কাছে এ'রকম একটা মরা মানুষ আছে তাকে সে বাঁচাতে পারবে কি না। মন্ত্রীকন্যার সম্মতিতে মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রের হাড় ক'খানা নিয়ে এলে মন্ত্রীকন্যা সেই হাড়গুলোকে সাজিয়ে তার উপর জল ছিটিয়ে দিল। প্রাণ ফিরে পেয়ে রাজপুত্র উঠে বসল এবং মন্ত্রীকন্যাকে কেটে ফেললো। মন্ত্রীপুত্র বলে উঠলো, 'একি করলে তুমি।' রাজপুত্রকে তখন সব ঘটনা বলতে দু'জনেই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেল।

উপরোক্ত রূপকথাটিতে যে সব অভিপ্রায়গুলি ব্যক্ত হয়েছে তা হচ্ছে: ১। রাজপুত্রের নির্বুদ্ধিতা (Foolishness of the

Prince) ২। মন্ত্র দ্বারা পুনর্জীবনলাভ (Reincarnation) ৩। অসতী স্ত্রী (Immoral Wife) ৪। দুষ্কার্যের শাস্তি (Misdeed Punished)।

সাধারণতঃ বাংলাদেশের রূপকথায় রাজপুত্র বুদ্ধিমান ও সাহসী। কিন্তু পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলে রাজপুত্রের যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায় তা বিস্ময়কর। এই গল্পটিতে রাজপুত্র তার স্ত্রীর অসতীত্বের পরিচয় জানতে ত পারেই নি উল্টে তার হাতেই মৃত্যু বরণ করেছে। মন্ত্রীকন্যার মন্ত্রপূত জলে জীবন ফিরে পেয়ে—তাকেই রাজকন্যা ভেবে কোন বিচার বিবেচনা না করেই হত্যা করেছে। বাংলাদেশের রূপকথা ও উপকথায় ব্রাহ্মণ, তাঁতি, ঘরজামাই, ইত্যাদি চরিত্রগুলি তাদের বোকামির পরিচয় দিয়েছে বার বার কিন্তু রাজপুত্র নয়। কিন্তু এই গল্পটি সে দিক ব্যতিক্রম। মন্ত্রপূত জল দ্বারা পুনর্জীবনলাভ এবং অস্থিসংগ্রহ—এ দুটি বাংলাদেশের লোককথায় সুপরিচিত অভিপ্রায়। অলৌকিকতার প্রতি আদিম বিশ্বাসই এ'রকম অভিপ্রায়ের উৎস বলে মনে হয়। এই গল্পে রাজকন্যা অসতীর জীবনযাবন করেছে এবং ফলাফল হিসেবে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি লাভ করেছে।

বিজয়িনী ছোট বৌ (successful youngest daughter-in-law) বাংলাদেশের রূপকথার একটি অন্যতম অভিপ্রায় (Motif)। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের হাতিবাড়ীতে এ রকম ধরণের একটি লোককথা পাওয়া গেছে যার মধ্যে বাড়ীর ছোট বৌ কিভাবে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে একটি দরিদ্র পরিবারকে রক্ষা করে ছিল। কাহিনীটি হচ্ছে এই :

এক সদাগর, তার সাত ছেলে, ছয় ছেলের বৌ আছে, ছোট ছেলের বৌ নাই। এরা খুব গরীব। মাটির গর্তে তাদের খেতে হতো। কিছুদিন পর ছোট ছেলের বৌ এলো। ছোট বৌ (সান বৌ) সংসারে এসে ধানসিদ্ধ করলে, ধান ভান্‌লে, চাল বিক্রী করে হাঁড়ি-নুন ইত্যাদি কিনে আনলে। তারপর সাতভাইকে

পাতা পেড়ে খেতে দিলে। ছ' ভাসুর বললে, 'ছোট বৌ খুব ভাল'। তখন ছয়-জা সে কথা শুনে ছোট বৌকে হিংসা করতে লাগলো। কিছুদিন পর ছোট বৌ গর্ভবতী হলো, তখন ছয় বৌ পরামর্শ করে এক জ্যোতিষ আনলে এবং ঘুষ দিয়ে তাকে বশ করে বলালে যে ছোট বৌ-এর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে সাত ভাই মারা যাবে—সুতরাং ছোট বৌকে বনে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

সেই বনে এক কাঠুরে আর তার বউ থাকতো। এই কাঠুরের বাড়ীতে ছোট-বৌ আশ্রয় পেলে। কাঠুরের বৌ ও ছোট বৌ-এর মতই গর্ভবতী ছিল। কয়েকদিন পর দুজনেরই দুটি ছেলে হলো। ছোট-বৌ-এর ছেলেটি কাঁদলে মুক্তো ঝরতো। তাই কাঠুরের বৌ ছোট বৌ-এর ছেলেটির সঙ্গে নিজের ছেলেকে বদলে নিল। আর ছোট বৌকে দিল তাড়িয়ে। এদিকে কাঠুরের বৌ ছোট বৌ-এর ছেলেকে মানুষ করতে লাগলো, তাকে পাঠালে পাঠশালায়।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন ছোট বৌ স্নানের ঘাটে যাচ্ছিল, পাঠশালার পথে নিজের ছেলেকে দেখে ছোট বৌ চিনতে পারলে এবং তাকে বললে, 'তুই আমার বাছা, কেন কাঠুরের ঘরে থাকবি, আমার ঘরে চল তোর জন্যে কত সোনা রেখেছি'। ছেলেটি তখন ছোট বৌ-এর সঙ্গে চলে এলো, কাঠুরের ছেলে গেল কাঠুরের কাছে। বাড়ীতে এসেই ছোট বৌ বললো, 'দেখ কত সোনা রেখেছি, পাকা বাড়ী করবো তোকে না পেয়ে পাকাবাড়ী করি নি। তারপর বাড়ী তৈরী হলো, একট পুকুর কাটার ব্যবস্থা হলো।

ছোট বউ পুকুর কাটাবার জন্যে ঢোল-সহরৎ করলে। ঢোল সহরতের কথা শুনে ছয় বৌ, ছয় ভাসুর এবং তার স্বামী এলো মাটি কাটতে। ছোট বউ তার ছেলেকে বললে, তোর বাপ-জ্যাঠা-জ্যাঠাইমারা এসেছে মাটি কাটতে তাদের ডেকে নিয়ে আয়। ছোট বউ তাদের বর্ণনা বলে দিল। তারা এলে ভাল থালা-বাসনে ছোট বউ তাদের খেতে দিলে। তখন ছয় ভাসুর ভাত-ব্যঞ্জন দেখে

ভাবলে এ যেন আমাদের ছোট বৌ-এর মত। তারা ছেলেটির পরিচয় জানতে পেরে তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলো এবং তাদের অন্যায়ের ফলে কষ্টের জন্যে অনুশোচনা করতে লাগলো। তারপর ছোট বৌ তাদের খাট পালঙ্কে সকলকে শুতে দিল আর জনমজুর খাটতে ছেড়ে দিল না। তাদের অবস্থা ফিরে গেল। ছয়-জাকে তাড়িয়ে তারা সুখে ঘরকন্না করতে লাগলো।

উপরোক্ত গল্পটি যে একবারে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের গল্প সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গল্পটিতে সদাগরের সাত ছেলে বলা হয়েছে, কিন্তু আসলে তাদের আচার-আচরণ ও জীবিকা দেখে মনে হয় তারা ঐ অঞ্চলের সাধারণ দরিদ্র শ্রমজীবী বা আদিবাসী ভূমিজ সাঁওতাল ছাড়া আর কিছু নয়। এ অঞ্চলের যাদের অন্যতম কাজ ক্ষেতে চাষের সময় কাজ করা, ঘরামির কাজ করা এবং পুকুরকাটা, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদিতে জনমজুরের কাজ করা। গল্পটিতে পুকুর কাটবার সময় ছয় ভাসুর স্বামী ও ছয় জন জা-এর মজুররূপে আগমন এ কথাই সপ্রমাণ করে। আদিবাসী অধ্যুষিত এই অঞ্চলে আদিম জনসমাজের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। দ্বিতীয়তঃ এই গল্পটিতে বিজয়িনী ছোট বউ এর অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হয়েছে। সাঁওতাল সমাজে পুত্রবধূর বিশেষ একটি পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা আছে। তাই সাঁওতাল লোককথায় পুত্রবধূ সর্বদা জয়যুক্ত হয়েছে। এখানে একটি বিজয়িনী জ্যেষ্ঠ বউ (successful eldest daughter-in-law)-এর কাহিনী উপস্থিত করা হবে। এখানে দেখা যাবে উপরোক্ত হাতিবাড়ীতে প্রাপ্ত গল্পটির মত বাড়ীর বউ কি ভাবে সমস্ত পরিবারটিকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। শুধু তফাৎ এই হাতীবাড়ীতে প্রাপ্ত গল্পের ছোট বউয়ের কৃতিত্ব, অপরপক্ষে নিম্নোদ্ধৃত সাঁওতাল উপকথাটিতে বড় বৌ এর কৃতিত্ব বর্ণিত হয়েছে।

'A wife should be intelligent, prudent and resourceful in her domestic work. In one story

(Bompas VIII) a capable wife saves her whole family from ruin. A father and his seven sons had fallen into poverty. The father chose his eldest daughter-in-law to be the head of the family and all promised to obey her. She told her family to bring in whatever they could find in the fields, no matter what it was. The old man came back with some human excrements wrapped up in a leaf, and his daughter-in-law hung it up in the house. Then he brought in the slough of snake which she fastened to the roof with a clod of earth. Many years later the Raja of the country was ill and ojhas said that only human excrement of twelve years old could cure him. A reward of two hundred rupees was offered for it and daughter-in-law was able to procure the medicine. Another day the son of a Raja was bathing and left his golden belt by the tank. A kite seized it and flew off. But when it saw the snake lying on the roof it dropped the belt and flew of with the skin. A reward off a thousand rupees was offered for the belt In this way a prudent house-wife made her family rich. (Bompas VIII) ['The Folk-Tale in Santal Society', Man in India, p. 229]

ছোট বউই হোক বা বড় বউই হোক সাঁওতাল সমাজ ও নিম্নবিত্ত সাধারণ বাঙালী সমাজের মধ্যে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারিণী। তার কারণ, আদিম সমাজ জীবনে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য সর্বজন স্বীকৃত—তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের লোক। তাই দেখা গেছে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকই সেখানে অধিক পরিমাণে

কর্মঠ, সরল, ও বুদ্ধিমতী। তাই আদিম উপজাতি সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও ইত্যাদির মধ্যে আজও স্ত্রীলোক-প্রধান সমাজ বর্তমান। তার পরিচয় আছে তাদের বিভিন্ন গল্প, লৌকিক কাহিনী ইত্যাদিতে। সেখানে তাই কন্যা বা পুত্রবধূই কখনও কখনও বিরাট বিরাট বিপদ-আপদ থেকে সমস্ত পরিবারকে রক্ষা করেছে। উক্ত সাঁওতালী লোক-কথাটিতে তারই পরিচয় আছে। বাংলাদেশে আদিম উপজাতির সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে ডোম, বাউরী ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষ। পাশাপাশি অবস্থানের ফলে এদের গল্পের চরিত্র ও বিষয়বস্তুর মধ্যে উপজাতীয় উপকাহিনীর প্রভাব এসে গেছে খুব স্বাভাবিক ভাবেই। হাতিবাড়ী অঞ্চলে প্রাপ্ত লোককথা তাই-ই প্রমাণ করে। উদাহরণ স্বরূপ ঐ অঞ্চলে ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংগৃহীত আরও একটি গল্প উপস্থিত করা যেতে পারে যেখানে বাড়ীর ছোট বউ বিপর্যয়ের মধ্যেও জয় যুক্ত হয়েছে। গল্পটি এই :

এক দেশে এক সদাগর বাস করতো। এক সাধু তার কাছে একদিন এসে উপস্থিত হলো। সাধুকে সদাগর গুরুপদে বরণ করে কাছে রেখে দিলেন। সদাগরের দুই স্ত্রী। বিদেশে বাণিজ্য করতে যাওয়ার আগে সে ছোট বউকে সাধুর সেবা-যত্ন করতে বলে গেল। সদাগর বিদেশে যাওয়ার পর একদিন সাধু ছোট বউকে জিজ্ঞেস করলো 'তোমার ছেলে-পুলে নাই কেন'? ছোট বউ বললে, আমার ভাগ্য। সাধু বললে, আমার কথামত কাজ করলে ছেলে হবে। ছোট বউ জিজ্ঞেস করলে কি কাজ। সাধু বললে, তুমি আমার সঙ্গে থাক। ছোট বউ বললে, 'তুমি আমার বাবার মত, একথা বল কি করে? যা বললে এমন কথা আর বলো না'। সাধু বড় বৌকে বললে, 'আজ থেকে আমি তোমাদের বাড়ী থাকবো না'। তাঁর সেবার কোন ত্রুটি হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করে বললে, 'আগে মহাজন বাড়ী আসুক তারপর আপনি যাবেন'। তখন ছোট বউও সাধুকে বললো, 'আপনি ঐ কথায় রাগ করলেন। আমি বুঝতে পারিনি তাই ওকথা বলেছিলাম'। সাধু বললে, 'আমি তোমাকে ও কথা বলিনি। আমি

এক অর্থে বলেছি, তুমি বুঝলে অন্য অর্থ। আমি সত্যি কথা বলছি শ্মশানে একটি ওষুধ আছে'। ছোট বৌ বললে, 'কি করে আনতে হবে?' সাধু বললে, 'অমাবস্যার রাত্রে খোলা চুলে উলঙ্গ হয়ে আনতে হবে'। ছোট বৌ বললে, 'আচ্ছা তাই হবে।'

এমন সময় সওদাগর বিদেশ থেকে ফিরলেন। সাধু বললো, 'বাবা আমি তোমাদের ঘরে থাকবো না'। সদাগর বললেন, 'কেন? আপনার কি হলো'। সাধু বললো, 'তোমার ছোট বউটি পিশাচ সাধন করছে'। সদাগর বললো, 'তা তো আমি মানবো না, আপনি দেখিয়ে দিতে পারেন'? সাধু বললো, 'নিশ্চয়'।

তারপর অমাবস্যা এলো। ছোট বৌ সাধুকে বললো, 'আজ তো অমাবস্যা, এখনই যেতে হবে'? সাধু বললে, 'না, একটু রাত্রি হলে?' রাত্রি গভীর হলে ছোট বৌ এবং সাধু শ্মশানে গেল। শ্মশানের শবস্থান থেকে মাটি খুঁড়ে ওষুধ মুখে করে আনতে হবে, তাই ছোট বৌকে সাধু বললো, 'তুমি শবস্থানে যাও'। তারপর সাধু বাড়ী থেকে সদাগরকে ডেকে নিয়ে এলো। সদাগর দেখলো খোলা চুলে বৌ শ্মশানে মাটি খুঁড়ছে। সদাগর চোখে দেখে সাধুর কথা বিশ্বাস করলো এবং ছোট বৌকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবার মনস্থ করলো। তারপর সদাগর ছুতোর এনে নৌকো তৈরী করে ছোট বৌকে বললো, 'চল নদীতে স্নান করে আসি'। ছোট বৌ অবাক হলেও বেশ খুশি হলো। সদাগর ছোট বৌকে নৌকোয় তুলে পাটাতনের নীচে চাপা দিয়ে নৌকাটা নদীতে ছেড়ে দিলো।

এক দেশের এক রাজা শিকারে বেরিয়ে নদীতে একটি নৌকো দেখতে পেয়ে ধরতে বললেন নৌকোটাকে। নৌকোর পাটাতনের ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে রাজা সদাগর-বৌকে উদ্ধার করে তার ভিতর একটা ভাল্লুক ঢুকিয়ে রেখে দিল।

এদিক সাধু নৌকোটিকে নদীতে ভাসতে দেখে ভাবলো ছোট বৌকে নিশ্চয়ই ওর মধ্যে পুরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপর থেকে তাই সাধু বল্‌তে লাগলো, 'আমার কথা যদি শুনতে তাহলে কত

সুখে থাকতে'। এই বলে যেই পাটাতন খুলছে অমনি ভাল্লুক বেরিয়ে এসে সাধুর গলা চেপে ধরলো। সাধুর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলো।

উপরোক্ত লোককথাটিতে যে অভিপ্রায় দুটি ব্যক্ত হয়েছে তা হচ্ছে, প্রথমতঃ দুষ্কার্যের শাস্তি (misdeed punished) দ্বিতীয়তঃ বিজয়িনী ছোট বৌ (successful youngest daughter-in-law)। লোককথার একটি প্রধান ধর্ম তার বিবর্তন ও পরিবর্তন। অন্য একটি রূপকথা কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে এক অধঃপতিত রূপ ধারণ করেছে, এই অঞ্চলে সংগৃহীত একটি লোক-কথার মধ্যে তা লক্ষ্য করা যাবে। গল্পটি এই :

এক নাপিত আর এক তাঁতি। দুজনে খুব বন্ধু। তারা একদিন ঠিক করলো যে ধান চুরি করবে। তাই তারা একটা ক্ষেতের সমস্ত ধান কেটে আনলো। তারপর নাপিত বললো সে আগার দিকটা নেবে। তাঁতি গোড়ার দিকটা নিল, তাঁতির বৌ খুব বকলো এবং বললো, এবার থেকে চুরি করলে সে যেন আগার দিকটা নেয়। পরের বার আখ চুরি করতে গেল। এবার তাঁতি আগার দিকটা ছাড়লো না। নাপিত গোড়ার দিক নিয়ে এল, আর তাঁতি আগার দিক নিয়ে বাড়ী যেতেই তার বৌ খুব রেগে তাঁতিকে তাড়িয়ে দিলো।

তাঁতি তখন মনের দুঃখে নাপিত বন্ধুর কাছে গেল এবং সব কথা খুলে বললো। নাপিত আর তাঁতি তখন দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। চলতে চলতে তারা একটা কচ্ছপ দেখতে পেল, কচ্ছপটাকে সঙ্গে নিল; তারপর আরও খানিকটা গিয়ে পেল একটা মোটা দড়ি এবং আরও পরে পেল এক হাড়ি চূণ। তারা সব কিছুই সঙ্গে নিল। তারপর যেতে যেতে তারা বনের মধ্যে একটা ভাঙা বাড়ীতে এসে হাজির হলো। বাড়ীটা ছিল একটা রাক্ষসের।

সেখানে তারা ঠিক করলে পালা করে রাত জাগবে, সেই অনুসারে তাঁতি ঘুমিয়ে পড়লো এবং নাপিত জেগে রইলো। রাক্ষসটা এমন

সময় ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমার বাড়ীতে কে? নাপিত বললো আমি রাক্ষসের বাবা খোক্কস। শুনে রাক্ষস চমকে গিয়ে বললো, তোর চুল আর উকুন দেখাও দেখি। তখন খানিকটা দড়ি ও কচ্ছপটা বাইরে ফেলে দিলো। তারপর রাক্ষসটা যখন থু থু ফেলতে বললো তখন নাপিত খানিকটা চূণ দিয়ে দিল। সেই দেখে রাক্ষস দৌড়ে পালিয়ে গেল। গভীর রাত্রে রাক্ষস আবার এল এবং জিজ্ঞেস করল বাড়ীতে কে? তাঁতি উত্তর দিল 'আমি তাঁতি'। রাক্ষস বললো দরজা খোল। তাঁতি ভয়ে দরজা খুলে দিল। রাক্ষস ঢুকে তাঁতিকে মেরে ফেলতে উঠলে নাপিতের ঘুম ভেঙে গেলো। নাপিত উঠে পেছন থেকে দড়ি দিয়ে রাক্ষসকে বেঁধে ফেললো এবং রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা খুব খুশী হলেন। নাপিত রাক্ষসের ল্যাজ কেটে ছেড়ে দিল, আর রাজা তাদের অনেক ধনদৌলত দিলেন। তারা তখন বাড়ী ফিরে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

উপরোক্ত লোককথাটিকে সাধারণভাবে একটি রাক্ষসের গল্প (Ogre Story) বলা গেলেও আসলে বাংলাদেশের রূপকথার একটি অধঃপতিত রূপ। কারণ এখানে নায়ক হওয়া উচিত ছিল তাঁতি আর নাপিতের পরিবর্তে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের। তথাপি গল্পটি একটি অত্যন্ত প্রচলিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই রচিত। আমরাও বাল্যকালে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল গ্রামে এ গল্পের প্রচলন দেখেছি। সুতরাং অধঃপতিতরূপ না বলে গল্পটিকে একটি সাধারণ গ্রাম্য লোককথা বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে।

জীবন-প্রতীক বা life token বাংলাদেশের রূপকথার একটি সুপরিচিত অভিপ্রায়। বাংলাদেশের বিখ্যাত রূপকথা ডালিম-কুমারের কাহিনীতে দেখা যায় যে একটি সোনার হারের মধ্যেই রাজপুত্রের জীবন আছে। ঐ হারটি পরলেই রাজপুত্রের মৃত্যু এবং খুলে রাখলেই রাজপুত্র জীবন ফিরে পায়, এটি এক প্রকার প্রতীক। অভিধানে তাই বলা হয়েছে:

'In widespread European and Asiatic folk-belief, folk-tale, and traditional ballads, and objects (or animal, plant etc.) either chosen by or born with a person, which manifests in some way the fact that he is in danger, may die, or is dead.' (S. D. F. L., Page 619)।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কখন বৃক্ষ, কোন প্রাণী, ফুল, ভ্রমর, গলার হার, তরবারি ইত্যাদি জীবনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারণ তাদের বিশ্বাস: 'The soul (heart, life) conceived a dwelling apart form the living body, often in a tree or plant, animal, bird, egg, stone, or other inanimate object, and usually in a secret place for safe keeping.' [ibid p. 996]। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে 'আত্মা' বা 'মানুষের জীবন'—মানবদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বৃক্ষ, লতা, জীব, পক্ষী, পাথর ও অন্যান্য নির্জীব বস্তুর মধ্যে নিরাপদে লুক্কাইত রাখা যায়। এই যে লোক-বিশ্বাস (Folk-belief) এটির উদ্ভব সম্পর্কে নানা গবেষণা হয়েছে দেশে-বিদেশে এবং গবেষণার পর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে: 'The concept occurs in most primitive religions and is a common place of world folk-tales. The soul in the form of an animal, bird insect, plant ect. is different idea from the soul hidden away in animal or plant or even kept in another part of a man's body than the heart for protection,' [ibid. pp. 996]। অর্থাৎ এই 'বিচ্ছিন্ন আত্মার' ধারণাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিম ধর্মবিশ্বাসে এবং লোককথায় পাওয়া যায়। বৃক্ষ, জীব, পোকা বা লতার আকারে আত্মার অবস্থিতির ধারণা—জন্তুর অথবা বৃক্ষলতার মধ্যে আত্মা লুকিয়ে রাখার ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। —অর্থাৎ বলা চলে 'আত্মার পৃথকীকরণ' (separable soul) এবং

জীবন-প্রতীক (life-token) দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধারণা, কোন কোন আদিম বিশ্বাস যে আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করে অন্য কোন বস্তুর মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। আবার কোন ক্ষেত্রে এই ধারণা বিশেষ কার্যকরী, যে আত্মা বা জীবন যে কোনরূপ ধারণ করতে পারে। বাংলার লোক-সঙ্গীতেও এই আত্মার বা জীবনের প্রতীক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দেহতত্ত্বের গানে :

নিশিতে যাইও ফুলবনে, রে মন-ভমরা
জ্বালাইয়া দিনের বাতি জাগিরব সারারাতি (গো)
কব কথা প্রাণবন্ধুর কানে, রে মন-ভমরা ॥

এখানে দেহরূপ ফুলবনে ভ্রমররূপ মন বা আত্মার কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের আর একটি বিখ্যাত রূপকথা শঙ্খকুমারের গল্পে দেখা যায় জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র গৃহত্যাগ করার পূর্বে নিজের হাতে গাছ লাগিয়ে ভাইকে বলেছিল, যদি গাছটি শুকিয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে তার কোন বিপদ ঘটেছে। এই লোকবিশ্বাস কিভাবে লিখিত কাব্যের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যে। বেহুলা লখীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে স্বর্গপথে যাত্রার পূর্বে শাশুড়ী সনকার কাছে একটি প্রদীপ রেখে বলে গিয়েছিলেন যে বিনা তেলে কিংবা এক কড়া তেলে যদি ছয় মাস এই প্রদীপ জ্বলতে থাকে তাহলে জানতে পারবে লখীন্দর বেঁচেছে, আর যদি প্রদীপ নিভে যায় তাহলে জানবে যে লখীন্দর মৃত। একটি আদিম-বিশ্বাস (primitive belief) কিভাবে লোক-বিশ্বাসে (Folk-belief) রূপান্তরিত হয়ে লোককথা, লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উচ্চতর সাহিত্যেও প্রবহমান উপরোক্ত আলোচনাই তা প্রমাণ করে। এই প্রসঙ্গে হাতিবাড়ী অঞ্চলের সিংভূম জেলার ডোমজুড়ি গ্রাম থেকে সংগৃহীত একটি রূপকথা উপস্থিত করা যেতে পারে। রূপকথাটি এই :

এক দেশে এক রাজা ছিল, রাজার সাত রাণী, কিন্তু রাজার একটি মাত্র পুত্র। সেই পুত্রের প্রাণ ছিল বোয়াল মাছের পেটে।

রাণীরা আবদার করলে ঐ বোয়াল মাছটিকে এনে দিতে, তারা খাবে। কেউ জানতো না যে বোয়াল মাছেই ছিল রাজপুত্রের প্রাণ। এদিকে বোয়াল মাছটা কাটার পরই রাজপুত্র মারা গেল। কিন্তু বোয়াল মাছের পেটে একটি সোনার হার ছিল। সেই হারটি যখন জলে রেখে দেওয়া হয় তখন রাজপুত্র প্রাণ ফিরে পায়, আবার জল থেকে তুললেই রাজপুত্র জড় পদার্থে পরিণত হয়। এদিকে অপর এক রাজ্যে এক রাজা আর তার এক কন্যা বাস করত। সেই কন্যা গুরুদেবের কাছে আশীর্বাদ পায় যে তার মৃত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে। গুরু আশীর্বাদ করে বলল: 'ময়না মন্দিরে ঘর। তোমার কপালে মৃত বর।' এই বর দিয়ে গুরুদেব আরও বর দেন যে কন্যা যেন শাখা-সিঁদুর নিয়ে সুখে থাকে। রাজরাণী একথা শুনে খুব কাঁদতে লাগলেন। মৃত বরের সঙ্গে মা হয়ে কি করে বিয়ে দেবেন। মনের দুঃখে রাজকন্যা ও রাজরাণী চলেছেন বনের পথে। চলতে চলতে রাজকন্যার তৃষ্ণা পায়। দূরে একটি মন্দির দেখে মা কন্যাকে সেখানে রেখে কোথায় জল পাওয়া যায় তারই সন্ধানে গেলেন। মন্দিরে কি আছে কন্যার জানার কৌতূহল হ'লো। সে মন্দিরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কন্যা শত চেষ্টা করেও খুলতে পারলো না। রাজরাণী জল নিয়ে মেয়েকে কোথাও না পেয়ে এবং মন্দিরের দরজা খুলতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

এদিকে যে রাজপুত্রের প্রাণ বোয়াল মাছের মধ্যে ছিল, সে বলে দিয়েছিল যে তার মৃত্যুর পর যেন তাকে বনের মধ্যে মন্দিরে রেখে দেওয়া হয়। সেই মত তাকে বনের মধ্যে এক মন্দিরে রেখে দিয়েছিল। রাজকন্যা বনের ভিতর যে মন্দিরে প্রবেশ করলো এটাই ছিল সেই মন্দির। রাজকন্যা দেখলো মন্দিরে একটি মৃত রাজপুত্র শায়িত। তৃষ্ণায় রাজকন্যার প্রাণ যায় যায়। পাশেই জলের কলসী দেখে রাজকন্যা যেই জল খেতে গেছে তখন দেখলো একটা সোনার হার পাশে পড়ে। এইটাই বোয়াল মাছের

পেট থেকে পাওয়া গিয়েছিলো। রাজকন্যা যেই জল খেতে গেছে তখন সেই হারটা তার হাত থেকে জলে পড়ে গেল। আর হার জলে পড়তেই রাজপুত্র প্রাণ ফিরে পেল। প্রাণ ফিরে পেয়ে রাজকন্যাকে দেখে রাজপুত্র মুগ্ধ হ'লো এবং প্রাণদাত্রীকে বিবাহ করলো। তারপর তারা সুখে দিনযাপন করতে লাগলো।

এইভাবে কত লোককথা লোক-জীবনের স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে। রূপকথার এক মায়াময় রাজত্ব যেন এই হাতিবাড়ী। সুবর্ণরেখার সোনার বালুচরে যেন অজস্র স্বর্ণরেণু ছড়ানো। হাতিবাড়ীর আকাশে বাতাসে শালবনের পাতায় পাতায়, কাঁকুরে মাটির কণায় কণায়, সুবর্ণরেখার কুলকুল ধ্বনিতে, কাল পাথরে, ছোট ছোট নির্জন দ্বীপগুলিতে যেন অনেক কালের অনেক কথা, অনেক গল্প, অনেক ব্যথা-বেদনার কথা জমাট হয়ে আছে। তাই আজও চোখ বুজলে ভেসে ওঠে সেইসব সরল জেলের দল,—সেই সুরেন পাত্র, কাদম্বরী দেবী আর অসংখ্য গ্রাম্য সরল ছেলে-মেয়ের মুখচ্ছবি। গ্রামের পথের ধূলায় ধানের মরায়ের পাশে চণ্ডীমণ্ডপে, বনদেবীর আস্তানায়, সুন্দর করে নিকানো মাটির দাওয়ার পাশে কত যে গল্পকথা জমে আছে তার ঠিকানা নাই। এখনও যদি অনেক পথ পেরিয়ে রূপকথার মায়াময় রাজ্য সুবর্ণ—রেখার ধারে শান্ত-সুনিবিড় ছোট ছোট গ্রামগুলিতে যাওয়া যায়, সত্তর বছরের বৃদ্ধ থেকে শুরু করে দশ বছরের বালক পর্যন্ত আপনাকে ডাকবে, নিকানো দাওয়ার একপাশে বসাবে, পলিমাটি দিয়ে মাজা চক্‌চকে কাঁসার ঘটিতে করে জল দেবে আর ডালায় করে মুড়ি এগিয়ে দিয়ে ঘিরে দাঁড়াবে। আর বলতে শুরু করবে, এক রাজা আর রাজপুত্তুর, সাত সমুদ্র তের নদীর পার, ভোমরা-ভোমরী ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী আরও কত কি।

।। তিনঃ কুইলাপালের রূপকথা ।।

একদা রাজা বিক্রমাদিত্য চলেছেন দিগ্বিজয়ে। বহু নগর, রাজধানী পার হয়ে, বহু প্রান্তর অতিক্রম করে, বহু রাজ্য জয় করে এসে পৌঁছালেন বাংলা-বিহার সীমান্তে, তৎকালীন পরিচিত গৌড় সীমান্তে। এসে দেখলেন, ধূ ধূ প্রান্তর, রুক্ষ, অনুর্বর। শ্যামলতার কোন চিহ্ন নাই কোনখানে—রাজা বিক্রমাদিত্য বিশ্রামের ছলে একটু দাঁড়ালেন। হঠাৎ উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়াবার সময় পা-টা ঘুরে যাওয়াতে খানিকটা মাটি গর্ত হয়ে গেল। বিক্রমাদিত্য কালবিলম্ব না করে দিগ্বিজয়ের পথে চলে গেলেন। বহু কাল কেটে গেল। সেই বিক্রমাদিত্যের পদচাপে সৃষ্ট গর্ত বড় হয়ে হয়ে বিরাট বাঁধের আকার ধারণ করল। বিরাট আর বিশাল হয়েছে তার আকার বৃষ্টির জলে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হয়ে দীঘির আকার ধারণ করেছে। তারপর এই অনুর্বর শালবনের প্রান্তরে ধীরে ধীরে দু একটা যাযাবর আদিবাসী বসবাস শুরু করেছে। ক্রমশঃ বাঁধের জলে মাটি হয়েছে সরস, ভূমি হয়েছে উর্বর। দলে দলে দূরান্তের লোক এসে বসতি স্থাপন করেছে বাঁধের ধারে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বাঁধের সম্পর্কে নানা কথা উপকথা। গ্রামের মানুষ আদর করে নাম দিয়েছে শশিসেনা বাঁধ। এই শশিসেনা বাঁধের তীরে বসে গ্রামের মানুষ গল্প করেছে কত অতীতের কাহিনী; উপস্থাপিত করেছে এই বাঁধের তীরে বসবাসকারী তাদের পূর্বপুরুষের বহু রোমাঞ্চকর ইতিহাসের কথা। শশিসেনা বাঁধের কালো চিকন জলে বাতাস যখন প্রবাহিত হয়েছে টলটল করে উঠেছে দীঘির স্বচ্ছ জল, দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে গ্রাম্যবধূ কলসী কাঁখে এই বাঁধের জল, নিতে সমবেত হয়েছে। বাঁধের শীতল জলে অবগাহনরত গ্রাম্য নারীর কলহাস্যে বাঁধের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। কখনও গ্রামের মানুষের দেহাবসানে হরিধ্বনি সহকারে এই বাঁধের

তীরে নিয়ে এসে শেষকৃত্য সমাধা করা হয়েছে। কুইলাপালের নিকটবর্তী গ্রামের নবজাতকের আবির্ভাবে শঙ্খধ্বনি সহকারে গৃহাঙ্গনারা শশিসেনা বাঁধের তীরে এসে ভগবানের কাছে মঙ্গলপ্রার্থনা করেছে, নানা পূজানুষ্ঠান সমাধা করেছে। আবার বৈশাখ কিংবা ফাল্গুনের মিলনলগ্নে নিকটবর্তী গ্রামের বিবাহ উৎসবে দলে দলে বর কিংবা কনেকে হলুদ মাখিয়ে গান করতে করতে জল সইতে এসেছে। তাদের গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে বাঁধের জল। সখীরা গান ধরেছে,

চলরে মা বুনিয়া জল সইতে যাব,
পথে আছে কামরাঙা সব জনে খাব।
জড় গাছের আগে শাঁকচিলের বাসা,
সাও মেরে নিয়ে গেল গায়ের গামছা।

শশিসেনা বাঁধ তাই শুধু দীঘি বা সরোবরই নয়, কুইলাপাল বা তার নিকটবর্তী গ্রামের মানুষের কাছে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সমস্ত কিছুরই জীবন্ত-প্রতীক। কুইলাপালের শশিসেনা বাঁধ তাই কুইলাপালের মানুষের কাছে এত প্রিয়, এত পবিত্র, এত আদরের ধন। তাই তাকে নিয়ে, তার তীরে বসে কুইলাপালের মানুষ কত রকম কথা ও কাহিনী রচনা করে চলেছে দিনের পর দিন। কত জন জনশ্রুতি যে গড়ে উঠেছে বংশপরম্পরাক্রমে তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। শশিসেনা বাঁধই কুলাপালের মানুষের কাছে রূপকথার সাত সুমুদ্দুর তের নদীর পার—প্রেরণা যুগিয়েছে কতশত রূপকথার কাহিনীর। তাই এই শশিসেনা বাঁধের ধার ধরে গ্রাম্য পথের ধুলো ভেঙ্গে কুইলাপালের হাটকে পিছনে রেখে একটু এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে কতকগুলি খোড়ো মাটির বাড়ী, গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে একটু ভেতরে গেলেই লাজুক নম্র গৃহবধূ ঘোমটা টেনে দূরে সরে যাবে। সামনের গৃহাঙ্গনের আলপনা পার হয়ে দাওয়ায় যেয়ে দাঁড়ালে গৃহবধূ কিন্তু আতিথ্য করতে ত্রুটি করবে না। খাটিয়া এনে সেটি সযতনে ঝেড়ে দিয়ে

বসতে বলবে। বাড়ীর কর্তার কথা জিগ্যেস করলে বলবে মাঠে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই অতিথির আগমনবার্তা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে আসবে গৃহস্বামী। হাঁ ইনিই হচ্ছেন ভোলানাথ কালিন্দী। রূপকথা আর লোক-সঙ্গীতের অজস্র ভাণ্ডার আছে এর ভেতরে। তবে খুব লাজুক—খুব সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না। অনুরোধ উপরোধ করলে হয়তো বলতে শুরু করবে:

এক রাজা আর তার তিন রাণী। রাণীদের কোন ছেলেপুলে নেই। রাজার মনে খুব দুঃখ। একদিন রাজা রাজপ্রাসাদের সরোবরে মাছ ধরাচ্ছেন। অনেক মাছ পড়েছে জেলেদের জালে। হঠাৎ রাজা বললো, মেয়ে মাছ, ছেলে মাছ আলাদা করে রাখ। এই শুনেই দুটো মাছ ফিক্ করে হেসে জলে লাফিয়ে চলে গেল।

মাছ হেসে চলে গেল দেখে রাজার মনে প্রশ্ন জাগলো, মাছ হাসলো কেন? অনেক চিন্তা করেও রাজা কুল-কিনারা পেলেন না। ভাবনায়-চিন্তায় রাজ্যপাট লোপ পাবার দাখিল। শেষকালে রাণীদের পরামর্শে সভা-পণ্ডিতকে ডেকে পাঠানো হলো। রাজা সভা-পণ্ডিতকে জিগ্যেস করলো, মাছ হাসে কেন? সভাপণ্ডিত বহুক্ষণ চিন্তা করে কিছুতেই জবাব দিতে পারলো না। রাজা গেল ভীষণ রেগে। বললেন, ছমাসের মধ্যে সভা-পণ্ডিত যদি এর মীমাংসা করতে না পারে তাহলে সবংশে তাকে নিধন করা হবে। সভা-পণ্ডিত বাড়ীতে ফিরে এল। ছোট ছেলেকে ডেকে বললে, আমাদের যা হয় হবে, তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। কারণ তাহলে অন্ততঃ বংশটা রক্ষা পাবে। ছোট ছেলে আর কি করবে। বাবার কথায় মেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এক অজানা ভাগ্যের সন্ধানে।

এদিকে অন্যরাজ্যে এক ব্রাহ্মণ আর তার ছোট মেয়ে বাস করে। ব্রাহ্মণ মেয়ের জন্যে আর পাত্র খুঁজে পায় না, তার জন্যে পাত্র খুঁজে হন্যে হয়ে গেছে। একদিন সে ভাবলে। আজ রাস্তায় নূতন যার সঙ্গেই দেখা হবে তাকেই জামাই করে ঘরে নিয়ে আসবে।

ব্রাহ্মণ চলেছে। অনেক দূরে যেয়েও কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। ফিরে আসছে, এমন সময় দেখলো একটি সুশ্রী যুবক গাছতলায় বসে বিশ্রাম করছে। ব্রাহ্মণ তার কাছে বসে জানলো যে সে হচ্ছে জাতে ব্রাহ্মণ। এক অজানা ভাগ্যের সন্ধানে সে বেরিয়েছে। দুজনে মিলে অনেক কথা হলো। তারপর তারা উঠে পথ চলতে লাগলো।

পথে চলতে চলতে তারা এক নদীর ধারে এসে পৌঁছালো। দুজনেরই পিপাসা পেয়েছিল। ব্রাহ্মণের কাছে বাতাসা ছিল, সেই বাতাসার ছায়া জলে ফেলে সে সেই জল খেলো। আর ছেলেটির কাছে খই ছিল। সেই খইগুলো জলে ফেলে দিতে যেদিকে স্রোত খইগুলো সেই দিকে ভেসে চলে গেল। ছেলেটি তারপর আঁজলা করে জল খেলো। ব্রাহ্মণ ভাবলো ছেলেটা তো ভীষণ বোকা, খই স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে তারপর জল খেলো। দুজনে মিলে নদী পার হবে। ব্রাহ্মণ তার জুতো খুলে নদী পার হলো। আর ছেলেটির এতক্ষণ জুতো খোলা ছিল, নদী পার হবার সময় জুতো পরে নদী পার হলো। ব্রাহ্মণ দেখে তো অবাক। এ কেমনধারা লোক। কোন কিছু না বলে দুজনে একত্রে পথ চলতে লাগলো। ব্রাহ্মণ ছাতা মাথায় দিয়েছে, কিন্তু ছেলেটির ছাতা বগলে মোড়া; কিছুক্ষণ পরে তারা একটা বটগাছের তলায় বিশ্রাম করতে লাগলো। ব্রাহ্মণ তখন ছাতাটা মুড়ে রাখলো, আর ছেলেটা ছাতা খুলে মাথায় দিলো। ব্রাহ্মণ ছেলেটার রকম-সকম দেখে মনে মনে হাসতে লাগল। ভাবল ছেলেটার মত বোকা দুনিয়ায় আর নেই। একে জামাই করা চলে না। যাই হোক দুজনে পুনরায় উঠে ব্রাহ্মণের নিজস্ব গ্রামের প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো। সামনের জমি দেখিয়ে ব্রাহ্মণ বললো এটি হচ্ছে আমার জমি। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'জমি আছে কিন্তু জমির নাক নেই'। ব্রাহ্মণ শুনে আরও অবাক হয়ে গেল। ভাবলো জমির আবার নাক কি? আবার কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখা গেল একপাল মোষ

চরছে। ব্রাহ্মণ ছেলেটাকে দেখিয়ে বললে, 'ওগুলো আমার মোষ'। ছেলেটা উত্তর দিল, মোষ আছে কিন্তু মোষের মাথা নেই। তারপর গ্রামে এসে তারা প্রবেশ করলো। ব্রাহ্মণের বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াতে ব্রাহ্মণ বললে, 'এটি আমার বাড়ী'। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'বাড়ী বটে কিন্তু বাড়ীর ইজ্জৎ নাই'। ব্রাহ্মণ রেগে কট্‌মট্‌ করে তাকালো ছেলেটির দিকে। ছেলেটিকে আহ্বান না করেই নিজে ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় ছেলেটি বললে, 'গলার আওয়াজ করে ঢুকবে।' এই বলে ছেলেটি পেছন ফিরে চলতে শুরু করলে ব্রাহ্মণ ভয়ানক রেগে বল্‌লে, 'আমার ঘরে আমি ঢুকবো গলার আওয়াজ করবো কেন'? যেই ঘরে ঢুকেছে অমনি দেখলো মেয়ে কাপড় ছাড়ছে। মেয়ে তো ভীষণ রেগে গেল। বললে, 'বুড়ো হয়েছো এখনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। সোমত্থ মেয়ে ঘরে, গলার আওয়াজ করে ঢুকতে হয় জানো না'? ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির নিষেধবাণীর কথা মনে পড়ে গেল। যাই হোক মেয়ে ক্লান্ত পিতাকে পা ধোবার জল দিল, বসতে দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো। ব্রাহ্মণ বললে, 'আজ কোন পাত্রের সন্ধান পাইনি। তবে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার মত বোকা পৃথিবীতে নেই'। তারপর ছেলেটির সব বোকামির কথা খুলে বলতে লাগল। ব্রাহ্মণের কথা শুনে তার মেয়ে বললো, 'তুমি করেছো কি? এর মত চালাক পৃথিবীতে নেই। এই হচ্ছে আমার যোগ্য স্বামী'। বলে, বলতে লাগলো, 'স্রোতে খই ভাসিয়ে খাওয়ার অর্থ হলো স্রোতের বিপরীত দিকের জল পরিষ্কার। সেই জল খাওয়া। জুতো পরে নদী পার হওয়ার অর্থ হচ্ছে, রাস্তায় আমরা সবকিছু দেখতে পাই, কিন্তু জলের নীচে কী আছে তা দেখতে পাই না। সেইজন্য ছেলেটি জুতো পরে নদী পার হয়েছে আর অন্যসময় খালি পায়ে হেঁটেছে। আর গাছের তলায় ছাতা মাথায় দিয়েছে তার অর্থ যদি ডাল ভাঙ্গে বা কোন পাখী বিষ্ঠা ত্যাগ করে তাহলে ছাতায় তা আটকে যাবে। জমির নাক নেই অর্থ জমিতে বাঁধ

নাই। বাঁধের জল না থাকলে জমি চাষ করা কষ্টকর। নাক দিয়ে যেমন নিঃশ্বাস নেওয়া হয় তেমনি জলই হচ্ছে জমির প্রাণ। মোষের মাথা নেই অর্থ সবই মাদী মোষ একটাও মদ্দা মোষ নেই। বাড়ীর ইজ্জৎ নেই বলতে বুঝিয়েছে বাড়ীর সামনে অতিথির কোন বসবার জায়গা নেই। আর গলার আওয়াজ করে কেন ঢুকতে বলেছিল তা তো তুমি নিজেই দেখেছ। সুতরাং নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এর মত চালাক খুব কমই আছে। তুমি শিগ্‌গীর ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। ওই আমার যোগ্য স্বামী'। ব্রাহ্মণ দৌড়ে দৌড়ে অনেক দূর যেয়ে দেখতে পেলো দূরে সেই ছেলেটি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ তাকে ডেকে অনেক অনুনয় বিনয় করে, অনেক বুঝিয়ে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলো। তারপর একদিন মহাসমারোহে ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর দিন কাটাতে থাকে। স্বামীকে বিমর্ষ দেখে একদিন ব্রাহ্মণের মেয়ে কারণ জিজ্ঞেস করল। ছেলেটি সমস্ত খুলে বললে। আর মাত্র কয়েকদিন বাকী আছে। এর মধ্যে বাবা যদি মাছ কেন হাসে তার উত্তর রাজাকে বলতে না পারে তাহলে তাঁকে সবংশে নিধন হতে হবে। তখন ব্রাহ্মণের মেয়ে বললে, 'যে তোমাদের রাজ্যে আমাকে নিয়ে চল। আমি এর মীমাংসা করে দেবো'। স্বামীর সঙ্গে মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী গেল এবং রাজাকে বলে পাঠালো যেদিন ছমাস পূর্ণ হবে সেদিন বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের নিমন্ত্রণ করতে। আর এও বলে দিলে যে সাতটি গর্ত খুঁড়ে রাখতে।

যেদিন মীমাংসা হবে সেদিন প্রচুর জন সমাবেশ হলো। রাজা, পাত্র, মিত্রসহ সিংহাসনে বসে আছেন। ব্রাহ্মণের ছোট মেয়ে বললে, 'মহারাজ আপনার তিন রাণী আর তাদের চার সখীকে সবার সামনে হাজির করুন'। মহারাজ ক্রুদ্ধ হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এর কি কোন প্রয়োজন আছে'। ব্রাহ্মণের ছোট বউ মৃদু হেসে বললে, 'একটু পরেই তা দেখতে পাবেন'। তখন তিন রাণী আর চার সখী

এসে উপস্থিত হলো। ব্রাহ্মণের ছোট বউ সবাইকে রাজার সামনে হেঁটে যেতে বললে। দেখা গেল চার সখীর মধ্যে তিনজন ডান পা আগে বাড়াল। ছোট মেয়ে তখন সভাস্থ সকলকে শুনিয়ে বললে, 'আপনার অন্তঃপুরে নারীর ছদ্মবেশধারী রাণীর এই সঙ্গী তিনজন আসলে পুরুষ। মাছ ধরার পর আপনি যখন পুরুষ আর মেয়ে মাছ আলাদা করতে বলেছিলেন তখন এইজন্যই তারা হেসেছিল যে রাজার নিজের ঘরেই যখন ইজ্জৎ নেই তখন্ আর ছেলে মাছ মেয়ে মাছ আলাদা করা কেন'? রাজা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আদেশ করলেন যে ঐ সাতজনকে নীচে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলা হোক্। সভা-পণ্ডিত এবং তার পুত্রবধূকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন রাজা। তারপর পণ্ডিতের পুত্র আর পুত্রবধূ সুখে ঘরকন্না করতে লাগলো। [কুইলাপাল গ্রাম থেকে সংগৃহীত ১৭. ৪. ৬৭.]।

উপরোক্ত রূপকথাটি বিচিত্র ও নানা বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। এই রূপকথাটির উৎস আবিষ্কার করতে যেয়ে যে কথাটি মনে আসে তা হচ্ছে কুইলাপালের মানুষের জীবনে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ। কুইলাপাল গ্রামটি বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, দল—উপদল, নানা ধর্মীয় সামাজিক রীতিনীতির মিশ্রণে কুইলাপালের সাংস্কৃতিক জীবন অত্যন্ত সমৃদ্ধপূর্ণ। তাই প্রথমতঃ রূপকথাটিতে কুইলাপালের মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিচয় আছে। দ্বিতীয়তঃ আদিবাসী সমাজের, বিশেষতঃ সাঁওতাল সমাজের সঙ্গে কুইলাপালের মানুষের প্রাত্যহিক জীবন বিশেষভাবে সংমিশ্রিত। আদিবাসী সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতা অত্যন্ত প্রবল কারণ, তারা মূলতঃ মাতৃতান্ত্রিক সমাজের লোক। সংগৃহীত রূপকথাটিতে দেখা যায় সভা-পণ্ডিত রাজার সমস্যার সমাধান করতে না পেরে যে বিপদের মধ্যে পড়েছিল এমনকি তার সমস্ত পরিবার যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল তখন বাড়ীর বধূ তার উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত পরিবারটিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এই গল্পের একটি অন্যতম অভিপ্রায় (motif) হচ্ছে কৃতি পুত্রবধূ (successful

daughter-in-law)। এই মনোভাব মনে হয় সাঁওতাল সমাজ জীবন থেকে আহৃত। কারণ আদিবাসী সমাজে স্ত্রীলোকের বুদ্ধিমত্তা এবং শারীরিক শক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। এ প্রসঙ্গে Mildred Archer-এর উদ্ধৃত একটি সাঁওতালী রূপকথার উল্লেখ করা যেতে পারে: In one story a capable wife saves the whole family from ruin. A father and his seven sons had fallen into poverty. The father chose his eldest daughter-in-law to be the head of the family and all promised to obey her. She told the family to bring in whatever they could find in the fields, no matter what it was. The old man came back with some human excrement wrapped up in a leaf, and his daughter-in-law hung it up in the house. Then he brought in the slough of a sake which she fastend to the roof with a clod of earth. Many years later the Raja of the country was ill and the ojhas said that only human excrement twelve years old could cure him. A reward of two hundred rupees was offered for it and the daughter-in-law was able to procure the medicine. Another day the son of a Raja was bathing and left his gold belt by the tank. A kite sized it and flew it ; but when it saw the snak skin lying on the roof it dropped the belt and flew off with the skin. A reward of a thousand rupees was offered for the belt. In this way a prudent housewife made her family rich. ['The Folk-Tale in Santal Society.' By Mildred Archer. *Man in India*-XXIV-Dec. 1944.]

উদ্ধৃত সাঁওতালী গল্পটির সঙ্গে কুইলাপালে সংগৃহীত গল্পটির

অনেকাংশেই হয়ত মিল নাই, কিন্তু মূল অভিপ্রায়টির ক্ষেত্রে এ দুটি গল্পের সাদৃশ্য আছে। এই অভিপ্রায়টি হচ্ছে পুত্রবধূর বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত পরিবারের আত্মরক্ষা। সংগৃহীত গল্পটিতে দেখা যায় সভাপণ্ডিত তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রবধূর উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা মাছ কেন হাসে এই সমস্যার সমাধানের পর সপরিবারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সাঁওতালী গল্পটিতে বাড়ীর পুত্রবধূ তার উপস্থিত বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে তার শ্বশুরের সমস্ত পরিবারটিকে দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। সুতরাং কুইলাপালে সংগৃহীত গল্পটির উৎসে আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের প্রভাব যে বিদ্যমান একথা অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয়তঃ কুইলাপালে সংগৃহীত গল্পটিতে ব্রাহ্মণ-পুত্রের যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে তার মধ্যে দুটি অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, কৃতি-কনিষ্ঠপুত্র (successful youngest child)। দ্বিতীয়টি ব্রাহ্মণের বুদ্ধি। কৃতি-কনিষ্ঠপুত্র অভিপ্রায়টি পৃথিবীর লোক-সাহিত্যের একটি সুপরিচিত অভিপ্রায়। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে: 'The central figure of a wide spread group of folk-tales about the victorious youngest child (Lo-199). The youngest son (usually of three) performs a required seemingly impossible task or quest (H. 1242) at which the elders fail or are cought and put to death during their efforts, or are rescued by the youngest (R. 155.1). The youngest son is often a simpleton, or seemingly a nitwit, really often the cleverest or most practical [S. D. F. L. Vol. 2. pp. 1192]। সুতরাং সংগৃহীত গল্পটির মধ্যে কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পুত্রের যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেছে তা পৃথিবীর তাবৎ লোক-কথারই একটি সুপরিচিত অভিপ্রায় এবং প্রধানতঃ এই কনিষ্ঠ পুত্র এবং তার বধূর চেষ্টায় সভাপণ্ডিত মাছ হাসার সমস্যাপূরণে সক্ষম হয়েছিল।

শুধু তাই নয় পণ্ডিতের কনিষ্ঠ পুত্র তার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণ কন্যাকে লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল। সে যে অত্যন্ত বাস্তববাদী, ব্রাহ্মণের জমি, মোষ এবং গৃহসম্পর্কিত উক্তিতেই তার পরিচয় মেলে।

ব্রাহ্মণের বুদ্ধির পরিচয় আছে সংগৃহীত গল্পটিতে, কিন্তু বাংলাদেশের লোককথায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ই ব্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের লোককথার উৎসে আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজের অত্যধিক প্রভাব থাকার জন্য উচ্চবর্ণের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ইত্যাদিকে বোকা, নির্বুদ্ধি হিসাবে দেখান হয়েছে। উপকথা, রূপকথার মধ্যে এই প্রসঙ্গে বাংলার লোক-সাহিত্যের চতুর্থ খণ্ডে ৫১৫ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণের বুদ্ধি নামক একটি গল্পে ব্রাহ্মণের বুদ্ধির জোরে কিভাবে ব্রহ্মদৈত্য অন্তর্হিত হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণ রাজকন্যা ও রাজত্ব লাভ করেছিল তার পরিচয় আছে। এই গল্পটি প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'ব্রাহ্মণের নির্বুদ্ধিতার কথাই সাধারণতঃ শুনিতে পাওয়া যায়, এই কাহিনীটি তাহাদের একটি ব্যতিক্রম। তবে বৌদ্ধজাতকের অনেক কাহিনীতে ব্রাহ্মণকে তস্কররূপে বর্ণনা করিতে গিয়া তাহার বুদ্ধির কথাও প্রকাশ করা হইয়াছে। জাতকের কাহিনীতে শুনা যায় ব্রাহ্মণের বুদ্ধি থাকিলেও তাহা সৎকার্যে কদাচ নিয়োজিত হয় না। এখানে ব্রাহ্মণ নিজেই বুদ্ধি করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে।' [পৃঃ ৫১৭]

কুইলাপালে সংগৃহীত রূপকথাটিতে ব্রাহ্মণপুত্রের যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেছে তার মধ্যে বৌদ্ধজাতকের গল্প বাংলা তথা ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত। নিম্নবর্ণের মানুষও লোকপরম্পরাক্রমে কথনের মধ্যে দিয়ে জাতকের গল্প শুনে এসেছে। হয়ত তার প্রভাবেই আদিবাসী প্রভাবিত নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজের এই রূপকথাটিতে ব্রাহ্মণপুত্র বুদ্ধিমান হয়ে দেখা দিতে পেরেছে।

অপর একটি ব্যতিক্রম গল্পটিতে লক্ষ্য করা গেছে তা হচ্ছে জামাতার বুদ্ধিমত্তা। বাংলাদেশের লোককথায় একটি প্রচলিত

অভিপ্রায় হচ্ছে জামাতার নির্বুদ্ধিতা। জামাইকে নির্বুদ্ধিরূপে উপস্থিত করার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্যে'র চতুর্থ খণ্ডে। তাঁর মতে জামায়ের প্রতি আক্রোশেই জামাইকে নির্বুদ্ধিরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কারণে বাঘ বোকা সেই কারণেই জামাইও বোকা। দ্বিতীয়তঃ জামাই কন্যা অপহরণকারী। তৃতীয়তঃ শাশুড়ী-জামাতা avoidance। চতুর্থতঃ ঘর জামাই। এছাড়াও আমাদের সমাজের পণপ্রথা, তত্ত্ব পাঠানো ইত্যাদির দ্বারা শ্বশুর-নিপীড়ন ব্যবস্থা থেকে আক্রোশবশতঃ জামাইকে হাস্যকররূপে উপস্থিত করা হয়েছে বাংলার লোক-কথাতে। জামাই যে কত বোকা তার পরিচয় পাওয়া যায় 'বাংলার লোক-সাহিত্যে', চতুর্থখণ্ডের 'মটকী', 'শাশুড়ীর লাঞ্ছনা' ইত্যাদি গল্পগুলিতে। কিন্তু কুইলাপালে সংগৃহীত রূপকথাটিতে প্রাণদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত রাজার সভাপণ্ডিতের কনিষ্ঠপুত্রের আচার-আচরণ বোকার মত মনে হলেও কিন্তু আসলে সে যে কত বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের মেয়ে তা ব্রাহ্মণকে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এই রূপকথাটিতে ব্রাহ্মণের জামাই অর্থাৎ সভাপণ্ডিতের কনিষ্ঠপুত্র বুদ্ধিমান, বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জামাইরূপে উপস্থিত হয়েছে, এটি বাংলার লোক-কথায় একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যতিক্রম।

কুইলাপালের সংগৃহীত রূপকথাটিতে যে আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের প্রবল প্রভাব বিদ্যমান তার আরও প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। পাত্র অনুসন্ধানরত ব্রাহ্মণের সঙ্গে সভাপণ্ডিতের কনিষ্ঠ-পুত্রের সাক্ষাতের পর সভাপণ্ডিতের কনিষ্ঠপুত্রের আচার-আচরণ অধিকাংশই হেঁয়ালীপূর্ণ ও রহস্যময়। যেমন স্রোতে খই ছড়িয়ে জল খাওয়া, জুতো পরে নদী পার হওয়া, ছাতা মাথায় দিয়ে গাছের তলায় বসা, ব্রাহ্মণ নিজের জমি দেখালে 'জমি ভাল তবে জমির নাক নেই' বলে উত্তর দেওয়া, মোষের পাল দেখালে, 'মোষ ভাল তবে মোষের মাথা নেই বলা', ব্রাহ্মণের বাড়ীর কাছে এসে বাড়ীর ইজ্জৎ নেই বলে অভিমত দেওয়া হয় এই সমস্ত কিছুই হেঁয়ালীপূর্ণ

এবং রহস্যময়। ব্রাহ্মণ এই রহস্য এবং হেঁয়ালীর সমাধান করতে না পেরে মনে মনে পণ্ডিতের কনিষ্ঠপুত্রকে চরম বোকা বলে ভেবেছে। পরে অবশ্য ব্রাহ্মণের মেয়ে যখন এই রহস্য উন্মোচন করেছে—হেঁয়ালী ও ধাঁধাকে পরিষ্কার করেছে তখন ব্রাহ্মণ সমস্ত কিছু অনুধাবন করতে পেরেছে। এই যে লোক-কথার মধ্যে হেঁয়ালী ও রহস্যময়তার প্রাচুর্য এটি পরিপূর্ণভাবে সাঁওতাল সমাজের দান বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে Mildred Archer-এর 'The Folk-tale in Santal Society' নামক প্রবন্ধ থেকে এর সমর্থন স্বরূপ একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে।

'The first type involves a use of riddle talk or conversational smbolism. Some men go to look for a possible bride and are prejudiced against a girl because she says her father and mother are out, her father 'having gone to meet rain' and her mother 'to make two persons of one'. (Booding 91). The men think the girl is utterly stupid but on returning home their women folk jeer at their obtuseness and say that the girl's meaning is quite clear. The father had gone to cut that-ching grass and the mother had gone to grind split peas ? [*The Folk-Tale of Santal Society*. Mildred Archer. Man in india, vol XXIV, pp. 225].

উদ্ধৃত সাঁওতাল গল্পটিতে পাত্র কনে খুঁজতে বেরিয়েছে আর এখানে কন্যার পিতা পাত্র খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু পাত্রেরই হোক আর কন্যারই হোক যোগ্যতা নির্ণীত হয়েছে হেঁয়ালীপূর্ণ কথাবার্তায় এবং ধাঁধা ও রহস্য-সমাধানের বুদ্ধিমত্তায়। সুতরাং কুইলাপালের রূপকটিতে আদিম সমাজের প্রভাব অনস্বীকার্য। কুইলাপালের গ্রামীন মানুষ শালবনের প্রান্তরে, শশিসেনা বাঁধের

ধারে বাস করে এভাবেই পরস্পর পরস্পরের সাংস্কৃতিক জীবনকে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত করেছে।

সংগৃহীত গল্পটির মধ্যে কয়েকটি লোকাচার ও গ্রাম্য জীবনধারার পরিচয় আছে। প্রথমতঃ গল্পটিতে পাই যে গৃহের সামনে অতিথি বসার জায়গা থাকে না, সে গৃহের ইজ্জৎ অর্থাৎ সম্ভ্রম থাকে না। অতিথি-আপ্যায়ন কুইলাপালের মানুষের একটি নিয়মনিষ্ঠ আচার, গ্রাম্য রীতি। তাই যখনই কুইলাপালের মানুষের দরজায় পৌঁছান গেছে তখনই তারা খাটিয়ে এগিয়ে দিয়েছে বসতে দিয়েছে। লাজুক বধূ শস্যক্ষেত্রে কর্মরত স্বামীকে ডাকতে পাঠিয়েছে গৃহস্বামী, শশব্যস্ত হয়ে অতিথির আদর আপ্যায়ণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ যে গৃহে সোমত্ত বয়সের যুবতী আছে সেখানে—এমন কি গৃহস্বামীকেও গলার আওয়াজ দিয়ে ঢুকতে হয়। এটিও একটি গ্রাম্য রীতি ও বিশ্বাস এবং তাতে গৃহের গোপনীয়তা ও সম্ভ্রম রক্ষিত হয়। সংগৃহীত রূপকথাটিতে এরূপ গ্রাম্য বিশ্বাস ও আচার-রীতির কিছু কিছু পরিচয় মেলে।

কুইলাপালে সংগৃহীত বহু রূপকথার মধ্যে কয়েকটি সাধারণ শ্রেণীর রূপকথাও সংগৃহীত হয়েছে। নিম্নে উদ্ধৃত রূপকথাটি একান্তভাবে গ্রাম্য রূপকথা। গল্পটি হচ্ছে এই ঃ

এক বিধবা আর তার একটি ছেলে। নাম তার গোমদা। তার বন্ধুরা একদিন জিগ্যেস করলে, তোর বিয়ে হয়েছে? গোমদা উত্তর দিলে, মা জানে। গোমদা খেলার শেষে মাকে এসে জিগ্যেস করলে, আমার বউ কোথায়? মা কাজ করছিল। বিরক্ত হয়ে একটা পুতুলকে দেখিয়ে বললে, ঐ ত তোর বউ। গোমদা সেই পুতুলের সামনে যেয়ে বললে, তুমি আমার বউ। আমাকে খেতে দাও। পুতুলটি কিছু বললে না। তখন গোমদা রেগে পুতুলটিকে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে খেলতে চলে গেল। বন্ধুদের বললে, বউ রা কাড়ছে না। বাড়ী ফিরে এসে পুতুলটাকে আর দেখতে না পেয়ে মাকে জিগ্যেস করলে, আমায় বউ কোথায়? মা বললে,

বাপের বাড়ী চলে গেছে। সে জিজ্ঞেস করলে, শ্বশুর বাড়ী কত দূরে? মা বললে, সোজা চলে যাবি দক্ষিণ দিকে। এক সারিতে তিনটি ঘর। সেটাই তোর শ্বশুর বাড়ী। যাবার সময় চারটে পয়সা দিয়ে মা বললে, পথে ক্ষিধে পেলে জিসমিস কিনে খাস। প্রত্যেক দোকানদারকে জিসমিসের কথা জিগ্যেস করে, আর তারা হাসতে থাকে। তারপর এক দোকানদার বললে, আমার দোকানে জিসমিস আছে। এই বলে তাকে কিছু ওল আর কচু দিল। সেগুলো সে খেতে খেতে যাচ্ছে আর বলছে, 'কড়ির জিনিস পড়িস না।' খাচ্ছে, আর বলছে—আর পথ হাঁটছে। রাস্তায় দেখা হয়েছে এক মন্ত্রীর কন্যার সঙ্গে। তাকেই বউ ভেবে বলে উঠলে, 'এক গড়ানে এতদূর, দু'গড়ানে কতদূর'? মন্ত্রীর মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মন্ত্রীকে গিয়ে অপমানের কথা বলল। মন্ত্রী রেগে লোকজন দিয়ে গোমদাকে উত্তম-মধ্যম মার খাইয়ে দিল। খুব ক্ষিধে পেয়েছে। আরও রাগও খুব হচ্ছে। সামনে একটা কুলগাছ দেখতে পেয়ে তার ওপর উঠে কুল খেতে লাগল আর ভাবতে লাগলো যে মন্ত্রীর মেয়ে অর্থাৎ তার বউকে কিভাবে পাওয়া যায়? এমন সময় দেখলে সেই দেশের রাজা গাড়ু হাতে প্রাতঃকৃত্য করতে এসে সেই কুলগাছের তলাতেই বসল। গাছের তলায় অনেক কুল পড়েছিল। রাজা প্রাতঃকৃত্য করতে করতে দু'একটা কুল তুলে যেই খেয়েছে অমনি গোমদা বলে উঠলো, 'রাজা প্রাতঃকৃত্য করতে করতে কুল খেয়েছে। একথা সবাইকে বলে দেব'। রাজা মাথা তুলে দেখলো যে গাছে একটা ছেলে বসে কুল খাচ্ছে। রাজা তাকে নেমে আসতে বললো। কিন্তু গোমদা মারের ভয়ে কিছুতেই নামতে চায় না। রাজা বললে, 'তুই যা চাস তাই দেব। তুই আমার কথা কাউকে বলিস না'। গোমদা গাছের ওপর থেকে বললে, 'তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে মন্ত্রীর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে আর অর্ধেক রাজত্ব দেবে তাহলে আমি কাকেও কিছু বলবো না'। রাজা তার প্রস্তাবে রাজী হলো নিজের ইজ্জৎ বাঁচাবার

জন্যে। শুভদিন দেখে মন্ত্রীর মেয়ের সঙ্গে গোমদার বিয়ে হয়ে গেল আর অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে বাড়ী ফিরে এসে বিধবা মা আর বউকে নিয়ে মহাসুখে ঘরকন্না করতে লাগল। [কুইলাপালে ১৯৬৭ সালে সংগৃহীত, শশাঙ্কশেখর পাণ্ডা কর্তৃক কথিত]।

কুইলাপালে সংগৃহীত এই রূপকথাটি একটী অত্যন্ত সাধারণ-স্তরের গ্রাম্য রূপকথা হলেও তার মধ্যে দিয়েও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম অভিপ্রায়টি হলো 'নকল অথবা প্রতিকল্প স্ত্রী' (False or substituted bride)। গল্পের নায়ক গোমদা সঙ্গীদের কাছে বিয়ের কথা শুনে মাকে এসে যখন জিগ্যেস করেছিল বৌ কোথায় তখন তার মা বিরক্ত হয়ে একটা পুতুলকে তার বৌ হিসাবে দেখিয়ে দিয়েছিল। বালক গোমদা সেই পুতুলের কাছে যেয়ে বৌ হিসাবে খাবার চেয়েছিল, পরে তার কাছে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে লাথি মেরে চলে এসেছিল। এই যে নকল বৌ এর অভিপ্রায় এটি কেবল কুইলা-পালের সংগৃহীত গল্পটিতেই নয় পৃথিবীর তাবৎ লোককথারই একটি সুপরিচিত অভিপ্রায়। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে, 'The false or substituted bride is one of the most wide spread of all folk-tale motifs······It is a common motif all over Africa, found in Swahili, Kajjir, Fjort, Basuto, Bushman, and Zulu stories. [S.D.F.L. pp. 368]

তাই মনে হয় এই নকল-বৌ প্রদর্শনের মধ্যে আদিবাসী সমাজের প্রভাব অনেকখানি বর্তমান। দ্বিতীয় যে অভিপ্রায়টি গল্পটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তা Aarne Thompson-এর Type Index অনুযায়ী 'The quest for the lost wife (Type 400)' অর্থাৎ 'হারানো স্ত্রীর সন্ধানে যাত্রা' নামক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। পুতুল ভেঙ্গে যাওয়ার পর মা ছেলেকে এই বলে শান্ত করছে যে তার বৌ বাপের বাড়ী গেছে। কোথায় সেই বাড়ী একথা ছেলে

খোঁজ করাতে মা উত্তর দিয়েছে, সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গেলে পাশাপাশি যে তিনটি ঘর সেটিই তার শ্বশুরবাড়ী। এরপর ছেলেটি তার বউ এর সন্ধানে যাত্রা করেছে। তৃতীয় যে অভিপ্রায়টি এখানে প্রকাশিত সেটি হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা দ্বারা স্ত্রী এবং রাজত্বলাভ। গল্পটিতে কিভাবে রাজাকে জব্দ করে মন্ত্রীর কন্যাকে নায়ক স্ত্রীরূপে পেয়েছিল তার একটি কৌতুকতর বিবরণ আছে। এছাড়াও কুইলাপালে প্রাপ্ত রূপকথাটিতে 'জিসমিস' বলে একটী খাদ্যের উল্লেখ করা হয়েছে যার সঙ্গে বাংলা দেশের অন্যান্য অংশের রূপকথায় প্রচলিত 'কিছুমিছু'র সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'কিছুমিছু'র ব্যাপারেও দেখা গেছে যে দোকানদার ওলে গুড় মাখিয়ে কিছুমিছু বলে বিক্রী করেছে। কুইলাপালের রূপকথাটিতেও ঠিক তাই।

কুইলাপালের জনজীবনে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির স্পষ্ট মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে রামায়ণ-পুরাণ-মহাভারতাদির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব অন্যদিকে লৌকিক ও আদিম মানসিকতা। একদিক দিয়ে শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ অন্যদিকে লৌকিক আচার-আচরণ ও জীবনরীতির সুন্দর সংমিশ্রণ হয়েছে কুইলাপালের জনজীবনে। তাই কুইলাপালে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক রীতির সুন্দর সমন্বয় সাধন হয়েছে। ইন্দ্রপূজা, ভেজাবিঁধা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলে এর যথার্থতা উপলব্ধি করা যাবে। ইন্দ্রপূজায় একদিকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত আবার অন্যদিকে গ্রামের আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দুও অংশগ্রহণ করে। এভাবে উৎসব-গুলিকেও, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখা গেছে যে কুইলাপালের উৎসব, পূজা, পার্বণ ইত্যাদিতে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণে সংস্কৃত মন্ত্রোচারণ করেছে, বৈষ্ণবের কীর্তনগানের আসর বসেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করা মুরগী এবং পাঁঠাও বলি হয়েছে। এই শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ, জীবনরীতি ও লৌকিক জীবনধারার সমন্বয়ে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক মানস গড়ে উঠেছে।

কুইলাপালের রূপকথায় এরই চিহ্ন বর্তমান। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করা যেতে পারে ঃ

এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিল। সে প্রতিদিন রাজবাড়ীতে গীতাপাঠ করতো। কিন্তু গীতাপাঠ করে তার কোন আর্থিক উন্নতি হয়নি। কোন রকমে কায়ক্লেশে দিন চলতো। এইজন্যে প্রতিদিন তাকে তার স্ত্রীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। একদিন সে ভাগ্যের সন্ধানে গীতা হাতে নিয়ে মনের দুঃখে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় ছেলেকে রোজ রাজবাড়ীতে গীতাপাঠ করার কথা বলে গেল।

তারপর ব্রাহ্মণ অনেকদূর হেঁটে যখন এক বনের ধারে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বনের ভেতরে একটা গাছের তলায় বসে ব্রাহ্মণ বিশ্রাম করতে লাগল। রাত ক্রমশঃ গভীর হতে নানারকম হিংস্র জন্তুর গর্জনে ব্রাহ্মণ ভয় পেয়ে গীতাপাঠ করতে শুরু করে দিলে। ব্রাহ্মণ গীতা পাঠ করতে করতে দেখল, একটা গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে এসে একমনে তার গীতাপাঠ শুনছে। গীতাপাঠ শেষ হয়ে গেলে সাপ সেখানে একটা মণি রেখে আস্তে আস্তে নিজের গর্তে ঢুকে গেল। ব্রাহ্মণ সে মণিটা নিয়ে বাড়ীতে রেখে এলো। এইভাবে ব্রাহ্মণ রোজ বনের মধ্যে বসে গীতাপাঠ করে আর সাপ সেই গীতাপাঠ শুনে চলে যায়। যাবার সময় একটা করে মণি রেখে যায়। এইভাবে অনেক মণি পেয়ে ব্রাহ্মণের অবস্থা ফিরে গেল। অনেক দিন পরে একদিন ব্রাহ্মণপুত্র তার বাবাকে বললে যে এবার সে বনের মধ্যে গীতাপাঠ করতে যাবে। কারণ পূর্ব থেকেই সে তার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে রেখেছিল যে সাপটাকে কেটে সব মণিগুলো বার করে নেবে। অনেক বলার পর ব্রাহ্মণ রাজী হলো। তার ছেলেকে বনে গীতাপাঠ করতে পাঠিয়ে নিজে রাজবাড়ীর দিকে রওনা হলো। যাবার সময় ছেলেকে বললে যে সে যেন সাপটার কোন ক্ষতি না করে। ব্রাহ্মণের ছেলে একটা লাঠি পাশে রেখে গীতাপাঠ করতে লাগলো। সাপটা ধীরে ধীরে বেরিরে এসে লাঠিটা দেখে

আবার গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে গেলো। দ্বিতীয় দিন ব্রাহ্মণপুত্র লাঠিটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে গীতাপাঠ করতে লাগলো। সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে গীতাপাঠ শুনতে লাগলো। হঠাৎ ব্রাহ্মণপুত্র লাঠি দিয়ে সাপটাকে খুব জোরে আঘাত করলে। সঙ্গে সঙ্গে সাপটা ঘুরে ব্রাহ্মণপুত্রকে দিল এক ছোবল। ব্রাহ্মণপুত্র সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল, আর সাপটাও অর্দ্ধমৃত হয়ে ওখানে পড়ে রইল। এদিকে ব্রাহ্মণ ছেলের বাড়ী ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে খুঁজতে খুঁজতে বনে এসে দেখলো যে তার ছেলে মরে পড়ে আছে আর সাপটা ছট্‌ফট্ করছে। ব্রাহ্মণ সব বুঝতে পারল। তখন সাপ বললে, 'আমার কোন দোষ নাই। তোমার পুত্র প্রথমে আমাকে আঘাত করেছিল, আমি তাই প্রতিঘাত করেছি মাত্র'। সাপ কাতরাতে কাতরাতে আরও বললে, 'এক কঠিন অপরাধের জন্য এক মুনি আমাকে অভিশাপ দিয়েছিল। তারই ফলে আমি সাপে পরিণত হয়েছিলাম। বহু অনুনয় বিনয়ের পর মুনি বলেছিল, সৎকাজে যদি কিছুকাল জীবন অতিবাহিত করতে পারি তাহলে আমার শাপমুক্তি হবে। আপনি আমাকে রোজ গীতা শুনিয়েছেন। তার বিনিময়ে আমি আপনাকে একটি করে মণি দিয়ে সৎকাজ করেছি। আপনি আমার শাপমুক্তির সহায়ক। আপনার পুত্রের ব্যবহারে আমার আর ক্রোধ নাই। আপনার কমণ্ডলুতে যে গঙ্গাজল আছে তা আমাদের দুজনের গায়ে ছিটিয়ে দিন। তাহলেই আমরা বেঁচে উঠবো'। ব্রাহ্মণ তাদের গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতেই সাপের খোলস কেটে এক অপরূপ সুন্দর রাজপুত্র বেরিয়ে এলো আর ব্রাহ্মণপুত্র বেঁচে উঠলো। রাজপুত্র নিজের রাজ্যে ফিরে এসে ব্রাহ্মণকে অনেক উপঢৌকন দিল। ব্রাহ্মণ সুখে দিন যাপন করতে লাগলো।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কুইলাপালের জনজীবনে আদিম লোক-জীবন ও শাস্ত্রীয় জীবন সংমিশ্রিত হয়ে এক আশ্চর্য সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে। উপরোক্ত গল্পটিতে তারই যথেষ্ট প্রমাণ মেলে।

গল্পটিতে দুটি মানসিকতা পাশাপাশি বিদ্যমান। একটি হচ্ছে গীতাপাঠের মাহাত্ম্য বর্ণনা। আর একটি হচ্ছে ব্রাহ্মণপুত্রের চাতুরী ও হটকারিতা। মূল যে বৈশিষ্ট্যটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে অভিশাপগ্রস্ত রাজপুত্রের সর্পরূপ ধারণ ও গীতাপাঠ শ্রবণ এবং শ্রবণের ফলে ও সৎ কর্মে মুক্তিলাভ। 'শাস্তি-স্বরূপ পরিবর্তন' (Transformation as punishment) লোক-সাহিত্যের একটি পৃথিবীব্যাপী অভিপ্রায়। কুইলাপালে সংগৃহীত গল্পটির মধ্যেও এই অভিপ্রায়টি বর্তমান। এ প্রসঙ্গে অভিধানে বলা হয়েছে, 'A common incident of folk-tale, combining the transformation group of motifs (Do. ff) with the punimshment motifs. (pp. 1122. S. D. F. L.)। কুইলাপালে সংগৃহীত গল্পটিতে রাজপুত্র একটি অপরাধের জন্যে শাস্তি পেয়েছিল এবং তারই শাস্তি-স্বরূপ সর্পে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

শশীসেনা বাঁধের তীরে কুইলাপালের আগণিত মানুষ, কৃষকের দল, রাখাল বালকগণ, গৃহবধূ আসে গান গায় কত সুখ-দুঃখের কথা বলে আর সেই সঙ্গে বলে চলে কত অসংখ্য আর বিচিত্র রূপকথা।



তৃতীয় পর্ব

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের উপকথা

॥ সূচনা ॥

মুণ্ডা জাতির ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ নির্মলকুমার বসু বলেছেন: 'এক সময়ে সমগ্র ছোটনাগপুর গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। কোল অথবা মুণ্ডা জাতির পক্ষে পূর্বকালে কুঠার লইয়া দাহীর মত চাষ করা হয় তো বিচিত্র নয়। কারণ, এরূপ জারা (জ্বালানো)-র দ্বারা ক্রমে ক্রমে বনভূমি পরিষ্কার করার অস্পষ্ট স্মৃতি তাহাদের মধ্যে খুঁজিলে আজও পাওয়া যায়'। ['হিন্দু সমাজের গড়ন', পৃ. ১৯]। এই অরণ্যবাসী—মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, ভূমিজ, মাল-পাহাড়ী ইত্যাদি আদিম মানুষেরই প্রাধান্য পশ্চিম-সীমান্তবর্তী বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের এইসব অঞ্চলে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-পুষ্ট হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে তাদের বাহিরের সমাজে জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটলেও আসলে তাদের লোকাচার এবং আদিম সংস্কারকে অস্বীকার করতে পারেনি। তার বহু প্রমাণ আছে এদের রচিত লোক-সাহিত্যে, রূপকথায়, উপকথায়, ব্রতকথায় ছড়ায় ও গানে।

এরই সমর্থনে উপরোক্ত লেখকের একটি মন্তব্য উপস্থিত করা যায়: 'জুয়াঙ্‌গ্, শবর অথবা মুণ্ডা, উরাঁও জাতিবৃন্দ কিন্তু অরণ্যের ছায়া পরিত্যাগ করিয়া কয়েক শতাব্দী মাত্র অপরাপর জাতির সহিত অর্থনৈতিক বা সংস্কৃতিগত বন্ধনে সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য আজও বজায় রহিয়াছে এবং লোকাচার বা দেশাচারের কোন কোন অংশ পূর্বাবস্থার স্মৃতি বহন করিয়া রহিয়াছে।' [ঐ, পৃ. ৫১]। সুতরাং এর থেকে অনায়াসে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে আদিম জনগণ গভীর অরণ্যের ভয়ংকর শ্বাপদসঙ্কুল পরিবেশ ছেড়ে এলেও, আদিম হিংস্র পশুগণের স্মৃতি

তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। বরং ঐ বীভৎস ভয়ানক পরিবেশ থেকে দূরে এলে সেখানকার জীবজন্তুদের কথা খুব বেশীই তাদের মনে আসতো। ফলে সেই সব অভিজ্ঞতার চিত্র আছে তাদের রচিত উপকথা ইত্যাদির মধ্যে। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার উপকথাগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই সব আদিম মানুষের সংস্কার, আচরণবৃত্তি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নানা ছবি-প্রতিচ্ছবি। আর দেখা যায় তাদের ভাষাগত আদিম বৈশিষ্ট্য ও মনস্তাত্ত্বিক নানা কারণাবলী। তাই পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার গ্রামে গ্রামে, অরণ্যাবৃত ছায়াময় প্রান্তরে প্রান্তরে আদিবাসী মানুষ ও গ্রাম্য-জনগণ পাশাপাশি বসবাস করে রচিত করে চলেছে, শিয়ালের গল্প, তার চাতুরীর কথা, বোকা বাঘের বোকামীর কথা, বোকা জামাই-এর নির্বুদ্ধিতার কথা, নাপিতের বুদ্ধিমত্তা ও তাঁতির মস্তিষ্কের অসারতার কথা, ভূত-প্রেত, দানা-দৈত্য, ডাইনীদের সম্পর্কে নানা বিশ্বাস এবং অলৌকিক আচার-আচরণের কথা।

অনেক লোককথাবিদ্ মনে করেন যে টোটেম বিশ্বাস থেকেই উপকথার উৎপত্তি, কারণ, এই 'টোটেম'ই তাদের প্রথম ধর্মনৈতিক বিশ্বাসের জন্মদাতা। 'Some authorities have fastened on totemism as the most ancient and primitive form of religion.······A totem is a species of animal or plant, or more rarely a class of inanimate objects, to which a social group (a clan) stands in an intimate and very special relation of friendship or kinship—frequently it is thought of as the ancestor of the clan—and which provides that social group with its name. The totem is not exactly a god, but a cognate being and one to be respected.' [*The Philosophy of Religion*, D. Miall Edwards. pp. 40]। অর্থাৎ কোন কোন বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন 'টোটেমিশিম্' হচ্ছে

প্রাচীনতম আদিম ধর্মের রূপ। টোটেম হচ্ছে এমন এক ধরণের জন্তু বা লতা বা কোন অচেতন সামগ্রী যার প্রতি একটি গোষ্ঠীর বিশেষ ঘনিষ্ট আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব থাকে, যাকে প্রায়শই গোষ্ঠীর পুরুষ বলা হয়ে থাকে এবং যার নামে একটি গোষ্ঠীর পরিচয় হয়। এর আরো সমর্থন পাওয়া যায় F. B. Jevons-এর Introduction to the History of Religion গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে, 'Animals were the first of the external, objects that thus came to be worshipped and totemism was the first form of that worship,........for a long period man continued to have only one object of worship—namely, the totem or tribal God-' [Ibid, pp. 41]। অর্থাৎ পশুই হচ্ছে প্রথম বাহ্যিক বস্তু যা পূজা পেয়েছে এবং 'টোটেমিসম্' ছিল সেইরূপ পূজার প্রথম রূপ এবং এইভাবে বহুদিন ধরে মানুষ এই একটি মাত্র বস্তুকেই পূজা করে এসেছে সেটি হচ্ছে টোটেম, অর্থাৎ 'গোষ্ঠী দেবতা'।

সুতরাং পশ্চিম-সীমান্ত বাংলায় দেখা গেছে সেখানে বৃক্ষকে বন্দনা করা হচ্ছে, জন্তু-জানোয়ারকে দেবতা করা হয়েছে, অনৈসর্গিক ভূত-প্রেত ডাইনীকে দেবতা বানানো হয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলের ইঁদপূজা, শাল গাছের খুঁটি পুঁতে ধ্বজা পূজা, শীতলার বাহন গাধাকে পূজা করা, বাথান-ডাইনি প্রভৃতি দেবতা উপরোক্ত মন্তব্যগুলিকেই সপ্রমাণ করে। বাংলাদেশের উৎপত্তির ইতিহাসে মহাবংশ পালি গ্রন্থে যে আখ্যানটি পাওয়া গেছে সেখানে সিংহ এবং মনুষ্যরমণীর মিলনের ফলে সীহবাহু বা সিংহ বাহুর জন্মলাভের কহিনীটি বলা হয়েছে তাও ঐ টোটেম বিশ্বাসেরই ফল। সুতরাং পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার কুইলাপালে, নূতন-ডি গ্রামে, হাতিবাড়ী, দহমুণ্ডা, ডোমজুড়ি, ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে যে উপকথাগুলি পাওয়া গেছে তার মধ্যেও ঐ আদিম টোটেম বিশ্বাস বিদ্যমান।

সুতরাং এ সিদ্ধান্ত সহজেই নেওয়া যেতে পারে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার উপকথাগুলির অধিকাংশই এই টোটেম বিশ্বাসেরই ফল।

লোক-কথার বিস্তার পৃথিবীব্যাপী। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথার একই অভিপ্রায়। কি বিশাল পটভূমিকায় সৃষ্টি হয়ে চলেছে এই লোক-কথাগুলি তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তাই নূতন-ডির মহেশ্বর টুডু যে উপকথাগুলি বলেছে, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের উড়িষ্যা, বাংলা ও বিহারের সীমান্তের দহমুণ্ডা, ডোমজুড়ি হাতিবাড়ী ইত্যাদি গ্রামগুলিতে যে উপকথাগুলি শোনা গেছে তার মধ্যেই পাওয়া যায় পৃথিবীব্যাপী উপকথার অভিপ্রায়। উৎসের ইতিহাসটি যত বিচিত্র এবং বিভিন্ন হোক না কেন তাদের অভিপ্রায়-গুলি এক এবং অভিন্ন হয়ে পৃথিবীর উপকথার অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাই সেখানে জামাই-এর বোকামীর গল্প শোনা গেছে, পাওয়া গেছে শিয়ালের চাতুর্য ও ব্যাঘ্রের নির্বুদ্ধিতার কথা, ভূত-প্রেত, ডাইনীর নানা অলৌকিক কাহিনী, বাক-চতুর বা বা বাক্ সমৃদ্ধ বৃক্ষের কাহিনী, অলৌকিক জন্মকথা, মৃতের পুর্ন-জীবনলাভ, পশু-মানবের কাহিনী। দহমুড়া গ্রাম থেকে প্রাপ্ত 'নেউলের গল্পটি' এবং নেউল-মানবের বুদ্ধিমত্তাই প্রমাণ করবে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার উপকথার রূপকথার মধ্যে আদিম টোটেম বিশ্বাস কি ভাবে ক্রিয়াশীল। কি ভাবে তা আদিম সমাজ-জীবন থেকে আজও গ্রাম সমাজ মানসে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

॥ এক : উপকথার উৎস ও অভিপ্রায় ॥

রূপকথা আর উপকথার জন্মভূমি এই বাংলাদেশ। যুগযুগান্তের সভ্যতা আর সংস্কৃতির সংমিশ্রণে রূপকথা এবং উপকথার এক বিরাট পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে এই বাংলাদেশে। উপকথার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলেছেন : 'A story having animals as its principal characters : one of the oldest forms, perhaps the oldest, of the folk-tale,

and found everywhere on the globe at all levels of culture.' (S. D. F. L. Pp. 61)। অর্থাৎ উপকথা হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম লোককথা যার প্রধান চরিত্রে থাকে প্রাকৃত জগতের কোন জীব পশু, পক্ষী ইত্যাদি। লোক-সাহিত্যের এই জায়গাটিতে পশু, পক্ষী সবচেয়ে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। সরস কৌতুকমিশ্রিত নানা কথা ও কাহিনী গড়ে উঠেছে বাংলা দেশের নানা জাতের পশুপক্ষীকে ঘিরে। লোক-জীবনের স্তরে স্তরে এই যে পশু পক্ষীদের নিগূঢ় সহাবস্থান এর উৎস সম্পর্কে নানাজন নানা মন্তব্য করেছেন।

আদিম সমাজে প্রকৃতির একটা মস্ত বড় স্থান ছিল। অবশ্য এই স্থানটি একান্ত আবরণহীন অবস্থাতেই ছিল। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তারা কোনো চিন্তাই করতে পারত না। তাই তাদের সমাজে পরিচয় হয়েছে কখনও পশুর নামে, কখনও পাখীর নামে, কখনও বা বৃক্ষলতাদির নামে।[১] এ হলো তাদের টোটেম বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করতো তাদের আদি পিতা ও আদি মাতার সন্তান কোন কোন ক্ষেত্রে পশুরূপে, কখনও বৃক্ষরূপে, বিরাজমান। এই বিশ্বাস তারা দুটিভাবে পালন করে। প্রথমতঃ টোটেম আহার নিষিদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ একই টোটেমের অন্তর্গত নর-নারীর বিবাহ অসিদ্ধ। সুতরাং আদিম সমাজের এই পশুপ্রীতি বৃক্ষলতাদির প্রতি আকর্ষণ থেকেই পরবর্তী লোক-সমাজে পশুপক্ষী বৃক্ষাদি একটা প্রধানতম স্থান অধিকার করেছে।

আদিম সমাজে পশুপক্ষী কখনও অভিভাবকরূপে, কখনও দেবতারূপে, কখনও ধাত্রীরূপে অধিকার পেয়ে এসেছে। লোকসমাজে এসে এর রূপ গেলো বদলে। এদের প্রধানতম

---

[১] 'Thus througout the folk-belief and religious of the world, animals figure as reincarnated ancestors creators or as aids to creator, scouts, messengers, and earth-divers.'

[Ibid, pp. 61

ভূমিকা হয়ে দাঁড়ালো সংগী বা বন্ধুরূপে। মানুষের যে সব জায়গায় দুর্বলতা ছিল পশুজগতের কাছ থেকে সবলতা আহরণ করে তা পূরণ করার চেষ্টা হলো। যা মানুষের নাই অথচ পশুপক্ষীর মধ্যে আছে সেগুলোকে আত্মসাৎ করার আকাঙ্ক্ষায় তারা উদ্যোগী হলো। পশুর অসীম শক্তি, পাখীর অসীমে বিচরণ করার ক্ষমতা এ সমস্ত মানুষের কাছে একান্ত কাম্য বলে মনে হলো এবং জীবনের প্রতিটি স্তরে এদের ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে পড়লো। পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গদেশের লোক-কথায় উপকথার স্থান প্রধানতম বললেও বিশেষ অন্যায় হয় না। কুইলাপাল, হাতিবাড়ী, নূতন-ডি অঞ্চলের উপকথা সংগ্রহ এর প্রমাণ। এর প্রধান কারণ হিসাবে বলা চলে আদিম সমাজের সঙ্গে উচ্চতর রক্ষণশীল সমাজের অধিকতর সংমিশ্রণ, অনার্য-সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য-সংস্কৃতির সংকর সাধন। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার এবং প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রতিকূলতার দরুণ আর্যরা এদেশে বহু পরে অনুপ্রবেশ করেছিল। ফলে এদেশের মাটিতে ভারতের আদিবাসী সমাজ বহুদিন ধরে—উত্তর ভারতে আর্যসভ্যতা বিস্তারের পরও, তাদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রেখেছিল। তারপর আর্যরা যখন এদেশে প্রবেশ করলে, আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণ ঘটলো তখন উচ্চতর জন-জীবনে আদিম জীবনের বহু প্রভাবের অবলুপ্তি ঘটলেও লোক-জীবনের স্তরে স্তরে আদিম জীবনের বহু বিশ্বাস, রীতিনীতি সযত্নে লালিত-পালিত হয়েছিল। বাংলা উপকথায় পশুপক্ষীর প্রীতির মধ্য দিয়ে এককথাই প্রমাণ হয়। আর্য-অনার্যের সংকর সাধন যে কতদূর বিস্তৃত হয়ে উপকথায় পশুর মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল তা সুপরিচিত শিয়াল পণ্ডিতের গল্পটি উদ্ধৃত এবং বিশ্লেষণ করলে এর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে :

কুমীর দেখলে, যে শিয়ালের সঙ্গে সে কিছুতেই পেরে উঠছে না। তখন সে ভাবলে তার সাতটি ছেলেকে শিয়ালের কাছে লেখাপড়া শেখালে তারা এমন চালাক-চতুর হবে যে তা দিয়ে করে খেতে

পারবে। শিয়াল তো খুব খুশী হয়ে রাজী হলো। সে রোজ একটা করে কুমীর বাচ্চার ঘাড় মটকায়, আর খায়। কুমীর দেখতে এলে, একটা বাচ্চাকে ঘুরিয়ে সাতবার দেখায়। যেদিন সবগুলো খাওয়া শেষ হয়ে গেলো, সেদিন শিয়ালনীকে নিয়ে শিয়াল অন্য জায়গায় পালিয়ে গেল। বোকা কুমীর যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, তখন শিয়ালকে জব্দ করবার ফন্দী আঁটলে। নদীর ধারে কুমীর গিয়ে দেখল শিয়াল আর শিয়ালনী সাঁতরে নদী পার হচ্ছে, কুমীর গিয়ে শিয়ালের পা কামড়ে ধরলে। শিয়ালনী আগেই ডাঙ্গায় উঠে গিয়েছিল, শিয়াল সামনের দুটো পা ডাঙ্গায় তুলেই বলতে লাগলো, আমার লাঠি গাছটা নিয়ে কে টানাটানি করছে। এই শুনে বোকা কুমীর তার পা ছেড়ে দিলে, শিয়াল পালিয়ে গেল। কুমীর এবার নদীর চড়ায় মড়ার মত পড়ে রইল। শিয়াল আর শিয়ালনী কচ্ছপ খাবে বলে নদীর ধারে এগিয়ে এলো। শিয়াল তো খুব চালাক। সে বললে, কুমীরটা বড্ড বেশী মরে গিয়েছে। এত মরা আমরা খাইনা। কুমীর তখন তার লেজের আগাটুকু নাড়িয়ে দিলে। একবার কাঁকড়া খেতে শিয়াল আর শিয়ালনী নদীতে এলো। কুমীর সেখানে লুকিয়ে ছিল, শিয়াল তা টের পেয়ে বললে, এত পরিস্কার জলে আমরা কাঁকড়া খাইনা, জল ঘোলা হলে তবে খাই। কুমীর তখন জল ঘোলা করলে। বারবার শিয়ালের কাছে ঠকে গিয়ে কুমীর মনের দুঃখে গর্তে এসে বসে রইল।

উপরোক্ত উপকথাটির অভিপ্রায় বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক Stith Thompson প্রবর্তিত Motif Index-এর অন্তর্গত প্রতারণা অভিপ্রায়টির কথাই মনে পড়ে। শিয়ালের প্রতারণা এই উপকথাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।[১] বৃহৎ কুমীরকে ক্ষুদ্র শৃগাল কি ভাবে

---

[১] 'Fox as a male animal character plays a fairly prominent role in trickster and other tales in Western North American Indian mythology. In many instances Fox is trickster's companion. (S. D F. L pp. 414)

বিশ্বাস-ঘাতকতার দ্বারা তার জীবনে বিপর্যয় এনেছিল এই উপকথাটিতে তারই সকৌতুক অথচ বেদনাদায়ক বর্ণনা আছে। পৃথিবীর লোককথায় শৃগাল ধূর্ততম জীব। এই ধূর্ত বলেই শিয়ালের চরিত্রের আর একটি প্রধান বিশিষ্টতার শিকার প্রবণতা। তাই অনেকে বলেন: 'The motif of the "fox school" is also known in European hunting lore.' অর্থাৎ শৃগালের কাহিনী ইউরোপে শিকার-কাহিনী রূপে প্রচলিত। আবার কখনও কখনও শিয়াল পণ্ডিতরূপে বিধৃত। শৃগাল সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলেছেন: 'In as much as foxes can become invisible and hear everything that is said and read everything that is written' [S. D. F. L. pp. 413] অর্থাৎ প্রায়শই শিয়াল অদৃশ্য থেকেও শুনতে পায় এবং লিখিত জিনিষও পড়তে পারে। বর্তমান গল্পটিতে শিয়াল চরিত্রের দ্বৈত ভূমিকাই প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে শিয়াল পণ্ডিত, অন্যদিকে সে শিকারী এবং বিশ্বাস-ঘাতক। জাপানী লোক-কথায় শিয়াল সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'All foxes are believed to be malicious, except the Inari fox, the messenger of The Harvest God.' [Ibid pp. 414] অর্থাৎ Inari fox বা শস্য-দেবতার দূত ছাড়া অন্যান্য সকল শিয়ালই ঈর্ষাপরায়ণ, তাই একই চরিত্রে এই দ্বৈত অথচ বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। Sten Know-র মতে বাংলাদেশে উপকথার শৃগাল চরিত্রে এই দুটি গুণ দুদিক থেকে এসেছে। একটি 'Indo-European' গোষ্ঠীর দান। অপরটি 'Proto-Australoid' বা নিষাদগোষ্ঠীর দান। এর ফলে বাংলা উপকথায় শিয়াল চরিত্রে মিশ্র-অভিপ্রায় (mixed-motif) লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশের লোক-কথায় কাক ধূর্ত এবং লোভী। অভিধানে তাই বলা হয়েছে, 'Crow is the trickster and references to crow as a character occur in various South Western,

plains Indians, and other tales.' [Ibid. pp. 266]। অর্থাৎ কাক ধূর্ত এবং প্রবঞ্চক হিসাবে পৃথিবীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের, ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য গল্পে চিত্রিত। কিন্তু এই কাকই অনেক সময় ক্ষুদ্রতর জীব কর্তৃক পরাজিত হয়—কাক তার প্রতারণার উদ্দেশ্য সার্থক করতে পারে না। বাংলা উপকথায় ক্ষুদ্রতর জীবের কাছে বৃহত্তর জীবের পরাজয় (weaker defeats stronger) একটি সুপরিচিত অভিপ্রায় (motif)। ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতির গবেষণা পরিষদের বেলপাহাড়ী সংগ্রহ শিবিরে একটি গল্পে এর সার্থক উদাহরণ মেলে ঃ

চিংড়ির বুদ্ধি॥ একটা চিংড়ি মাছ পদ্ম পাতায় রোজ তার চুল শুকায়। একদিন একটা কাক এসে বলল, আমি তোকে খাব। চিংড়ি মাছটা তখন বলল, এস, আগে পুঁটি মাছের কাছে বিচার করতে হবে। তারা তখন পুঁটি মাছের কাছে এলো। পুঁটি মাছ তাদের একটা সোনার আসনে আর একটা রূপার আসনে বসতে দিল। সোনার সিংহাসনে চিংড়ি মাছটা বসল, আর রূপার সিংহাসনে কাকটা বসলো। পুঁটি মাছ তখন ফৎ ফৎ করে চলে গেল চ্যাং মাছের ঘরে। চ্যাং মাছের ঘরে চিংড়ি মাছ আর কাকের ডাক পড়লো। চ্যাং মাছ তিনটি আসনে তিন জনকে বসতে দিল। চ্যাং মাছ বিচার করে বললে, এবার কাঁকড়াকে ডাকতে হবে। তখন কাঁকড়াকে ডাকা হলো বিচার করতে। কাঁকড়া তখন বেরিয়ে এলো বাড়ী থেকে। এসে সামনে দেখতে পেলো কাককে। তখন কাঁকড়া কাকটার মাথাটা মটকে কাকটাকে মেরে ফেল্‌ল। চিংড়ি মাছটা তখন জলের তলায় পালিয়ে গেল।

ক্ষুদ্র এবং অসহায়ও যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে উপরোক্ত চিংড়ির গল্পটি তার প্রমাণ। এই কাক যেমন চিংড়ির কাছে পরাজিত হয়েছে ঠিক তেমনি অন্যত্র চড়ুইয়ের কাছেও তার পরাজয় দেখা গেছে। কাক ধূর্ত হলেও তার পরাজয় একদিক দিয়ে

কৌতুক ও বিস্ময়, অন্যদিকে প্রতিপক্ষের পরাজয়ের একটা তৃপ্তির স্বাদ শ্রোতা এবং পাঠক খুঁজে পায়।

সবলের নির্বুদ্ধিতা বাংলা উপকথার একটি সুপরিচিত অভিপ্রায়। স্বভাব দুর্বল বাঙালী জাতি সবলকে বাস্তব জগতে পরাস্ত করতে না পেরে উপকথায় সবল জীবকে অসহায় দুর্বলরূপে চিত্রিত করেছে। ব্যাঘ্র সাধারণতঃ হিংস্র, কিন্তু বাংলা উপকথায় ব্যাঘ্র কেবলমাত্র দুর্বল নয় নির্বোধ এবং ভীরুও বটে। এর কারণ হিসাবে বলা চলে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বাংলার লোকজন যখন ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র ও সবল জীবের কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে হয়ত তারই প্রতিহিংসাকল্পে অসহায় বুদ্ধিজীবী মানুষ উপকথায় ব্যাঘ্রকে হাস্যাস্পদ নির্বোধ ভীরুরূপে চিহ্নিত করেছে। নিরীহ দুর্বল ছাগল ছানা কিভাবে বুদ্ধিবলে ধূর্ত শৃগাল এবং হিংস্র ব্যাঘ্রকে পরাস্ত করে আত্মরক্ষা করেছে সে সম্পর্কে একটি সুন্দর উপকথা আছে। এই উপকথাটি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্যে' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (পৃ. ৮৮০) বর্ণনা করেছেন। তার প্রধানতম অভিপ্রায়টি হচ্ছে, অসহায়ের বুদ্ধি (intelligence of helpless) এবং সবলের নির্বুদ্ধিতা বা বোকামি (foolishness of stronger) ছাগলছানা ক্ষুদ্র ও অসহায় জীব। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'বাংলার লোক-কথার সাধারণ আদর্শ অনুযায়ী সে সর্বাপেক্ষা চতুর।' সুতরাং কেবলমাত্র শারীরিক শক্তিতে দুর্বল হয়েও কিভাবে সে বুদ্ধিবলে ধূর্ত শৃগাল এবং হিংস্র বাঘের নিকট থেকে আত্মরক্ষা করেছিল তার পরিচয় এখানে আছে। ডঃ ভট্টাচার্য আরও বলেছেন, 'ঈশপের উপকথায় মেষশাবক ও নেকড়ে বাঘের যে কাহিনী পাওয়া যায় তাহাতে মেষশাবক দুর্বল ও অসহায় হইলেও ছাগলছানার মত বুদ্ধির দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। ঈশপের কাহিনীটি বাস্তব, বাংলাদেশের কাহিনীটি রূপকাশ্রিত।' [ঐ. পৃ. ৪৮১]।

উপরোক্ত কাহিনীটি পরিপূর্ণ রূপকাশ্রয়ী নয়, কারণ বুদ্ধিবলে

অনেক সময় সবলকে যে পরাজিত করা যায় এটি একটি অত্যন্ত বাস্তব সত্য। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালী দৈহিক বলে অপ্রতুল হলেও বুদ্ধিবলে সে বলীয়ান। তৃতীয়তঃ পশুজগতেও দৈহিক বলই একমাত্র বল নয়। হাতীর বিরাট দেহ কিন্তু বুদ্ধি কম থাকার জন্য অনেক সময় সে ক্ষুদ্র জীবের কাছে পরাজিত হয়। সুতরাং বাংলাদেশের লোকচরিত্র এবং পশুচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি যদি অবাস্তব না হয় তাহলে উপরোক্ত উপকথাটি পরিপূর্ণ রূপকাশ্রিত নয়।

আদিম যুগে পশু এবং মানুষের পার্থক্য ছিল অল্প। আদিম মানুষের ধারণা ছিল যে তারা মানুষের মত কথা বলে—মানুষের মতো তাদেরও দুঃখবোধ আছে। পশুজননী মানুষের মতই তার নিজ সন্তানকে ভালবাসে এবং বিপদ থেকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 'To early man the animals were different only in shape, not in nature. He witnessed their acuteness and wisdom, in many cases also their superior strength and cunning....He admired, loved, feared.' [S. D. F. L. pp. 61]। বাংলা দেশের রূপকথায় আদিম মানুষের এই বিশ্বাস প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়। টুনটুনির একটি গল্পে কিভাবে টুনটুনি তার সন্তানদের দুষ্ট বিড়ালের হাত থেকে রক্ষা করেছিল তার চিত্র আঁকা আছে। গল্পটিতে বাংলার উপকথার একটি প্রধানতম অভিপ্রায়—ক্ষুদ্র এবং অসহায়ের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার উল্লেখ করা হয়েছে। তাই টুনটুনির মত ক্ষুদ্র অসহায় জীবও তার স্নেহপ্রবল মাতৃত্বের জন্য লোকসমাজে পরিপূর্ণ সহানুভূতি লাভ করেছে। দৈহিক আকৃতিতে ক্ষুদ্র যে সে বুদ্ধিমত্তার দ্বারাও জয়যুক্ত হতে পারে টুনটুনির গল্পটিতে তারই পরিচয় আছে। গল্পটি এই ঃ গৃহস্থদের পিছনে যে বেগুন গাছ আছে, তার পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে টুনটুনি তার বাসা বেঁধেছে। বাসার ভিতর রয়েছে তার তিনটি ছোট ছোট ছানা। ছানাগুলি এত ছোট যে তারা ভাল করে চোখ মেলে তাকাতে পারে না। কেবল চিঁ চি

করে। গৃহস্থদের বিড়ালটি মহাদুষ্টু। তার ভারী ইচ্ছে ছানাগুলি খায়। একদিন বেগুন গাছের তলায় গিয়ে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি, টুনটুনি মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, 'প্রণাম হই মহারাণী'। বিড়াল ভারী খুশী হয়ে চলে গেল। এমন করে বিড়াল রোজ আসে আর তার প্রণাম পেয়ে ভারী খুশী হয়ে চলে যায়।

তারপর কিছুদিন কেটে গেল। টুনটুনির ছানাগুলি বড় হয়েছে, তাদের ডানাগুলি ভারী সুন্দর হয়েছে। তারা আর আগের মত চোখ বুজে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি ছানাদের বললে, 'বাছা, তোরা উড়তে পারবি'। ছানারা বললে, 'হাঁ মা'। সামনে একটা মস্ত তাল গাছ ছিল বললে, 'দেখতো ঐ তাল গাছটার ডালে গিয়ে বসতে পারিস কিনা'। ছানারা তক্ষুণি উড়ে তাল গাছটার ডালে গিয়ে বসলে। খানিক বাদে বিড়াল এসে বললে, 'কি করছিস লা টুনটুনি'। টুনটুনি পা উঠিয়ে লাথি দেখিয়ে বললে 'দূর হ লক্ষ্মীছাড়া বিড়ালনী'; বলেই ফুড়ুক করে উড়ে গেল। দুষ্টু বিড়াল দাঁত মুখ খিঁচিয়ে লাফিয়ে বেগুন গাছের উপর উঠতে গিয়ে, বেগুন কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরলো।'

কোন আদিম উৎস থেকে জন্মলাভ করে, নানা আচার, নানা বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে বক্ষে ধারণ করে বাংলার উপকথা তার সূক্ষ্ম ধারাটি আজও নানা অভিপ্রায়কে বিধৃত করে বাংলাদেশের লোক-সমাজের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে—তা আজ কে বল্‌তে পারে।

॥ দুইঃ নূতন-ডির উপকথা ॥

দু'পাশে শালবন—মাঝখান দিয়ে তার চওড়া মেঠো পথ লাল কাঁকরের। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। রাস্তার দুপাশ দিয়ে অগভীর মোটা দাগ গরুর গাড়ীর চাকার। বৃষ্টির সময় এই দাগগুলোর দুপাশে জমে অজস্র কাদা। রাস্তার মাঝখানে অজস্র

লালচে সাদা নুড়ি ইতস্তত এপাশে ওপাশে ছড়ান। রাস্তার দুপাশে জঙ্গল, কোথাও তা ঝোপঝাড়ে গভীর—কোথাও তা অগভীর। একটু এগিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে জঙ্গলের কিছু কিছু অংশে কাল পোড়া পোড়া দাগ। কোন জায়গায় ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন। মট্ মট্ ফট্ ফট্ আওয়াজ উঠছে—পুড়ছে অজস্র বনলতা, ছোট ছোট শালের কোঁড়। এই পথ ধরে আরও এগিয়ে গেলে পথের দু'ধারে পড়বে সবুজ গাছের সারি—শাল, পিয়াল, হরিতকী, বয়ড়া প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র বৃক্ষরাজির শ্যামল সমারোহ। খানিকটা গেলেই দেখা যাবে সামনে দূরে অনুচ্চ দু'একটা ঢিবি, যাকে পাহাড়ও বলা চলে, মনে হবে পৃথিবী সমান্তরাল থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সরল পৃথিবীর পিঠের উপরে কে যেন একটা কুঁজ বসিয়ে দিয়েছে। তার আগেই দেখা যাবে রাস্তাটা হঠাৎ সরু হয়ে ত্রিশূলের মত হয়ে গেছে। একটা সোজা চলে গেছে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে অনেক দূরে। আর দুটো ডানদিকে ও বাঁদিকে সোজা বনের গভীরে চলে গেছে। বাঁদিকের রাস্তা ধরে বড় রাস্তা ছাড়লে মনে হবে এই আদিম অরণ্য বুঝি যুগযুগান্তের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁচা শালপাতার পোড়া পোড়া, লাল কাঁকুরে মাটির সোঁদা সোঁদা, আর মহুয়া ফুলের মিষ্টি-মাতাল এই তিন গন্ধ মিলে এমন এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে মনে হবে এ বুঝি কোন রূপকথার অরণ্য। এখানে বিরাট অশ্বত্থ গাছ আর ডালিমগাছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, উপকথার সেই বোকা বাঘটা, আর ধূর্ত শিয়ালটার সন্ধান মিলবে। আর একটু এগিয়ে গেলেই বুঝি দেখা পাওয়া যাবে বিতাড়িত দুয়োরাণীর ছেলে মনের দুঃখে চলেছে কোন দূর দেশে অজানা ভাগ্যের সন্ধানে। মোড় ঘুরলেই ঐ বড় শিমূল গাছটার নীচে হয়তো কুঠির বেঁধেছে রাজার সেই ছোট মেয়ে যে ঘুঁটে কুড়োয় আর অপেক্ষা করে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের সেই রাজপুত্রের ; যে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, রাণী করে শুইয়ে রাখবে সোনার পালঙ্কে। ঐ যে বড়

ছাতিমগাছটা তার বিশাল মাথাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—অজস্র লতান বনফুলে ভরে আছে যার বিশাল দেহটা, তার বিরাট কোটরে বুঝি বাস করে শুক আর শারী। এখানেই বুঝি সাদা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসছে অচিন দেশের সেই রাজপুত্তুর যে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করবে। সে হয়ত এই গাছের তলায় বাঁধবে তার পক্ষীরাজ ঘোড়া। তারপর এই গাছের তলায় নরম ঘাসের উপর শুয়ে করবে বিশ্রাম। তখন শুক আর শারী এই বৃক্ষের কোটরে বসে রাজপুত্রকে দেবে সেই রাক্ষসীর মৃত্যুবীজের সন্ধান, সেই ভোমরা-ভোমরীর কথা; যাকে বুকে রেখে একফোঁটা রক্ত মাটিতে না ফেলে মারতে পারলে রাক্ষসী মরবে, উদ্ধার পাবে রাজকন্যা। গভীর রাত্রে হয়তো দেখা দেবে মাণিকধারী অজগর সাপ যাকে মেরে রাজপুত্র উদ্ধার করবে সাত রাজার ধন এক মানিক। এসব কথা ভাবতে ভাবতে আর একটু এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে বিচ্ছিন্ন কতকগুলো কুটীর, জঙ্গলের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত হঠাৎ জেগে উঠেছে। হ্যাঁ, এটিই কুইলাপালের নূতন-ডি গ্রাম। দু'চারটে কুঁড়ে বাদ দিয়ে নিকানো প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে একটু এগিয়ে গেলেই হাসিমুখে ভাষায় কুর্মী। কিন্তু স্বাগত জানাবে এই গ্রামেরই মহেশ্বর টুডু। জাতে ওঁরাও। পরিচিত বাংলা ভাষাতেই আপনাকে গল্প শোনাবে।

পশু শিকার নূতন-ডি গ্রামের মানুষের একটি প্রধান উপজীবিকা। চারিদিকে শাল পিয়ালের গভীর জঙ্গলে থাকে খরগোশ, ছোট হরিণ, বিভিন্ন বুনো পাখী, ময়ূর। মাঝে মাঝে ছোট চিতা বা ছোট জাতের বাঘও দেখা যায়। এখন হয়তো তা লুপ্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু বহু আগে নূতন-ডি গ্রামের আদিবাসীদের পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন সময়ে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে নরখাদক ব্যাঘ্রের আক্রমণে। সামান্য তীরধনুক আর টাঙ্গি অবলম্বন করে ভয়ানক প্রকৃতির বাঘের সঙ্গে বা অন্য কোন হিংস্র জন্তুর সঙ্গে সংগ্রাম করে

পেরে ওঠেনি তারা। তাই এই ভয়ানক হিংস্র বাঘকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে নানা উপকথা। যেখানে বাঘকে অত্যন্ত বোকারূপে এবং অসহায়রূপে উপস্থিত করা হয়েছে। নূতন-ডির যুবক যখন গভীর রাত্রে গ্রামের শস্যক্ষেত্র প্রহরায় নিযুক্ত থেকেছে—একদিকে ঘন অন্ধকার আর একদিকে দূরান্তের বনানী থেকে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার যখন তাদের ভীত করেছে, তখন তারা সে ভয় দূর করার জন্য বাঘ যে কত বোকা তার প্রমাণ উপস্থিত করতে গল্প জুড়েছে: এক কাঠুরিয়া একদিন বনে গেছে কাঠ কাটতে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ভাল কাঠ না পেয়ে যখন বিরস মনে সে ঘরে ফিরছে এমন সময় হালুম শব্দ করে এক বিরাট বাঘ এসে তার সামনে উপস্থিত। বাঘ কাঠুরিয়াকে বলল, এবার আমি তোকে খাব। কাঠুরিয়া দেখল সমূহ বিপদ—কি করা যায়? অনেক ভেবে চিন্তে বাঘকে বললো, তুমি তো আমায় খাবেই তবে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাকে যদি পিঠে করে বনের পারে পৌঁছে দাও তাহলে খুব ভাল হয়। তার শুকনো মুখ দেখে বাঘের দয়া হলো। বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তোকে অসহায় পেয়ে এমনিতে খাব না; তবে আমাকে পিঠে করে যদি বনের শেষে পৌঁছে দিতে পারিস্ তাহলে তোকে ছেড়ে দেব। কাঠুরিয়া দেখলো মৃত্যু যখন উপস্থিত তখন চেষ্টা করে দেখাই যাক না। সঙ্গে থলে ছিল। সেই থলের মধ্যে বাঘকে পূরে বনের ধারে নিয়ে এলো বহু কষ্টে। থলি খুলে দিতে বাঘ বললো, 'এবার তোকে আমি খাব।' কাঠুরিয়া দেখলো মহা বিপদ। বাঘ তার সর্ত ভঙ্গ করেছে। বাঘ কোন কথাই মানতে চায় না। বলে, 'এবার তোকে আমি খাব-ই।' বহুক্ষণ পরে কাঠুরিয়া দেখলো দূর দিয়ে একটা শিয়াল যাচ্ছে। বাঘকে বললো, 'এই শিয়ালই ঠিক করে দেবে তুমি আমাকে খাবে কি না?' শিয়াল এসে সব শুনলো। শিয়াল কিন্তু খুব ধূর্ত। মনে মনে ভাবলো, যদি বাঘের পক্ষে যাই তাহলে বাঘ কাঠুরিয়াকে আগে খেয়ে পরে আমাকে খাবে। অতএব কাঠুরিয়ার পক্ষে

যাওয়াই ভালো। সে বললো কাঠুরিয়াকে, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে তুমি আমার মামাকে কাঁধে করে নিয়ে এসেছো। আমার মামা বনের রাজা। সে এই ছোট থলেটার মধ্যে ঢুকতে পারে'? তখন বাঘ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। শিয়াল বললো, 'মামা একবার দেখাও দেখি তুমি কিভাবে এর মধ্যে ঢুকেছিলে'। বাঘ তখন তাড়াতাড়ি সেই থলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। যেইমাত্র ঢোকা অমনি কাঠুরিয়া তাড়াতাড়ি মুখটা বেঁধে ফেললো আর একটা কাঠ নিয়ে দমাদ্দম পিট্তে লাগলো। বাঘ সেই পিটুনি খেয়ে মরে গেল। কাঠুরিয়া বাঘের চামড়াটা নিয়ে মহানন্দে ফিরে এল আর শিয়াল মনের সুখে বাঘের মাংস খেতে লাগল।[১]

এভাবে বাঘকে হাস্যাস্পদ করে শস্যক্ষেত্র প্রহরারত যুবকদ্বয় বাঘের ভয় থেকে কিছুক্ষণের জন্য হয়তো নিস্তার পায়। বাঘের দুর্দশা দেখে তাদের মনে পুলক জাগে। সাধারণত বাংলা উপকথায় বাঘ বোকা কিন্তু শিয়াল ধূর্ত। নূতন-ডি গ্রামে প্রাপ্ত এই উপকথাটিতেও বাঘ বোকা, শিয়াল চালাক এই বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়েছে। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গা থেকে প্রাপ্ত বোকা বাঘের গল্প কেমন যেন বৈচিত্র্যহীন। প্রসঙ্গত বাংলাদেশে প্রচলিত আর একটি গল্পের সঙ্গে এটির তুলনা করা যেতে পারে। গল্পটি হচ্ছে এই: এক দুষ্টু বাঘ খাঁচায় বদ্ধ ছিল। সেই খাঁচার সামনে দিয়ে যে-ই যেত, তাকে সে নমস্কার করে বলত, একটিবার খাঁচা খুলে দাও। বাঘের এমন মধুর ব্যবহার দেখে অনেকে খাঁচা খুলে দিতে চাইত; কিন্তু সাহসে কুলোতো না। একদিন এক ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীতে ফলারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলেছিল। ব্রাহ্মণ বড় ভাল মানুষ আর সরল। বাঘ তাঁকে দেখে বললে, ঠাকুর মশাই, খাঁচাটা খুলে দিন না। ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হয়ে খাঁচা খুলে দিতেই বাঘ বললে, ঠাকুর মশাই, আমি তোমাকে খাব। ঠাকুর মশাই

---

১ ১৯৬৭ সালে নূতন-ডি গ্রাম থেকে সংগৃহীত।

বললেন, 'এমন কথা তো কোনদিন শুনিনি, যে উপকার করে তাকে বুঝি খায়'। বাঘ বললে, 'জগতের নিয়মই হল, যে যার ভাল করে, তার অনিষ্ট সে আগে করে। তখন ব্রাহ্মণ বললে, বেশ তিনজন সাক্ষী যদি তোমার কথায় সায় দেয়, তবে তুমি আমাকে খেতে পার'। বাঘ বললে, 'বেশ, চলুন আপনার সাক্ষীর কাছে'। ঠাকুর মশাই ক্ষেতের আল দেখিয়ে বললেন এই আল আমার সাক্ষী। আলকে ঠাকুর মশাই যেই জিজ্ঞেস করলেন, বলতো উপকারীর উপকার করা উচিত কি না? আল বললে, আমি দুই চাষার জমি পাহারা দেই; কিন্তু তারাই আমাকে কাটে। অতএব উপকারীর উপকার করা উচিত নয়। ঠাকুর মশাই তখন এক বটগাছ দেখিয়ে বললে, এই বটগাছ আমার সাক্ষী। বটগাছও ঐ একই কথা বললে। বটগাছের ছায়ায় কতলোক আশ্রয় নেয়; কিন্তু লোকে তার ডাল ভাঙ্গে, পাতা ছেঁড়ে, গুঁড়ি থেকে রস আর আঠা বার করে নেয়। তাই তার মতে উপকারীর উপকার করা উচিত নয়। এমন সময় এক শিয়াল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শিয়ালকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হল। শিয়াল খুব চালাক। কিন্তু বোকার ভান করে বললে, ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারছি না। বাঘ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল—না ঠাকুর মশাই খাঁচায় বদ্ধ ছিল, তা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। তখন বাঘ, বামুন ঠাকুর আর শিয়াল সেই খাঁচার কাছে গেল। বাঘ রেগে গিয়ে শিয়ালকে দেখাতে গেল, কি ভাবে সে খাঁচায় ছিল। ধূর্ত শিয়াল তাড়াতাড়ি খাঁচায় হুড়কো টেনে দিলে। আর বামুন ঠাকুরকে বললে, দুষ্ট লোককে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়। আর বললে, তাড়াতাড়ি রাজবাড়ীতে যান, এখনো ফলারের ব্যবস্থা আছে। এই বলে শিয়াল চলে গেল।[২]

উপরোক্ত গল্প দু'টিতে বহু সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। পূর্বাহ্নেই বলা হয়েছে যে আদিবাসী সমাজ থেকে প্রাপ্ত গল্পটির

---

[২] বাংলার লোক-সাহিত্য' (৪র্থ খণ্ড): ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৮৭।

বিষয়বস্তুর মূলকথা বাঘের নির্বুদ্ধিতা যদিও গল্প দু'টিতে বাঘ নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য শিয়ালের কারসাজিতে সাজা পেয়েছে তথাপি দু'টির মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। নূতন-ডি গ্রাম থেকে সংগৃহীত গল্পটির মূলচরিত্র মানুষ হিসাবে কাঠুরিয়াকে উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় গল্পটিতে কাঠুরিয়ার বদলে ব্রাহ্মণ মূল চরিত্র হিসাবে উপস্থিত। সুতরাং এদিক দিয়ে প্রথম গল্পটি আদিম সমাজের, দ্বিতীয় গল্পটি গ্রাম্য সমাজ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ জীবনের সৃষ্টি। এর আরও প্রমাণ আছে গল্পটির অভ্যন্তরে। সংগৃহীত গল্পটিতে কাঠুরিয়া আর বাঘ সোজাসুজি মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়েছে শিয়ালের কাছে। কারণ, এই গল্পটি আদিম সমাজ-সৃষ্ট। শিয়াল চরিত্রের যে দু'টি রূপ প্রকাশ পেয়েছে তার একটী হলো ধূর্ততা ও চাতুরি প্রবণতা, দ্বিতীয়টি হলো পাণ্ডিত্য যা মীমাংসা-মধ্যস্থতার নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে। শিয়াল-চরিত্রের যে দুটি গুণ প্রকাশিত তার প্রথমটি হচ্ছে Proto-Australoid বা নিষাদ জাতির দান; দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) জাতির দান। দ্বিতীয় গল্পটিতে বাঘ এবং ব্রাহ্মণ মীমাংসার জন্যে প্রথমে গেছে ক্ষেতের আলের কাছে, তারপর গেছে বটগাছের কাছে এবং তারপর শিয়ালের সম্মুখীন হয়েছে। সুতরাং আদিম জন-জীবন থেকে প্রথম গল্পটি উদ্ভূত হয়ে উচ্চাঙ্গের গ্রাম্য জীবনে এসে নানা ঘটনা ও বৈচিত্র্যময় বিষয়ের দ্বারা বিবিধ রসে পরিপূর্ণ হয়েছে। সুতরাং এটা অনায়াসেই বলা চলে যে এ ধরণের উপকথাগুলির জন্ম প্রথমে হয়তো কোন আদিম গোষ্ঠী (Primitive Tribe) বা উপগোষ্ঠীতে। পরে তা গ্রাম্য-সমাজ (Folk-Society)-ভুক্ত হয়ে বিবর্তিত এবং পরিবর্তিত হয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নূতন-ডি গ্রামে প্রাপ্ত আর একটি উপকথার উদাহরণ দিলে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে।

নূতন-ডি গ্রামের অলস মধ্যাহ্নে কোন আশীতিপর বৃদ্ধা দাওয়ায় আঁচল পেতে শুয়েছে। তাকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ

আদিবাসী শিশুর দল। ঘরের বাইরের উঠানে দুএকটা নেড়ী কুকুর বসে ঝিমুচ্ছে। একরাশ শাবক নিয়ে কুক্কুটজননী ককর্-কঁক্, ককর্-কঁক্ আওয়াজ তুলছে। একটা ছাগল তার বাচ্চাকে নিয়ে একপাশে শুয়ে আছে। ছেলের দল বুড়ীকে বলছে, গল্প বলো। বুড়ী হয়তো শুরু করেছে, 'এক রাজার পো, মন্ত্রীর পো, কোটালের পো আর নাপিতের পো'—শিশুর দল তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, 'রাজার গল্প নয়, বাঘের গল্প বল।' বৃদ্ধা বলতে শুরু করে: বনের ধারে একটা বুড়ো গরু চরছিল। মাঠের দুপাশে কাদা। একটা বাঘ ভাবলো গোরুটাকে ধরে খাব। যেই ভাবা অমনি এক লাফ। বাঘ কাদায় গেল আটকে। এক কাঠুরিয়া বনে যাচ্ছিল কাঠ কাটতে। বাঘ বললো, ওহে কাঠুরিয়া আমাকে একটু তুলে দাও। কাঠুরিয়া ভাল মানুষ। বাঘকে কাদা থেকে তুলে দিয়ে তার গা-টা পরিষ্কার করে দিল। তখন বাঘ বললো, আমি বারো বছর বাদে খাবার পেয়েছি, তোকে আমি খাব। একটা শিয়াল যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। তাকে ডাকা হলো মীমাংসার জন্যে। লোকটাকে শিয়াল বললো আমি যদি মুরগী নিয়ে পালাই তাহলে বাঘ আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু কাঠুরের পক্ষে গেলে এক আধটা মুরগী মিললেও মিললে পারে। সে তখন বাঘকে সেই কাদার কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লো, দেখাও তো ভাগনে তুমি কেমন করে কাদায় আটকে গেছ্লে। বাঘ বললে, আমি যদি আবার কাদায় আটকে যাই তাহলে তুমি আমায় তুলবে তো। শিয়াল বললো, হাঁ। তখন বোকা বাঘ কাদায় লাফ দিলো আর সঙ্গে সঙ্গে কাদায় গেল পা আটকে। তখন শিয়াল আর কাঠুরে মিলে বাঘটাকে চিরে দুভাগ করে ফেললো। শিয়াল একভাগ পেলো আর কাঠুরে একভাগ নিয়ে বাড়ীতে গেলো।[৩]

এই উপকথাটিও অন্যান্য আদিম সমাজের উপকথার মতই সরল

[৩] ১৯৬৭ সালে নূতন-ডি গ্রাম থেকে সংগৃহীত।

এবং সাধারণ। এর সঙ্গে আর একটি উপকথার তুলনা করলে এর যাথার্থ্যটি আরও স্পষ্ট হবে। গল্পটি হচ্ছে এই: এক শিয়াল আর শিয়ালনী ছিল। তাদের তিনটি ছানা ছিল; কিন্তু থাকবার জায়গা ছিল না। তারা ভাবলে এখন ছানাগুলোকে কোথায় রাখি, একটা গর্ত না হলে তো এরা বৃষ্টিতে ভিজে মারা যাবে। যাই হোক, অনেক খোঁজের পর একটা গর্ত বার করলে, কিন্তু সেটা বাঘের গর্ত। শিয়ালনী বললে, যদি বাঘ আসে তবে তুমি কি করবে? শিয়াল বললে, তুমি ছানাগুলোকে চিম্‌টি কাটবে, ওরা কাঁদবে, আমি জিজ্ঞেস করবো, ওরা কাঁদে কেন, তুমি বলবে, ওরা বাঘ খেতে চায়।

তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গল, একদিন সত্যি সত্যি বাঘ এল। দূর থেকে বাঘকে দেখে শিয়ালনী ছানাদের চিম্‌টি কাটতে তারা কাঁদতে লাগল। শিয়াল মোটা আর বিশ্রী গলার সুর করে বললে, খোকারা কাঁদছে কেন? শিয়ালনী বললে, ওরা বাঘ খেতে চায়। বাঘ কথাটা শুনে থমকে দাঁড়াল, তারপর ভাবলে তার গর্তের ভিতর রাক্ষস ঢুকেছে। এমন সময় শিয়াল বললে, বাঘ কোথায় পাব। শিয়ালনী বললে, তা জানিনা, যেমন করে পারো ধরে আনো। তখন শিয়াল বললে, আচ্ছা রোসো! ঐ যে একটা বাঘ আসছে। আমার ঝপাংটা দাও এখনি ওকে ভতাং করছি। ঝপাং বা ভতাং বলে কিছু নেই—সবই শিয়ালের ফাঁকি। ঝপাং বা ভতাং শুনে বাঘ ভয় পেয়ে ছুটে পালালো। বাঘকে ছুট্‌তে দেখে এক বানর তাকে জিগ্যেস করল কি হয়েছে। বাঘ সব ব্যাপারটা বললে। বানর বললে, তুমি বোকা তাই মিছামিছি ভয় পেয়েছো। চল দেখি ব্যাপারটা সত্যিই কি? বানর বাঘের পিঠে চড়ে সেই গর্তের কাছে যেতেই শিয়াল বললে, তোদের বানর মামা এক বাঘ ধরে এনেছে, শিগ্‌গীর ঝপাংটা ভতাং করো। বানরের এতক্ষণ খুব সাহস ছিল। সে এইবার ঝপাং-ভতাং-এর কথা শুনে গাছে উঠে পড়ল, আর বাঘ ছুট্ দিল। ওদিকে শিয়াল-

শিয়ালনী আর তাদের ছানারা পরম সুখে সেই গর্তে বাস করতে লাগল।'[৪]

উপররোক্ত গল্প দু'টির সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক লক্ষণীয়। এখানেও গল্পের মূল বিষয়বস্তু বাঘের নির্বুদ্ধিতা আর শিয়ালের বুদ্ধিমত্তা। এই গল্প দু'টির মধ্যে প্রথম গল্পটিতে আদিম সমাজের অকৃত্রিমতার স্পর্শ আছে। নূতন-ডির আদিবাসী মানুষ সহজ, সরল কৃত্রিমতা বর্জিত। তাই তাদের রচিত লোককথাগুলিও অকৃত্রিমতার স্পর্শে উজ্জ্বল। কিন্তু দ্বিতীয় গল্পটিতে নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ।

নূতন-ডির লোককথাগুলিতে স্পর্শ আছে আদিমতার, গন্ধ আছে ভিজে কাঁকুরে মাটির, আর রং আছে শালবনের শ্যামলতার। অলস দ্বিপ্রহরেই হোক, আর চন্দ্রালোকিত জোৎস্নার রাত্রেই হোক শালবনের প্রান্তরে, শাল পিয়ালের বনে যখন হাওয়া দেয় তখন সেই হাওয়ার ফিসফিসানির শব্দে মনে হয় সেই আদিম অরণ্যজগৎ পরস্পরের সঙ্গে যেন ফিস্ ফিস্ করে গল্প বলছে। নিরালা রাত্রে গ্রামের প্রান্তে দূর শস্যক্ষেত্র থেকে যখন ভাঙ্গা ক্যানেস্তারার আওয়াজ আসে, যখন মহুয়া ফুলের গন্ধে সমস্ত নূতন-ডি গ্রাম ভরপূর হয়ে ওঠে তখন মনে হয় সমস্ত নূতন-ডি গ্রামের মানুষগুলো যেন অনেক রূপকথা উপকথার মায়াজাল রচনা করে চলেছে।

।। তিন: ডোমজুড়ি-দহমুণ্ডা-হাতিবাড়ীর উপকথা ।।

শাল আর শালের বন। প্রান্তর জুড়ে কেবল ছোট বড় মাঝারি অগণিত শালের শ্রেণী। মাঝে মাঝে মহুয়া, বয়ড়া, অর্জুন-পিয়াল, হরীতকী ইত্যাদির গাছ যে নেই তা নয়, তথাপি এ যেন শালগাছের এক মহারাজ্য। মহামান্য শালপ্রাংশু দোর্দণ্ড প্রতাপে

৪ 'বাংলার লোক-সাহিত্য' (৪র্থ খণ্ড): ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৫০৯।

রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে যুগ থেকে যুগান্তরে। মাঝে মঝে অন্তর্বিপ্লব রূপ দাবানল এই রাজ্যে অশান্তি আনে, কাঠুরিয়ার কুড়ালের কোপে প্রজাদের বাস্তুচ্যুত হতে হয়। কিন্তু সেও ওই দুএকদিন, যে গাছ কাটা হল তারই গোড়া থেকে আবার বেরুচ্ছে কিশলয়। এর শেষ নেই। শালগাছ এখানে যেন রক্তবীজের বংশধর স্বরূপ। সবুজ শালবন কিন্তু রুক্ষ কর্কশ মাটি থেকেই রস সংগ্রহ করে। মাটি এখানে লাল আর পাথুরে কাঁকরে ভরা।

ঝাড়গ্রামের অর্থাৎ পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এই প্রান্তটি জুড়ে এই শালের রাজ্যে, গহন বনের মধ্যে কুটির বেঁধে বাসকরে আদিবাসী ও সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। বনবিভাগের শ্যেনদৃষ্টি উপেক্ষা করে জঙ্গলে থেকে কাট কাটা, মহুয়া ফুল, হরীতকী, বয়ড়া ইত্যাদি সংগ্রহ, বনের চাক থেকে মধু সংগ্রহ এদের অন্যতম উপজীবিকা। এ ছাড়া শিকার। শিকার এদের উৎসব এবং জীবিকা। রক্তে এদের আদিম নেশা। তাই এরা তীর ধনুক টাঙ্গি ইত্যাদি দিয়ে জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে খরগোশ, বুনো ময়ূর, বন্য শুকর, সাপ ইত্যাদি। বড় কোন জন্তু এ অঞ্চলে নেই, তবে এককালে ছিল। কারণ, এ বিষয়ে ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-এ যে বর্ণনা পাই :

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥
ঝারিখণ্ড স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥

উড়িষ্যা প্রদেশের ময়ূরভঞ্জ এলাকার বনপথে জঙ্গলময় প্রান্তরের জীবজন্তুর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের উল্লেখও লক্ষ্য করা

যায়। এই অঞ্চল পূর্বে কিরূপ জঙ্গলময় ও শ্বাপদ-সঙ্কুল ছিল তা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত বর্ণনা থেকেই জানা গেল।

এই সব শ্বাপদ-সঙ্কুল বন-প্রান্তরে যে আদিবাসী বাস করে তার মধ্যে সাঁওতালই প্রধান। তবে ভূমিজ, লোধা, কোড়া, মহালী ইত্যাদি শ্রেণীর সংখ্যাও কম নয়। এ ছাড়া মাহিষ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয় ইত্যাদি শ্রেণীর লোকও পাশাপাশি বাস করে। আদিবাসীরা বিভিন্ন শ্রেণীর গোত্রে বিভক্ত। হাঁসদা, বাস্কে, সরেণ, টুডু, নায়েক, মল্লিক, দিগর, দণ্ডপাঠ, ভূইঞা, সর্দার, ভোক্তা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সব উপাধিগুলি এক এক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় পদমর্যাদায় ভূষিত হয়। এই বিভিন্ন উপাধি ও গোত্রের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য, বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা (Tabu) আছে। :শিকার এবং বনজ দ্রব্য সংগ্রহ ছাড়াও চাষবাসের কাজে দিনমজুরী করাও এইসব আদিবাসী মানুষদের অন্যতম পেশা। কোন হাঁসদা যুবক, কিংবা টুডু বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় সর্দার বন-জঙ্গল থেকে শিকার করে ফিরে এলে পর তাকে সবাই ঘিরে বসে এবং গল্প শুরু হয়। এক বাঘ, কিংবা এক শিয়াল। এই সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা তাদের বিচিত্র। উপকথার মাধ্যমে এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা নির্গত হতে থাকে।

ঝাড়গ্রামের এই হাতিবাড়ী অঞ্চলে এই সব আদিবাসী ও গ্রাম্য মানুষদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে অজস্র উপকথা। যেগুলির কথক হচ্ছে এই শালের জঙ্গলে কুটির বেঁধে বসবাসকারী সাধারণ আদিবাসী ও গ্রাম্য মানুষের দল। সুবর্ণরেখার চর ধরে ধরে—বালুময় প্রান্তরের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম। সেই সব গ্রামের মানুষ অসংখ্য রূপকথা আর উপকথায় ভরিয়ে রেখেছে তাদের অন্তরগুলি, তাই সেখানে গল্প শুরু হয়েছে : এক গ্রামে এক তাঁতি ছিল। সে তার শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছিল। শ্বশুরবাড়ী যাওয়ায় শাশুড়ী তাকে খেতে দিল। তাকে যে সব খাবার দেওয়া হলো তার মধ্যে একটা ছিল বাঁশের

তরকারী। কিন্তু, তাঁতি কিছুতে বুঝতে পারল না ওটা কিসের তরকারী। তখন সে বললো, এটা কিসের তরকারী বুঝতে পারছি না। তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাকে বলল, এটা বাঁশ কড়ার তরকারী, শুনে তাঁতী ভাবল, বাঁশকড়ার তরকারী তো বেশ ভাল খেতে, এবার দেশে ফেরার সময় বেশ কিছু নিয়ে যেতে হবে; কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে সে বাঁশকড়ার তরকারী তো আর চাইতে পারে না, এদিকে খাবারও ভীষণ ইচ্ছা রয়েছে। সাতপাঁচ ভেবে সে পরদিন রাত থাকতে শ্বশুর বাড়ীতে যে বাঁশের বেড়া ছিল সেটাকে নিয়ে তার বাড়ীর দিকে দৌড় দিল। রাস্তার লোকে তার হাতে বাঁশের বেড়া দেখে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ হে, এটা কি করছ? এটা দিয়ে কি করবে? তখন তাঁতি বলল, ওহে এটা দিয়ে তরকারী হবে গো। সে কথা শুনে রাস্তার লোক ত হেসে খুন। বলল, হ্যাঁ হে তরকারী তো বাঁশ-কড়ার হয়, তোমার হাতে তো কতকগুলা শুকনা বাঁশ। ওগুলো দিয়ে কি তরকারী হয়। এ কথা শুনে তাঁতি খুব বোকা বনে গেল। [১৯৬৬ সালে হাতিবাড়ী থেকে সংগৃহীত]।

উপরোক্ত গল্পটিতে দুটি অভিপ্রায় (Motif) বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে ; ১। তাঁতির বোকামী, ২। জামাই-এর নির্বুদ্ধিতা। তাঁতির বোকামি ও জামাই-এর নির্বুদ্ধিতা বাংলাদেশের উপকথার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এই সব বৈশিষ্ট্যগুলির উৎস যে আদিম জনসমাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ জামাইয়ের সঙ্গে শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—যেমন বাংলাদেশের গ্রাম্যজীবনের একটি সাধারণ ঘটনা, তেমনি আদিবাসী সমাজেও। তাই সেখানে জামাই চরিত্র সর্বদা হাস্যরসাত্মক ভাবে উপস্থিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে P. O. Bodding-এর সংগৃহীত সাঁওতালী উপকথার গল্পাংশ উপস্থিত করা যেতে পার। যথা :
In another story (Bodding 27) a son-in-law is eating a delicious curry of bamboo shoots and asks his

mother-in-law what it is made of. She replies, 'Look what is behind you. That is what I have made the curry of.' The young man turns round and sees the bamboo door. When everyone is asleep he steals the door, returns home and tells his wife about the delicious curry made from a door. He insists on his wife making one with bits of the door and is surprised to find that the curry is uneatable. [The Folk-Tale in Santal Society. *Man in India* Vol-XXIV. p. 225]

এই ভাবেই আদিবাসী জনসমাজ ও গ্রাম্য সাধারণ মানুষের রঙ্গ-রসিকতায়, হাস্য-পরিহাসে বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য প্রদর্শনে জমে উঠেছে উপকথার আসর। পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের এই জঙ্গলময় পাথুরে মাটির এই সব সরল সাধারণ মানুষের কাছে যখনই যাওয়া গেছে তখনই গল্প শুরু হয়েছে: এক দেশে এক রাজার বাড়ী ছাগল রক্ষকের নাম ছিল অন্তা। সে রোজ তার ছাগল নিয়ে একটা নদী পার হয়ে চলে যেত। বাড়ীতে ছিল তার অন্ধ মা। রোজ দুপুরে অন্তার মা নদী পার হয়ে গিয়ে ছেলেকে খাবার দিয়ে আসত। তাই দেখে এক শিয়াল ভাবল যে চালাকি করে অন্তার মায়ের কাছ থেকে খাবারগুলো খেতে হবে। একদিন তাই শিয়াল নৌকার মাঝি সেজে বসে রইল। অন্তার মা যখন বাটীতে করে ছেলের খাবার নিয়ে যাচ্ছে, তখন শিয়াল তাকে বললো—মাসী তুমি ত একা অত জলে যেতে পারবে না আমার নৌকায় চল তোমায় পার করে দেবো। তারপর অন্তার মা নৌকায় চড়ে বসলে শিয়াল বললে, মাসী খাবার বাটীটা আমাকে দাও। তুমি ত দেখতে পাওনা, হয়তো জলে পড়ে যাবে। বুড়ী সরল মনে তাকে বাটীটা দিয়ে দিল আর শিয়াল সব কিছু খেয়ে কাদাজল পূরে বাটীটা বুড়িকে দিয়ে দিল। বুড়ি ডাঙায় নেমে ছেলেকে খেতে দিল। ছেলে খুব রেগে গেল।

পরের দিনও একই ঘটনা ঘটলো। তখন অন্তার সন্দেহ হলো শিয়ালের উপর। তখন অন্তা করল কি ঘাটের কাছে ছাগলগুলো ছেড়ে দিয়ে বসে রইল। বুড়ি তো প্রতিদিনকার মতই খাবার নিয়ে এসেছে। শিয়াল এসেই অন্তার গলা করে বলল, মা আমি নিজে এসেছি খাবারটা দাও। একথা বলে শিয়াল যেই খাবারটা নিয়েছে অমনি অন্তা তার ঘাড়ে চেপে বসলো। শিয়াল তখন প্রাণভয়ে এক রাজকন্যার সঙ্গে অন্তার বিয়ে দেবে এমন প্রতিশ্রুতি দিলে অন্তা তাকে ছেড়ে দিলে।

তারপর শিয়াল অন্তার বৌ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে অনেক দেশ পার হয়ে এক পুকুরধারে এসে পৌঁছলো। সেই পুকুরে তখন সেই দেশের রাজকন্যা স্নান করতে গিয়ে কানের দুল হারিয়ে কান্নাকাটি করছিলো। শিয়াল তাই দেখে তাকে বললো, তুমি সামান্য একটা দুল হারিয়ে এত কান্নাকাটি করছো আমার অন্তাদাদাব ঘরে কত সোনা আছে। তাই শুনে রাজকন্যা বাড়ী গিয়ে রাগ করে শুয়ে রইলো। সকলেই এসে তার রাগের কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। তখন রাজকন্যা বললো যে অন্তা নামে যে ছেলে আছে তার সঙ্গে বিয়ে না দিলে সে আত্মহত্যা করবে; আর সেই অন্তার খোঁজ পাওয়া যাবে পুকুরধারে—শিয়ালের কাছে। রাজা পাল্কী পাঠিয়ে সেই শিয়ালকে রাজবাড়ীতে নিয়ে এসে বললো, সেই অন্তার কত সোনা আছে? সে কি তার সিং-দরজাকে সোনা করে দিতে পারবে? শিয়াল রাজার কথায় স্বীকৃত হয়ে অন্তাকে আনতে গেল।

যেতে যেতে ঘাসীর (যে ঘোড়াকে ঘাস দেয়) বাড়ী পড়ল। শিয়াল তাকে বলল যে রাজার আদেশে তাকে ঘোড়াটা দিতে হবে। এই বলে ঘোড়াটা নিয়ে সে এগিয়ে চলল, পথে দেখা হলো এক স্বর্ণকারের সঙ্গে। স্বর্ণকারের কাছ থেকে রাজার আদেশের নাম করে সমস্ত সোনা নিয়ে চলে এল। এবার এল এক তাঁতির বাড়ী। সেখানে রাজার নাম করায় তাঁতি ভাল ভাল কাপড় দিল

তারপর অন্তাকে সাজিয়ে নিয়ে এল রাজার কাছে। রাজা তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। অন্তা সেই সিং দরজাটা সোনা দিয়ে তৈরী করে দিলে। তারপর রাজার মৃত্যুর পর অন্তা সেই দেশের রাজা হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল। [দহমুণ্ডা গ্রাম, মেদিনীপুর জেলা থেকে ১৯৬৬ সালে সংগৃহীত]। শৃগালের বুদ্ধি এবং চালাকি প্রদর্শন যে বাংলা উপকথার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সে কথা আগেই বলেছি। বাংলাদেশের উপকথায় শিয়াল চরিত্রে দু'টি পরস্পর বিপরীতধর্মী বিশ্বাস উপস্থিত। একটি লোক-বিশ্বাস অনুসারে শিয়াল পণ্ডিত—বিদ্যাদান এবং উপদেশ প্রদানই তাঁর মহৎ ব্রত। তাই বিখ্যাত কুমীর ও শিয়ালের গল্পে কুমীর তার সন্তানদের বিদ্যালাভের জন্যে শিয়ালের কাছে এসেছে। শিয়াল বিশ্বাসহন্তা, সুচতুর ও অকৃতজ্ঞ। Sten Konow-র ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করে করেন বাংলার উপকথায় শিয়াল চরিত্রের এই দুই বিপরীতধর্মী রীতি দু'দিক থেকে এসে মিশেছে। এর একটি Indo-European গোষ্ঠীর দান, অন্যটি Proto-Australiod বা নিষাদ গোষ্ঠীর দান। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের দহমুণ্ডা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত উক্ত গল্পটির মধ্যে এই দু'টি বৈশিষ্ট্যই একটু পৃথকভাবে উপস্থিত হলেও মোটামুটি ভাবে ঐ একই রীতিনীতিকে উপস্থিত করেছে (কেবলমাত্র একটু সংস্কৃতরূপে তা উপস্থিত)। দহমুণ্ডা গ্রামটি ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের মেদিনীপুর জেলার যে অংশে অবস্থিত সে অঞ্চলটি জঙ্গলাবৃত এবং নানা আদিম উপজাতিতে পরিপূর্ণ, একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই অঞ্চলে পূর্ব থেকেই নিষাদ জাতির বসবাস। সুতরাং সুসংস্কৃতভাবে হলেও শিয়ালের গল্পটিতে ওই একই প্রভাব কার্যকরী হয়েছে।

বর্তমান উপকথাটিতে দেখা যায় শিয়াল অন্তার মাকে ফাঁকি দিয়ে তার খাবার খাওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রথমে মাঝি সেজে অন্তার মায়ের কাছ থেকে ছল ও চাতুরি করে খাবারটা নিয়ে নিয়েছে এবং পরে খাবারের বাটীটা জল ও কাদায় ভর্তি করে ফেরৎ

দিয়েছে। আবার পরে শিয়াল তার প্রতারণা প্রবৃত্তির পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে এবং অন্ধমায়ের কাছে ছেলের গলা করে খাবার চেয়েছে। অবশ্য এখানে অন্তার বুদ্ধির কাছে সে পরাস্ত হয়েছে। তথাপি এই প্রতারণা প্রবৃত্তি এবং ছল-চাতুরি আমাদের বিস্মিত করে। শিয়ালের এই আচারণ সম্পর্কে আমাদের দেশের ধারণা এতই খারাপ যে শিয়ালের ডাকও আমাদের কাছে বিপদের সূচনা বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে: In India the hawling of jackals is a sign of approaching misfortune ; especially is the howling of a jackal heard on the left an evil omen. [S. D. F. L. pp. 533]। গল্পের দ্বিতীয় অংশেও শিয়াল যখন প্রাণভয়ে ঘটকালিতে প্রবৃত্ত হয়েছে সেখানেও শিয়ালের যে বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে, তা হচ্ছে প্রবঞ্চনা। রাজার মেয়েকে সে মিথ্যা কথা বলেছে যে অন্তার ঘরে অনেক সোনা আছে। স্বর্ণকারকে, ধোপাকে, তাঁতিকে সে প্রবঞ্চনা করেছে। তবে শিয়ালের এই প্রবঞ্চনার কাহিনী যে এই অঞ্চলের সর্বত্র বিদিত তার আরও পরিচয় পাওয়া যায় এখানেই সংগৃহীত আরও একটি উপকথায়। তবে এখানে শেয়াল এর পরিবর্তে শিয়ালনীর চতুরতা প্রকাশ পেয়েছে। গল্পটি এই:

এক শিয়াল আর তার দুটি ছানা এবং শিয়ালনী এক গর্তে বাস করতো। একদিন সেই শিয়ালনীর সঙ্গে পথে এক বাঘের দেখা হলো। বাঘ ভাবলো, এবার এটাকে খাব। শিয়ালনী বাঘের মতিগতি বুঝতে পেরে বললো, শ্বশুরমশাই, আমার সংসারে বড় অশান্তি, আপনার ছেলে আমাকে মারধোর করে। আমি দুটি ছানাকে নিয়ে বড়ই কষ্টে আছি, আপনি এর বিচার করুন। বাঘ প্রথমটায় শ্বশুর সম্বোধন শুনে একটু গর্ববোধ করল এবং পরে ভাবল দুটি ছানা ও স্বামীর সংবাদ পেলে আরও ভাল হয়। তাহলে চারজনকেই একসঙ্গে খাওয়া যাবে। এইসব নানা

ভেবে বাঘ বলল, চল, তোমাদের বিচার করে দিয়ে আসি। শিয়ালনী বলল, আমি আগে আগে যাচ্ছি, আপনি আমার পিছনে পিছনে আসুন। কিছুদূর যাওয়ার পর শিয়ালের গর্ত এসে পড়লো। শিয়ালনী বলল, আমি আগে গর্তে ঢুকি, তারপর আপনি আসুন। বাঘ বলল, আচ্ছা তাই হবে। স্ত্রী শিয়ালটি গর্তের ভিতর ঢুকে গেল; কিন্তু বাঘ ঢুকতে পারল না। এমন সময় শিয়ালনী গর্তের ভিতর থেকে চীৎকার করে বলল, শ্বশুর মশায়, আপনার কষ্ট করে আর ভেতরে আসতে হবে না; কারণ আমাদের ঝগড়াঝাঁটি সব মিট্‌মাট হয়ে গেছে। এবার আপনি আসুন।

বাংলার উপকথায় শিয়ালের কাছে বৃহৎ ব্যাঘ্র চিরকাল পরাজয় স্বীকার করেছে, পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই উপকথাটিতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। কেবলমাত্র দেখা গেল শিয়াল একাই যে চতুর তা নয়, তার স্ত্রী শিয়ালনীও এ-বিষয়ে বেশ দক্ষ। কেবল বাংলাদেশের উপকথায় শিয়াল চরিত্রে নানা বৈশিষ্ট্য প্রচলিত—বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার আদিম উপজাতির মধ্যে। শিয়াল চরিত্র এই সব দেশে এত জনপ্রিয় যে, তাকে অনেক সময় বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের মন্ত্রণাদাতা বা ত্রাতারূপে উপস্থিত করা হয়েছে। নিগ্রোদের মধ্যে শিয়ালের পরামর্শ-ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে বিচারকের। এক শিয়াল সম্পর্কেই বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে একটি তালিকা উপস্থিত করা যেতে পারে। In Asiatic folk-tale, Jackal provides for the lion; he scares up game, which the lion kills, and eats and receives what is left as reward. In stories from northern India he is sometimes termed 'minister to the king', i. e. to the lion.······In Hausa Negro folk-tale Jackal plays the role of sagacious judge and is called 'O Learned one of the forest.' The Bushmen say that Jackal goes round behaving the way he does

'because he is Jackal.' Jackal is the beloved trickster of Hottentot folk-lore. [ibid. pp. 533]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে শিয়াল চরিত্রটি—পৃথিবীর লোককথার একটি পরিচিত ধূর্ততম জীব। তার চতুরতা, বুদ্ধিমত্তা, ও বিচারশক্তি পৃথিবী বিখ্যাত। তবে পর্যালোচনায় দেখা গেল শিয়ালের ধূর্ততা ও চাতুরিই এ সম্পর্কিত বিশ্বাসের আদিমতম স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে Sten Konow-এর একটি উক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে: 'The Jackal is not throughout described and characterized in a uniform way. Usually he is a clever and dexterous aminal, which is always prepared to assist those who have suffered wrong in asserting their right. In some tales, however, he acts in a different way. He is malicious and treacherous, but usually he is defeated in the end'. [Preface to P. O. Bodding Vol-I. Page IX].

শিয়াল চরিত্রের এই চাতুর্য ও বিশ্বাসহন্তার দ্বৈতরূপ সম্পর্কে, তাঁর বিশেষ মন্তব্য: The crafty and treacherous jackal would then represent the more original types. অর্থাৎ শিয়ালকে বিশ্বাসহন্তারূপে উপস্থিত করাই তার আদিমতম পরিচয়। আর যদি তাই হয় তবে এ সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি: 'বাংলার পশ্চিম-সীমান্তের অধিবাসী সাঁওতাল উপজাতির নিকট হইতেই প্রধানতঃ বাঙালী তাহার শৃগাল-সম্পর্কিত উপকথাগুলি গ্রহণ করিয়াছে'। ['বাংলার লোক-সাহিত্য' (১মখণ্ড) পৃ. ৪৯১]।

P. O. Bodding-এর সাঁওতালী লোককথা সংগ্রহের আলোচনা প্রসঙ্গে Mildred Archer বলেছেন: Amongst the animals themselves, the smaller out wits fiercer. The goat defeats the bear, and the jackal the tiger. The jackal has a dual personality for sometimes he

is the villain of the piece and suffers, but often he is the weak intelligent little animal who out-wits the strong. [The Folk-Tale in Santal Society, *Man in India.* Vol. XXIV P. 231]

পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের সংগৃহীত শিয়াল সম্পর্কিত উপকথা দুটিতে উপরোক্ত মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী। দ্বিতীয় গল্পটি ক্ষুদ্র শিয়ালনীর কাছে বৃহৎ ব্যাঘ্র পরাজিত হয়েছে বুদ্ধিতে। আবার প্রথম গল্পটির মধ্যে দ্বৈত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথমতঃ সে অন্তার মাকে প্রতারিত করে তার খাদ্য চুরি করে খেয়েছে এবং পরিবর্তে জল-কাদা ভরে দিয়ে অন্ধ মাকে প্রতারিত করেছে। আবার অন্যদিকে প্রাণভয়ে অন্তার বিবাহের ঘটকালি করতে গিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের এই ঝাড়গ্রামের শালবনে বহু আদিম অধিবাসীর বসবাস। শিয়াল সম্পর্কিত নানা ধারণা এদের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়ে পরে আর্য ভাষাভাষী সমাজে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ফলে এ অঞ্চলের শিয়াল চরিত্রে নানা বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে এবং একথাও প্রমাণ করেছে শৃগাল চরিত্রের নানা বিপরীত আচার-আচরণ সমস্ত আদিবাসীদেরই দান।

বাঘের নির্বুদ্ধিতা বাংলাদেশের উপকথার একটি সুপরিচিত অভিপ্রায়। মানুষ বা অন্যকোন ক্ষুদ্র জন্তুর কাছে সে সর্বদাই পরাজিত। বাংলার মানুষ তাহার ক্ষুদ্র অবয়বের জন্য চিরকাল গল্পে-উপকথায় বৃহৎ ও শক্তিশালীকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছে। পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের উপকথার মধ্যেও ঐ একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইতিপূর্বে একটি উপকথায় বাঘ কিভাবে শিয়ালনীর কাছে বুদ্ধিতে পরাস্ত হয়েছে তা উপস্থিত করা হয়েছে। এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত আর একটি উপকথায় এক চাষীর কাছে বাঘ ও সিংহ কিভাবে পরাস্ত হয়েছে তার কাহিনী উপস্থিত হয়েছে।

গল্পটি এই: এক গ্রামে এক চাষী ছিল। সে নদীর ধারে এক জমিতে চাষ করত। একদিন চাষ করছে, এমন সময় সেই নদীর ধারের বন থেকে এক বাঘ এসে বলল, 'তোর বলদ ছ্টো নেবার জন্যে ভগবান আমায় পাঠিয়েছেন।' এমন সময় চাষীর বৌ সেখানে চাষীকে খাবার দিতে এল। এসে সব ব্যাপারটা দেখে বলল, 'বলদ-ছ'টো নেবে এ ত বেশ কথা; আমাদের বাড়ীতে ভাল গাই আছে, তুমি দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি'। চাষীর বৌ ছুটে গিয়ে বাড়ী থেকে তলোয়ার নিয়ে এল এবং বলল, 'ভগবান আমায় পাঠিয়েছে বাঘকে মেরে ফেলার জন্যে।' একথা শুনে বাস ছুটে বনে পালিয়ে গেল। বাঘের রাগ কমেনি। সে গিয়ে তখন সিংহকে সব কথা খুলে বলল। সিংহ বলল, 'এতবড় কথা চাষী-বৌ এর। চল দুজনে মিলে ওকে ধরে নিয়ে আসি'। তখন দুজনে চাষীর বাড়ী গিয়ে হাজির হল। বাড়ীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চাষী-বৌ বলে উঠলো, 'বাঘ তোর পুরস্কারটা নিয়ে যাস। সত্যি সত্যি সিংহকে নিয়ে আসতে পারবি ভাবিনি। ভগবান আমায় বলেছিলো যে সিংহকে ধরে আনতে পারবে, তাকে পুরস্কার দিতে। তুই এবার সত্যি সত্যি পুরস্কার পাবি'। একথা শুনে সিংহ ভাবল ওকে বুঝি কারসাজি করে ধরে আনা হয়েছে, তাই ভয়ে সে পালিয়ে গেল। আর সিংহ পালাবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘও প্রাণপণে ছুটে পালাতে লাগলো।

বাঘ সম্পর্কিত এই বোকামির ধারণাটি এসেছে সম্ভবতঃ বাংলা দেশে বসবাসকারী আদিম উপজাতিদের কাছ থেকে। কারণ শিকারী ও যাযাবর ঐ জাতিকেই পূর্বে বাঘ, নেকড়ে, সিংহ ইত্যাদি হিংস্র পশুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাই তাদের ব্যঙ্গ করা উপজাতিদের উপকথার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে ঐসব কাহিনী বাংলা উপকথায় এসে গেছে। সাঁওতাল পরগণা থেকে সংগৃহীত বাঘের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে একটি মাল্টো উপজাতির কাহিনী উক্ত কথাই সপ্রমাণ করে। কাহিনীটিতে দেখা যাবে কিভাবে বাঘ একটি সাধারণ চাষী

বালকের নিকট বারবার বুদ্ধিতে পরাস্ত হয়েছিল। বাঘের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে যে আদিম রূপ প্রচ্ছন্ন আছে তাহা *Man in India* (Vol XXIV পৃ. ২১৫) তে প্রকাশিত Malto Folk-Tales-এর অন্তর্গত *'The Boy and the Tiger'* শীর্ষক গল্পটি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গল্পটিতে দেখা গেছে একটি চাষী বালকের কাছে বৃহৎ বাঘ কি ভাবে পরাস্ত হয়েছিলো এবং বাঘের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কিত এই ধারণাটি এসেছে পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে। উপরোক্ত উপকথাটি তাই-ই সপ্রমাণ করে। পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের বহু উপকথার মধ্যেই এই ধরণের বাঘের বোকামির পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ বাংলা দেশের উপকথায় মোরগের গল্পের প্রচলন একান্ত কম। কিন্তু পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার কোন কোন অঞ্চলের উপকথায় মোরগ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। মোরগ এই অঞ্চলের একটি পরিচিত জীব। তাই দেখা গেছে বাঁশপাহাড়ী, কুইলাপাল কিংবা হাতিবাড়ী-ডোমজুড়ি ইত্যাদি বৈষ্ণব-প্রধান গ্রামে তুলসী মঞ্চের পাশেই কুক্কুট শাবকের স্বচ্ছন্দ বিহার, গ্রাম দেবতার থানে নিরামিষ ফলমূল নৈবেদ্যের সঙ্গে সঙ্গে মুরগী বলি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ধর্মে ও জীবনে মোরগের আধিপত্য হিন্দু-প্রভাব বহির্ভূত। আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করেই গ্রাম্য মানুষের জীবনেও মোরগের মতো নিষিদ্ধ জীবের প্রাধান্য এসে গেছে। তার সার্থক উদাহরণ পাওয়া যায় ঐ অঞ্চলে সংগৃহীত একটি উপকথায়ঃ একটা বাড়ীতে তিনটে মোরগ ছিল, একদিন একটা শিয়াল এসে বলল, 'বোনপো, বোনপো, আমায় থাকতে দেবে?' মোরগ বলল 'থাকো।' রাতের বেলা শিয়াল বলল, 'বোনপো, আজ তোমরা কোথায় শোবে'? মোরগরা বলল, 'আজ উনুনে ছাই আছে তাই খড়ের চালে শোব'। অনেক রাতে শিয়াল চালে উঠে গিয়ে একটা মোরগ খেয়ে এলো।

পরের দিন দুটো মোরগ ভাবলো, বোধ হয় তাদের ভাই বেড়াতে গেছে। শিয়াল রাতের বেলায় আবার জিজ্ঞেস করলে 'বোনপো, বোনপো, আজ তোমরা কোথায় শোবে'। মোরগরা বললো, 'চালে ধুলো আছে, তাই উনুনে শোব'। অনেক রাতে শিয়াল আর একটা মোরগকে খেয়ে ফেললো।

পরদিন শেষ মোরগটার খুব সন্দেহ হলো। সে সারারাত জেগে বসে রইলো, অনেক রাতে যখন শিয়াল তাকে খেতে এলো, তখন মোরগ বলল, 'মামা তুমি চোখ বোজ আমি তোমার মুখে ঢুকছি'। বোকা শিয়াল যেই চোখ বুঝলো আর অমনি মোরগ উড়ে গেল।

ক্ষুদ্র মোরগের বুদ্ধিমত্তা এবং তার কাছে চতুর শিয়ালের পরাজয় এই অঞ্চলের উপকথার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের অভিপ্রায় যে সোজাসুজি এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে আহৃত এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত আদিবাসী-উপকথার মধ্য থেকে। ঐ সব আদিম উপকথার মধ্যে যা বীজাকারে ছিল, পরে তা বাংলা দেশের সীমান্ত অঞ্চলের গ্রাম্য উপকথায় অনুপ্রবেশ লাভ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড গল্পের সৃষ্টি করেছিল। সাঁওতাল পরগণা থেকে সংগৃহীত একটি মাল্টো উপকথায় এ ধরণের গল্পের আভাস লক্ষ্য করা যায়। তবে সেই গল্পটিতে শিয়াল এর পরিবর্তে বুনো বিড়ালের কথা উল্লেখিত হয়েছে [পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃষ্ঠা. ২১৯। *The Wild Cat and the Chickens* শীর্ষক গল্প]।

উল্লেখিত মাল্টো গল্পটিতে দেখা যায় যে কিভাবে মোরগবাচ্চা বুনো বেড়ালকে প্রতারিত করে প্রাণরক্ষা করেছিলো। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার উপকথাগুলিতে এ ভাবেই আদিম উপজাতির অসংখ্য প্রভাব প্রমাণিত হয়। মোরগের গল্প ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণার অনেক অঞ্চলে প্রচলিত আছে। সাঁওতাল পরগণা থেকে সংগৃহীত মাল্টো উপজাতির উপকথাটি তাই-ই সপ্রমাণ করে। এছাড়া হাতিবাড়ী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মোরগের গল্পটির

সঙ্গে যে এর প্রত্যক্ষ যোগ বর্তমান, তার অনেক প্রমাণও আছে গল্পটির মধ্যে। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত উপকথাটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে—না হলে তারও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যেত যে, এ অঞ্চলের অধিকাংশ উপকথার মতই এই উপকথাটি আদিম উপজাতির সাংস্কৃতিক প্রভাবেরই দান। কিন্তু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে উপকথাটিতে শিয়াল বোকা রূপে বর্ণিত। এটি এই উপকথাটির একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কারণ উপজাতিদের উপকথায় শিয়াল সাধারণতঃ বোকা হয় না। মাল্টো উপজাতির উপকথাটিতে তাই শিয়ালের পরিবর্তে বুনো বেড়ালের অবস্থান। কিন্তু শিয়ালের এই পরিচয় গ্রাম্য উপকথাটিতে পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হয়েছে। উপজাতিদের চতুর ও চালাক শিয়াল গ্রাম্য উপকথায় বোকা শিয়ালে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অভিপ্রায়টি ঠিকই আছে, অর্থাৎ ক্ষুদ্র বৃহতের কাছে জয় যুক্ত হয়েছে। ক্ষুদ্র মোরগ বুদ্ধিতে বৃহৎ শিয়ালকে পরাজিত করেছে।

P. O. Bodding-এর সাঁওতাল লোককথা সংগ্রহের আলোচনা প্রসঙ্গে M. Archer বলেছেন : The first type involves a use of riddle talk or conversational symbolism. Some men go to look for a possible bride and are prejudiced against a girl because she says her father and mother are out, her father 'having gone to meet rain and her mother 'to make two persons of one. (Bodding 91). The men think that the girl is utterly stupid but on returning home their women-folk jeer at their abtuseness and say that the girl's meaning is quite clear. The father had gone to cut thatchig grass and the mother has gone to grind split peas. [*Man in India* Vol XXIV pp. 225]।

আদিবাসী সাঁওতাল ইত্যাদি উপজাতিদের গল্পের যে পাঁচটি ভাগ করা হয়েছে তার প্রথম ভাগেই এই ধাঁধা এবং রূপকাত্মক

বাক্যালাপমূলক কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব গল্পগুলিতে ধাঁধাঁর মাধ্যমে কাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়। কাহিনী পরিবেষণই এর একমাত্র রস নয়, লক্ষ্য গল্পের শ্রোতাদের মধ্যে গল্পটি পরিবেষণ করে তার উত্তর জিজ্ঞাসার মধ্যে যে কৌতুক ও রহস্য সৃষ্টি করা হয় তার মধ্যেও এই সব কাহিনীর গুরুত্ব আছে। এধরণের ধাঁধাঁ-মূলক কাহিনী আদিম উপজাতিদের দান। বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে রেষারেষি; দলাদলি ও শক্তির তারতম্যের জন্যই এই রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও রহস্যময় উপকথার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় প্রতিপক্ষকে বুদ্ধির মারপ্যাঁচে পরাস্ত করা। পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানেও এই আদিম উপকথার প্রভাব একান্তভাবে বিদ্যমান। একটি উপকথা উদ্ধৃত করলে এর সার্থক প্রমাণ পাওয়া যাবে। গল্পটি এইঃ চারটি লোক একসঙ্গে গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বিপরীত দিক দিয়ে একটি লোক আসছিল, এই চারজনকে দেখে সে হাত জোড় করে নমস্কার করে চলে গেল। কিছুদূর যাবার পর ঝগড়া লেগে গেল। সবাই বলে তোকে নয়, আমাকে নমস্কার করেছে। কিছুতেই এর সমাধান হলো না দেখে সকলেই ঠিক করলো লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করা উচিত। লোকটিকে ডাকার পর সে বলল, আমি কাউকেই নমস্কার করিনি। অনেক অনুরোধের পর সে বলল, আপনাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বোকা, তাকে আমি নমস্কার করেছি। তখন চারজনার মধ্যে আবার ঝগড়া বেঁধে গেল। সবাই বলে আমিই সবচেয়ে বোকা।

প্রথমজন বললে, আমিই সবচেয়ে বোকা। কারণ, আমি মামার বাড়ী যাচ্ছিলাম। বাবা আমাকে একটা ঘটি দিল ঘি আনবার জন্যে। পথে যেতে যেতে খুব খিদে পেল, গ্রামের একটা দোকান থেকে মুড়ি কিনলাম এক আনার। মুড়িগুলো ঘটির মধ্যে রেখে দিলাম, কিন্তু খাবার সময় ঘটি থেকে মুঠো ভরা হাত কিছুতেই তুলতে পারলাম না। সারাটা রাস্তায় না খেয়েই রইলাম। এবার বলুন আমার থেকে

কেউ কি বেশি বোকা আছে। আমিই বেশি বোকা, অতএব আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

দ্বিতীয়জন বলল, আমি সবচেয়ে বেশি বোকা। কারণ, একদিন আমার স্ত্রী ধোপাকে ডেকে কাপড়গুলো ধুতে দিতে বলল। কিন্তু আমি ধোপাকে না ডেকে মাথায় কাপড়গুলো বেঁধে রজকের বাড়ীতে ফেলে দিয়ে এলাম; অতএব আমিই সবচেয়ে বোকা, আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

তৃতীয়জন বলল, আমি সবচেয়ে বোকা। কারণ, আমার দু'জন স্ত্রীকে একদিন দুপাশে নিয়ে শুয়ে আছি। হাতদুটো দুজনার কাছে আছে। এদিকে আমার চোখে পিঁপড়ে কামড়াতে আরম্ভ করল; কিন্তু কোন হাত দিয়েই তাড়াতে পারলাম না। কেননা যে হাতই তুলি না কেন আমার স্ত্রীরা রেগে যাবে। অতএব আমিই বোকা। আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

চতুর্থজন বলল, আমি সবচেয়ে বোকা। কারণ, একদিন আমার স্ত্রীকে বৈঠকখানায় তামাক দিয়ে আসতে বললাম; কিন্তু, স্ত্রী রাজি হলো না; কেন না, উঠানের জলে তার পায়ের আলতা ধুয়ে যাবে। তখন আমি হুঁকো শুদ্ধ আমার স্ত্রীকে কাঁধে করে নিয়ে গেলাম বৈঠকখানায়—অতএব আমিই সবচাইতে বোকা। এখন প্রশ্ন হলো, কে সব চেয়ে বোকা? তার উত্তরে বলা হলো, প্রথম জনই সবচেয়ে বোকা।

এ ধরণের বোকামীর গল্প এবং ধাঁধাঁমূলক উপকথা ঝাড়গ্রাম অঞ্চল থেকে প্রচুর সংগৃহীত হয়েছে। বহু আদিম জাতির মধ্যে ধাঁধাঁ প্রচলন না থাকলেও ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণার ওঁরাও জাতির বিবাহ অনুষ্ঠানে খুব বেশী ধাঁধাঁর প্রচলন আছে। এই ধাঁধাঁর আনুষ্ঠানিক ব্যবহার থেকেই ধাঁধাঁমূলক কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে। পূর্বে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে ধাঁধাঁমূলক কাহিনী এবং ভাষাগত রূপক-সৃষ্টি সাঁওতাল লোক-কথার একটি প্রধানতম বিভাগ। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বহু সাঁওতাল উপজাতি

বসবাস করে। তারা গ্রাম্য গৃহস্থের চাষের কাজে, দিন মজুরীর কাজে, সর্বদা পাশাপাশি বসবাস করে। সুতরাং তাদের আদিম সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রাম্য সংস্কৃতির মিলন ও আদানপ্রদান খুব দ্রুত ও সহজসাধ্য হয়েছে। পাশাপাশি অবস্থান তাদের চিত্তের উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে। প্রবন্ধের প্রথম অংশে জামাইয়ের বাঁশের তরকারী খাওয়ার গল্পটির সঙ্গে P. O. Bodding-এর সংগৃহীত একটি সাঁওতালী গল্পের হুবহু সাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করা হয়েছে এই ধরণের হাস্যরসাত্মক উপকথার আদিম বীজ আছে আদিবাসী সমাজ-মহলে—যার থেকে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে—তৈরী হয়েছে বহুবিচিত্র ধরণের উপকথা।

ঐন্দ্রজালিক জন্ম (Supernatural birth motif), ঐন্দ্রজালিক উপায়ে রূপ-পরিবর্তন (Transformation by magic),বাংলা-দেশের রূপকথা ও উপকথার দুটি সুপরিচিত অভিপ্রায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই অভিপ্রায়গুলি উপকথার পর্যায়ভুক্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে রূপকথার শ্রেণীভুক্ত। রূপ পরিবর্তন যেমন, মানুষ পশুতে, পশু থেকে মানুষে এবং মানুষ থেকে জড় বস্তুতে রূপান্তরের ধারণাটি একটি আদিম বিশ্বাসের ফল। এই সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে : The changing of human beings, mythical characters, animals and even inanimate objects, into a different from is a literary device freely used in North American Indian tales. Transformation is effected for a variety of reasons, some of which are : that the hero of tale may escape death, he able to reach a difficult place, kill his enemies, seduce women, win a combat or receive food. [S. D. F. L. pp. 1121]

কেবল আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেই নয় পৃথিবীর সমস্ত

দেশে এমন কি পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার প্রান্তবর্তী গ্রামের উপকথাতেও এই অভিপ্রায় প্রচলিত আছে। তার সার্থক উদাহরণ পাওয়া যাবে ঝাড়গ্রামের হাতিবাড়ী অঞ্চলের দহমুণ্ডা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত একটি লোক-কথায়। গল্পটিতে দেখা যাবে কি ভাবে শাশুড়ী সাপ খাইয়ে খাইয়ে বধূকে সর্পে রূপান্তরিত করেছিল এবং পরে রাজপুত্রের সাহসিকতার দ্বারা মেয়েটি সর্পজীবন থেকে উদ্ধার লাভ করেছিল। গল্পটি এই : একটি ছোট ছেলে আর তার বোন। কেবল দুই ভাই-বোন তারা। বাবা-মা নেই। ছাগল চরিয়ে জীবিকা-নির্বাহ হয়। একদিন বোনটি ছাগল চরাতে চরাতে রাজবাড়ীর বাগানের কাছে চলে এলো। এসে দেখল রাজার বাগানে খুব সুন্দর একটা ফুল ফুটে রয়েছে। ফুলটি নিতে তার ভারি ইচ্ছে হলো। মালী কিন্তু ফুলটি দিতে রাজী হলো না; কারণ, এই ফুল যে নেবে রাজার ছেলে তাকে বিয়ে করবে। মেয়েটির খুব জেদ— ফুলটা সে নেবেই। অনেক কান্নাকাটির পরেও মালিটা যখন ফুল দিল না তখন মেয়েটি নিজেই ফুলটা ছিঁড়ে নিল এবং রাজার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী এল, কিন্তু শাশুড়ী এতে খুশী হলো না; সে বউকে মোটেই দেখতে পারে না। এদিকে রাজার ছেলে প্রায়ই শিকারে যায়, মাঝে মাঝে বাড়ী ফেরে। যখন রাজার ছেলে শিকারে যায় তখন শাশুড়ী বৌকে সাপ কেটে খাওয়ায়। সাপ খেতে খেতে বৌটি সাপের মত দেখতে হয়ে গেল এবং একদিন সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। রাজার ছেলে তখন বিদেশে।

সাপের খোলসপরা বৌটি ছোট ভাইকে নিয়ে একটা বাঁধের ধারে এল। সেই বাঁধের ধারে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, সেই বটগাছের নীচে একটি কুঁড়ে ঘর বেঁধে ভাইটি থাকতো, আর বোনটি থাকত বাঁধের জঙ্গলে। একদিন সেই বোনটির একটি মানুষের মত শিশুসন্তান হলে সে ছোট ভাই-এর কাছে শিশুটিকে রেখে দিয়ে

এল মানুষ করবার জন্য। শিশুটাকে দুধ খাওয়াবার সময় হলে ভাইটি বোনকে ডেকে বলত,

স্থতা লাটাই দেখো শাশু বনবাস কল।
পুত্র যে কাঁদিছে নানী ক্ষীর ননী দিও॥

তখন সাপটা দুধ দিতে আসত সাঁতরে বাঁধ পার হয়ে। এইভাবে দিন যায়। কিছুদিন পর রাজার ছেলে বাড়ী ফিরে এসে দেখলো যে তার বৌ নেই। সে মাকে জিজ্ঞেস করলো বৌ কোথায়? মা বলল, সে বেড়াতে গেছে, আসবে এক্ষুনি! রাজার ছেলে বৌ আসবে, বৌ আসবে, করে অপেক্ষা করতে করতে এক সময় বেড়াতে চলে গেল। বেড়াতে বেড়াতে বাঁধের ধারে এল এবং এসে সেই বটগাছের নীচে ছোট ভাইটি আর শিশুটিকে দেখতে পেল। ছোট ভাইটি রাজার ছেলেকে সব বলে দিল। রাজার ছেলে তখন সাপটার মাথার দিক আর ল্যাজের দিকটা কেটে খোলসের ভিতর থেকে বউকে বার করে আনল। রাজার ছেলে বাড়ীতে এসে মাকে খুব গালাগাল করল। আর গর্ত খুঁড়ে তাতে মাকে পুঁতে ফেললো। তারপর রাজার ছেলে, বৌ-ছেলে নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করতে লাগলো।

উপরোক্ত উপকথাটি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা চলে গল্পটিতে যে জীবনযাত্রা ও জীবনাচরণ উপস্থিত হয়েছে তার থেকে এ ধারণা স্বভাবতঃই জাগে যে গল্পটির মূল ভিত্তি আদিবাসী সমাজ-জীবন। ফুল যে ছিঁড়বে রাজপুত্র তাকেই বিয়ে করবে, রাজপুত্রের শিকার করা ছাড়া অন্য কাজ নাই, আবার সেই শিকার যাত্রা প্রায়শই অনুষ্ঠিত হয়। রাজপুত্রের মা, যাকে গল্পের রাণী বলে উল্লেখ করা হয়নি—সে বৌকে তার পুত্রের অনুপস্থিতির সুযোগে রোজ সাপ কেটে খাওয়ায় এবং যার ফলে পুত্রবধূ সাপে রূপান্তরিত হয়ে যায়—এ সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ এবং বিশ্বাস এসেছে আদিম সমাজ-জীবন থেকে। আর রাজা একজন উপজাতি প্রধান (tribal chief) ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার সাঁওতাল প্রভৃতি

উপজাতি আজও সর্প ভক্ষণ করে। এই প্রথাটি গল্পের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে মাত্র। এ ছাড়া গল্পটির অভিপ্রায় বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে প্রথমতঃ এতে নাগিনী কন্যা বা serpent damsel অভিপ্রায়টি প্রকাশ পেয়েছে। সর্প ভক্ষণ করার ফলে সর্পে রূপান্তর লাভ বাংলার লোক-কথার একটি সুপরিচিত অভিপ্রায়। দ্বিতীয়তঃ গল্পটিতে ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন ফুল বা Magic Flower অভিপ্রায়টিও ব্যক্ত হয়েছে। বাগানের ফুলটি যে তুলবে রাজপুত্র তাকেই বিয়ে করবে। ছাগল চরানো মেয়েটি এই ফুলটি তুলবার পরই রাজপুত্র তাকে বিয়ে করেছিল। তৃতীয়তঃ গল্পটিতে আর একটি বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে সেটি হচ্ছে রূপান্তর লাভ (Transformation)। ঐন্দ্রজালিক উপায়েই হোক আর কোন মানুষের দুষ্ট প্রচেষ্টায় হোক মানুষ অনেক সময় পশুতে, জীব বা নির্জীব বস্তুতে রূপান্তর লাভ করে। পৃথিবীর সমস্ত লোক-কথার এটি একটি সুপরিচিত অভিপ্রায়। এই গল্পটিতে রাজপুত্রের বধূ শাশুড়ীর দুষ্ট ইচ্ছায় সর্প ভক্ষণ করানোর ফলে সর্পে রূপান্তর লাভ করেছিলো। পরে রাজপুত্রের সাহসিকতায় তার সর্প জীবন থেকে মুক্তিও সম্ভব হয়েছিলো। পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত দহমুণ্ডার এই লোককথাটি তাই নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

Supernatural birth motif বা অপ্রাকৃতিক জন্মলাভের অভিপ্রায় বাংলা দেশের লোককথার একটি সাধারণ অভিপ্রায়। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার দহমুণ্ডা গ্রামথেকে ১৯৬৬সালে সংগৃহীত একটি গল্পে একটি নেউলরূপী রাজপুত্র কিভাবে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলো তার একটি সুন্দর কাহিনী পাওয়া গেছে। সাতরানীর মধ্যে ছোটরানীর গর্ভে নেউল-সন্তান জন্মলাভ করল এবং সেই অবজ্ঞাত নেউল-সন্তান কিভাবে সমস্ত বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল এই উপাখ্যানটি তারই একটি সার্থক উদাহরণ। গল্পে যদি মানুষ ও পশুর পাশাপাশি অবস্থান দেখা যায় বা তাদের আচার-আচরণের সাম্য পরিলক্ষিত

হয় তাহলে তাদের উপকথারই শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। গল্পটি এই : এক যে ছিল রাজা। তার সাত রানী, কিন্তু কারুরই কোন ছেলেপুলে ছিল না। একদিন রাজা বিদেশে গেলে সেখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হয়। রাজা বললেন আমার কোন ছেলেপিলে নেই; তখন ব্রাহ্মণ একটা আমগাছ দেখিয়ে বলল যে এক ঢিলে যদি আম গাছ থেকে সাতটা আম পড়ে এবং সেই আম যদি রানীদের খাওয়ানো যায় তাহলে রানীদের ছেলে হবে। রাজা ঢিল মেরে সাতটা আম পাড়লেন এবং সাতটা আম রানীদের খেতে দিলেন। ছয়রানী একটা করে আম খেল, কিন্তু ছোট রানী মশলা বাটছিলো তাই আমটি রান্না ঘরে রেখেছিল। এমন সময় এক নেউল এসে সেই আমের কিছু অংশ খেয়ে গেল। তারপর ছোটরানী সেই আমটি খেল। কালে সাতরানীই গর্ভবতী হলেন। ছয় রানীর ছেলে হলো আর ছোটরানীর গর্ভে হলো এক নেউল। নেউল দেখে ছোট রানী খুব কাঁদতে থাকলে, তখন নেউল বললো, 'মা তুমি কিছু ভেবো না, আমি ছোট হলে কি হবে, আমি সব কাজ করতে পারি'। বার বছর পরে ছয় রানীর ছয় ছেলে বললে আমরা মামাবাড়ী যাব'। তখন নেউল বলল, 'আমিও মামার বাড়ী যাব'। মাকে বলল, 'তুমি চিতই পিঠে করে দাও, আমি রাস্তায় খেতে খেতে যাব। সাত রানীর সাত ছেলে মিলে মামার বাড়ী গেল। নেউল রাস্তায় চিতই পিঠে খেতে খেতে বেনাগাছের নীচে দেড়টা পিঠে রেখে দিল। পথে যেতে যেতে একটা আমগাছ দেখতে পেলে, তাতে বেশ আম পেকে রয়েছে। ছয় ভাই আগে এসেছে আম গাছের নীচে আর নেউল ওদের পিছনে পিছনে এসে হাজির হয়েছে। ছ'ভাই বললে—'নেউল, আমগাছে উঠে আম পেড়ে দে'। নেউল তখন তরতর করে গাছে উঠে গিয়ে পাকা পাকা আমগুলো নিজে খেল এবং কাঁচা কাঁচা আমগুলো সবাইকে নীচে ছুঁড়ে দিতে লাগলো। তখন সকলে বলল, 'নেউলভাই, তুই পাকা পাকা আমগুলো খেলি আর আমাদের কাঁচা আমগুলো

দিলি ; দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি'। এই কথা বলে নেউলকে আম গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে ছ'ভাই চলে গেল। আবার পথে যেতে যেতে একটা জামগাছ পড়লো, তখন ছ'ভাই ভাবলো—যদি নেউল সঙ্গে থাকতো তাহলে জাম পেড়ে খাওয়াতো। এদিকে নেউল বাঁধন ছিঁড়ে জামগাছের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে নিজে পাকা জামগুলি খেল, আর কাঁচা জামগুলো নীচে ফেলে দিল। নেউলকে তারা আবার বেঁধে রেখে চলে গেল। পথে কলা বাগান পড়ল। নেউলও বাঁধন ছিঁড়ে ঐদিকে এসে হাজির। নেউল পাকা কলা খেল, কাঁচাগুলো নীচে ফেলে দিল। নেউল আবার বাঁধা পড়ল। তারপর ছ'ভাই মামার বাড়ীর পথে যাত্রা করলো। যেতে যেতে পথে পড়লো এক নদী। তখন তারা ভাবল যে যদি নেউল থাকতো তাহলে নৌকা এনে পার করে দিত। এমন সময় নেউল বাঁধন ছিঁড়ে দাদাদের পিছনে পিছনে নদীর কাছে এসে পড়ল এবং নৌকা এনে সবাইকে নদী পার করে দিলে, সকলে মামার বাড়ী পৌঁছুলো। সেখানে তারা সাতদিন রইল, ছ'দিনের দিন নেউলের দিদিমা বলল 'সবাই তো হাতী ঘোড়া নিয়ে যাবে, তুই কি নিয়ে যাবি'? নেউল বলল, 'আচ্ছা কাল বলব'। এমন সময় নেউল-এর মামা ছোট ছেলেটাকে নেউলের কাছে দিয়ে বললো, নদীর ধারে মলত্যাগ করিয়ে নিয়ে আসতে। নেউল ছেলেটাকে নদীর ধারে নিয়ে যেয়ে ভয় দেখালো, 'তুইযদি মলত্যাগ করিস ত প্রস্রাব করবি না আর প্রস্রাব করলে মলত্যাগ করবি না'। ছেলেটা ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এল। নেউল বাচ্ছাটাকে বলল, 'দিদিমা কোথায় টাকা সরিয়ে রেখেছে যদি তুই বলিস তাহলে আর ভয় দেখাবো না'। ছেলেটা বলল, 'আই তুলসীগাছের নীচে টাকাগুলো রেখেছে'। রাত্রিবেলা নেউল তুলসী গাছের নীচ থেকে টাকাগুলো তুলে ফুল পাতার সঙ্গে একটা বুড়ো ছাগলকে খাইয়ে দিল। পরের দিন সকালে যখন দিদিমা বলল,'তুই কি নিবি'। নেউল বলল, 'আমি ঐ বুড়ো ছাগলটা নেবো'। নেউল সেই বুড়ো ছাগলটা নিয়েই রওনা

হলো। বাড়ীর পথে বেনাগাছের নীচে রাখা দেড়খানা চেতই পিঠে ততক্ষণে সোনা হয়ে গেছে। সেই দেড়খানা চেতই পিঠে নিয়ে নেউল বাড়ীর পথে রওনা হলো। বাড়ীর কাছে এসে দূর থেকে নেউল মাকে চীৎকার করে বলল, 'মা দরজার সামনে একটা পাটী আর লাঠি এনে রাখ'। বাড়ীর সামনে নেউল ছাগলটাকে পাটীর উপরে রেখে লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো। ছাগলের পিছন দিয়ে তখন সোনার টাকা পড়তে লাগলো। আর ভাইগুলি সেই দেখে বলল,'ছাগলটা আমাদের'। তখন নেউল ছ'টাকায় ছাগলটা বিক্রি করে দিল। তখন তারা পাটায় রেখে ছাগলটাকে পিটতে কেবল একটা টাকা পড়ল মাত্র আর ছাগলটাও মারা গেল। ছ'ভাই জিজ্ঞেস করলে সোনার চেতই পিঠে কি করে পেলি? নেউল বলল, বেনাগাছের নীচ থেকে। তখন ছ'ভাই বেনাগাছের নীচে চেতই পিঠে রেখে এল এবং সাতদিন পরে যেয়ে দেখলো পিঠে সোনা হয়নি। তখন ওরা সবাই মিলে নেউলের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। নেউল তখন তার মাকে কিছু ভাবতে বারণ করে ঘর পোড়া ছাই বস্তায় পূরে কৌশলে সোনার কারবারীদের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি করে নিল। ছ'ভাই জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় এত সোনা পেলি'। নেউল বলল ঘর-পোড়া ছাই থেকে। তখন ছ'ভাই নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে এবং সেই ছাই নিয়ে বিদেশে গেল। কিন্তু কেউ-ই সেই ছাই কিনল না। তখন সবাই ফিরে এসে নেউলকে বস্তায় বেঁধে নদীর জলে ফেলে দিল। এক রাখাল গরু চরাচ্ছিল সে এসে নেউলকে জল থেকে তুলে বাঁচালে। নেউল তখন বললে, 'আমাকে তুললে কেন? বেশ ত ছিলাম'। রাখাল সে কথা শুনে বলল, 'আমাকে ফেলে দাও ত! দেখি কেমন বেশ ছিলে'। নেউল তাই করল এবং তার গরুগুলো নিয়ে ফিরে এল। তখন ছ'ভাই জিজ্ঞেস করল গরুগুলো কোথায় পেলি। নেউল সব কথা খুলে বলতে ছ'ভাই বলল তাহলে আমাদেরও জলে ফেলে দে আমরাও গরু নিয়ে আসব। তারপর নেউল তাই করল এবং তাদের সমস্ত রাজত্ব

নিয়ে ছয় মাকে বোঝাল, 'দাদারা আমাকে রাজত্ব করতে বলেছে। ওরা কিছুদিন পরেই গরু নিয়ে আসবে'। এ কথা বলে নেউল সুখে রাজত্ব করতে লাগলো।

উপরোক্ত উপকথাটিতে একটি নেউল-পুত্রের বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য বিকাশের যে পরিচয়টি উপস্থিত হয়েছে তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। গল্পটির অভিপ্রায় বিচার প্রসঙ্গে দেখা যায়, প্রথমতঃ আম খেয়ে সাত রানী পুত্রসন্তান লাভ করেছে। বন্ধ্যা রানীরা আম্রফল ভক্ষণের ফলে সন্তানসম্ভবা হয়েছে। Stith Thompson-এর লোক-কথার বিভাগ অনুযায়ী এটি magic remedies for barrenness (591·1) অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। অলৌকিক উপায়ে পুত্রলাভ এবং সন্তান-সম্ভবা হওয়া একটি আদিম বিশ্বাস; যা পরবর্তী ক্ষেত্রে লোক-বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। বাংলা দেশের আজও বহু বন্ধ্যানারী অলৌকিক উপায়ে সন্তান কামনা করে থাকে এবং এটি তাদের দৃঢ়বিশ্বাস অলৌকিক উপায়ে সন্তানলাভ সম্ভব। এই আদিমতম লোক-বিশ্বাস যা আজও বৈজ্ঞানিক যুগের সমাজ-মানসে বিদ্যমান, বাংলা তথা পৃথিবীর লোক-কথার মধ্যে—তার আদিমতম রূপটি লুক্কাইত আছে। বর্তমান গল্পে ছোটরানীর আমটি নেউলে ভক্ষণ করে গিয়েছিলো বলে তার সন্তান নেউল-রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল।

দ্বিতীয়তঃ তাই বলা চলে animal child বা পশুসন্তান এই গল্পটির আর একটি অভিপ্রায়। মনুষ্য মাতার পশুসন্তানের জন্মদান কেবল বাংলা দেশের লোক-কথায় নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোক-কথার একটি সাধারণ এবং সুপরিচিত অভিপ্রায়। অভিধানে তাই বলা হয়েছে: 'Children in the form of animals, either real animals, transformed human beings, or mesquerading gods, born to human mothers : a concept found in the folk-lore, folk-tales and mythology of many peoples all over the world. Often the animal children result from a beast marriage; the ideas are intimately

connected. But the principal significance of the animal children theme is rather in the direction of etiology and totemism'. [ibid. pp. 59]। বিকৃত, বিকলাঙ্গ এবং বীভৎস সন্তান প্রসব থেকেই সাধারণতঃ এই বিষয়ক ধারণার উৎপত্তি। অনেক সময় টোটেম ও উপজাতিগত নানা বিশ্বাসও এই প্রসঙ্গের ধারণাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। নারীকর্তৃক পশুপক্ষী জন্ম-অভিপ্রায়টির (women gives brith to animal) লোক-কথায় অনুপ্রবেশ একটি আদিমতম লৌকিক বিশ্বাসের ফল। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার দহমুণ্ডা গ্রাম থেকে সংগৃহীত এই গল্পটি সেই আদিম বিশ্বাসকে ধারণ করে রয়েছে।

তৃতীয়তঃ এইসব পশুসন্তান সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে জয়যুক্ত হয়েছে। এই অভিপ্রায়টিকে বলা চলে অক্ষম নায়কের বিজয় (Success of unpromising hero L 160) গল্পটি নেউল সন্তান তার অন্যান্য ভাই ছয়জন মনুষ্য সন্তানকে নানাভাবে পরাস্ত করে বহু ধনরত্ন এবং সুখসম্পদের অধিকারী হয়েছে। এরকম অক্ষমকে জয়যুক্ত করার পিছনে অক্ষমতার প্রতি সান্ত্বনা দেওয়ার মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে।

ডাইনীবিদ্যা (witch craft), মন্ত্রশক্তি, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, ভূত-প্রেত, প্রেতাত্মার অলৌকিক কার্যাবলী, ওঝার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দৈব ও অনৈসর্গিক বস্তুর প্রতি অহেতুক ভক্তি—এগুলি সমস্তই আদিম বিশ্বাসের (primitive belief) ফল। আদিম যুগে মানুষের নানা প্রাকৃতিক ও অনৈসর্গিক ক্রিয়া-কলাপ বিস্ময় ও ভীতির সৃষ্টি করত। অকারণ জলোচ্ছ্বাস, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত, ভূকম্পন, অন্ধকারের বিভীষিকা, ঝড়ের গর্জন ও বৃষ্টির জলধারা, এ সমস্ত কিছু আদিম মানুষের কাছে রহস্যময় ও ভীতিময় ছিল। মৃত্যুর পর মানুষের প্রেতাত্মা কোথায় যায়, দেহ ভস্মীভূত হলেও নিশ্চয়ই দুষ্ট মানুষের আত্মা কোথাও লুকিয়ে থাকে এবং সেই প্রেতাত্মা মানুষের অনিষ্ট করার চেষ্টা করে ; এ'সমস্ত আভ্যন্তরীণ

ভয়ই উপরোক্ত নানা অলৌকিক ভীতিকারী ধারণার সৃষ্টি করেছে। আদিম জাতির মধ্যে এসব নিয়ে যে কত কথা উপকথার সৃষ্টি হয়েছে তার সীমা-পরিসীমা নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিষেধক হিসেবে আবির্ভাব হয়েছে ডাইনী, ওঝা, গুণিনের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, ডাকিনী বিদ্যা ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ঐন্দ্রজালিক শক্তি-সম্পন্ন মানুষ ও তাদের নানা অলৌকিক ও অনৈসর্গিক কার্যাবলী। আদিম মানুষের কল্পনায় ক্রমশঃ দেখা দিল প্রেতের রাজ্য (the land of dead), ভূত-দানা-দৈত্য (demon), রাক্ষস (ogre), প্রেতাত্মা (evil sprit) শয়তান (satan), দানব (giant or monster) ইত্যাদি সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম ও পদবীধারী নানা অপ্রাকৃতিক জীব। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এ ধারণাও মনে এল যে ঐসব দৈত্য-দানা-ভূত-প্রেতের কাছে মানুষ অসহায়। সুতরাং আদিম মানুষের কল্পরাজ্যে এক বিভীষিকাময় অনাবিষ্কৃত জগৎ সৃষ্টি হলো। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার আদিবাসী-প্রধান অঞ্চলে গ্রাম্য মানুষের মধ্যেও এই আদিম বিকাশ ও সংস্কার সংক্রামিত হয়ে কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পকাহিনীর সৃষ্টি করেছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার সন্নিহিত প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত দুটি লোক-কথা উপস্থিত করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রথম গল্পটি এই : সাত সদাগর ভাই আর এক বোন। সদাগরেরা বোনকে খুব ভালবাসে। সাত ভাই একদিন বাণিজ্যে গেল, যেতে যেতে পথে পড়লো এক ইন্দ্রপুরীর রাজ্য। ডাইনীরা সেখানে সুন্দরী মেয়ে সেজে থাকে। সুন্দরী মেয়েদের দেখে সাতভাই সাতকন্যাকে বিয়ে করে দেশে ফিরে গেল। বোন তো বৌদের বরণ করে ঘরে তুললো। এদিকে বৌরা বোনকে দেখতে পারে না। তাকে সারাদিন খাটায়। দেখে শুনে সাত ভাই বোনের বিয়ে দিল দূর দেশে। বোন কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল। দিন যায়, মাস যায়, ভাইরা কাঁদে বোনের জন্যে ; কিন্তু দেখতে যেতে পারে না। কারণ, দিনের বেলা ডাইনীবৌরা

তাদের মাছ করে রাখে। একদিন তারা ভাবলো আর তো বোনকে না দেখে থাকতে পারে না। মাছের বেশ ধরেই যাই। নদী দিয়ে তারা যেতে লাগলো। বোন নাইতে এসেছে নদীর ঘাটে, এমন সময় দেখে সাতটা মাছ তার চারপাশে ঘুরছে। বোন মাছগুলোকে চুপড়ি করে তুলে নিয়ে এলো বাড়ীতে। যেই কাটতে যাবে অমনি মাছগুলো বলে উঠলো, 'কেটো না বোন, আমরা তোমার ভাই।' বোনের আর মাছকাটা হলো না। সে সব কথা শুনলো। তারপর কাঁদতে কাঁদতে চুপড়ি শুদ্ধই মাছগুলোকে তুলে রাখলো।

এদিকে শাশুড়ীর খুব সন্দেহ হলো বৌ মাছ কাটলো না কেন ? বৌ পরদিন যেই ঘাটে গেছে অপনি সে মাছ গুলোকে কেটে রেঁধে ফেললো। এদিকে বৌ ঘাট থেকে ফিরে এসে সব শুনে কাঁদতে লাগলো। তারপর যেখানে আঁশ ফেলা হয়েছে সেখানে ছুটে গেলো। গিয়ে দেখে সাতটা পদ্ম ফুটে আছে। বোন কাঁদতে লাগলো। এমন সময় এক সাধু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো। সে এক হাঁড়ি মন্ত্রপড়া জল বোনটিকে দিয়ে বললো, 'এক নিঃশ্বাসে এই জল তুমি সাতটা ফুলের গায়ে যদি ছিটিয়ে দিতে পারো তাহলে তোমার ভাইরা আবার মানুষ হবে'। বোন কিন্তু তা পারলো না। তখন সাতটা ফুল সাতটা বিরাট বিরাট কুমীর হয়ে নদীতে চলে গেলো তাই দেখে তাদের বোন খুব কাঁদতে লাগলো।

উপরোক্ত গল্পটির মূল অভিপ্রায়গুলি যথাক্রমে ১। Transformation বা রূপ পরিবর্তন, ২। Magic বা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, ৩। Reincarnation in plant (tree) growing on grave (E 631) বা মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর ফুল গাছের জন্ম। এগুলি ছাড়াও অন্য যে অভিপ্রায়টি এখানে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা হচ্ছে ডাইনী বিদ্যা witch-craft. পূর্বেই বলা হয়েছে ডাইনী কিংবা ডাইনীতন্ত্রে বিশ্বাস—একটি আদিম সংস্কার মাত্র। পরবর্তী যুগে যা সাধারণ গ্রাম্য মানুষের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। এইসব ডাইনী

সম্পর্কে তাদের ধারণা, এরা নানা অলৌকিক বিদ্যার অধিকারী, এরা মৃতব্যক্তির জীবন দান করতে পারে, জীবিত ব্যক্তিকে মৃত করতে পারে, ইচ্ছামত মন্ত্রপূত জল প্রয়োগ করে যে কোন মানুষ ও জীবকে এরা যথাক্রমে জীবজন্তু ও অচেতন বস্তুতে রূপান্তরিত করতে পারে, এরা শূন্যমার্গে অবাধে বিচরণ করতে পারে, ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানোর সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে, এরা মানুষের কাঁচা মাংস খায়, মানুষের রক্ত চুষে মানুষকে নির্জীব এবং পরিশেষে মৃতে পরিণত করে। এসম্পর্কে বলা হয়েছে : 'A person who practices sorcery ; a sorcerer or sorceress ; one having supernatural powers in natural world, especially to work evil, and usually applied to both men and women, but now generally restricted to women.' [ibid pp. 1179]। অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তি ডাইনী বিদ্যা বা ডাকিনী বিদ্যা আয়ত্ত করতো, যারা অপ্রাকৃত ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতো বিশেষ করে মানুষের অনিষ্ট করতো তাদেরই ডাইনী বা ডান বলা হতো। এবং এই বিশ্বাস যে আদিম যুগ থেকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজও সমাজ জীবনে বর্তমান তারও সমর্থন পাওয়া যায় যখন বলা হয় : 'Belief in witches exists in all lands, from earliest times to the present day. The wise women and medicine man of primitive societies, the learned pagan priestess, and the divinities of early religion became, through the influence of christianity or the modification of folk tradition, the malignant, accursed witches and sorcerers of the Middle Aages and later folk belief. [ibid]। ডাইনীর বিশ্বাস পৃথিবীর সব দেশেই আদিম যুগ থেকে বর্তমান যুগে প্রবাহিত। জ্ঞানী, স্ত্রীলোক এবং আদিম সমাজের ঔষধ প্রদানকারী চিকিৎসক, জ্ঞানী সর্বজ্ঞ নারী পুরোহিত খৃষ্টীয় ধর্মের মধ্য দিয়ে অথবা লৌকিক

ঐতিহ্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের এই অভিশাপ রূপ এই ডাইনিদের আবির্ভাব হয়েছে এবং পরে তা লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে স্থিতিলাভ করেছে।

আমাদের দেশের উপজাতিদের মধ্যে ডাইনী বিদ্যা কিরূপ প্রচলিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি আলোচনা থেকে। তিনি বলেন : 'ওঁরাও জাতির ডাইনীগণ ব্যক্তি কিংবা সমাজের অনিষ্ট সাধন করিবার উদ্দেশ্যে নানা গোপন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে চারিটির কথা স্বর্গত রায় উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন শান 'নাশণ' নামক ভৌতিক পুঁটুলির ব্যবহার; ঐন্দ্রজালিক বাণ বা মায়া বাণের প্রয়োগ; ঐন্দ্রজালিক উপায়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির 'কলিজা' (heart) উৎপাটন ; চোর দেওয়া, বা কালো বিড়ালের রূপে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহার পিছনে ছায়ার মত লাগিয়া থাকা ইত্যাদি।' এসম্পর্কে তাঁর আরও মন্তব্য : "পশ্চিম বাংলার অন্যতম উপজাতীয় প্রতিবেশী সাঁওতাল জাতির মধ্যেও ডাইনী কলা বিষয়ক প্রবল বিশ্বাস বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। একজন সাঁওতাল সর্দার জনৈক ইংরেজ অনুসন্ধান-কারীর নিকট আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছে, 'ডাইনীরাই সাঁওতালের সকল দুঃখের মূল; তাহাদের জন্যই আমরা পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করি, যদি এ সংসারে ডাইনী না থাকিত তাহা হইলে আমরা কত সুখীই না হইতাম'।" ['লোক-শ্রুতি', প্রথম সংকলন, July'67 পৃষ্ঠা ৫২-৫৩]।

ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতীয় আদিম বিশ্বাস কিভাবে গ্রাম্য মানুষের লোককথায় সংক্রামিত হয়েছে তার সার্থক উদাহরণ পাওয়া যায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি গল্পটিতে। দেখা যায় সাত সদাগর কিভাবে সুন্দরীর বেশধারী যুবতী ডাইনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাদের বিয়ে করে নিয়ে এসে বিপদে ফেলেছে এবং ঐ সুন্দরীর রূপধারী ডাইনীরা কিভাবে তাদের মনুষ্য থেকে মৎস্যে পরিণত করে রেখে তারই এক

বিয়োগান্তক কাহিনী গল্পটিতে—উপস্থিত হয়েছে, ডাইনীদের মন্ত্রশক্তি কিরূপ-ভয়ঙ্কর তাদের মাছরূপেই বোনকে দেখতে যাওয়ার ঘটনাটিই প্রমাণ করে। তাদের মৎস্য জীবন থেকে পরিত্রাণ নেই—একথা বুঝতে পেরেই তারা অসহায় ভাবে ভাসতে ভাসতে বোনের শ্বশুর বাড়ীর ঘাটে উপস্থিত হয়েছিল।

ডাইনীরা যে কত রকম ছলকলা, গুপ্তবিদ্যা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্রশক্তির অধিকারী তার উদাহরণ পাওয়া যায় পৃথিবীর তাবৎ লোককথায়, কাহিনীতে ও লোক-বিশ্বাসে। উদাহরণ স্বরূপ একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে : 'World folk-lore almost universally reports them as having the following powers : divination, in vulnerability and superlative strength, transformation of self or others (Circe beauty and the beast, the six swans of Grimm), ability to fly, power to become invisible or cause other to become so, ability to impart animation to inanimate objects, to produce at will anything required, knowledge of drugs to produce love, fertility, death etc., and, invariably, power over others through charms and spells,' (Ibid. pp. 1179]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই সব ডাইনীদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যার দ্বারা তারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে না পারে। এমন কি ডাইনী সম্পর্কে এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে তারা মানুষের রক্ত শোষণ করে তাকে প্রথমে নির্জীব এবং পরে মৃতে পরিণত করে। মনুষ্য-রক্ত শোষণকারী এই ডাইনীর সম্বন্ধে একটি গল্প পাওয়া গেছে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত ডোমজুড়ি নামক একটি গ্রাম থেকে। সেখানে দেখা যাবে কি ভাবে ডাইনি মা ছেলের দেহ থেকে রক্ত শোষণ করে নিচ্ছে এবং কাহিনীর শেষে দেখা যাবে মায়ের রক্ত শোষণের পর ছেলেটি মারা গেছে।

গল্পটি এইঃ একটি বাড়ীতে একটি লোক, তার বৌ আর মা থাকতো। এই তিনজন ছাড়া একজন মজুর থাকতো। শাশুড়ী ও বৌ ছিল ডাইনী। একদিন বাড়ীতে পিঠা তৈরী হলো। সমস্ত পিঠাই সেই লোকটি আর মজুরটি খেয়ে ফেলেছে। বৌ কেবলই বলে কি খাব, কি খাব; শাশুড়ীও বলে কি খাব। তখন ছেলেটার দেহ থেকে তার মা রক্ত শুষে খেয়ে নিল একটা খড় দিয়ে। এখন মজুরটা সবই দেখেছে। সে ভাবল যে এবার হয়ত তার দেহ থেকেও রক্ত শুষে নেবে। তাই ভয়ে সারা রাত্রি সে আর ঘুমালো না।

সকাল হলো। লোকটি তার মজুরকে বললো তার সঙ্গে সে যাবে। মজুর বলল, তুমি গিয়ে কি করবে। তখন সেই লোকটি বলল যে তার গায়ে বড় ব্যথা হয়েছে, কিন্তু কেন হয়েছে তা সে বুঝতে পারছে না। মজুরটি তখন বলল যে তার একটা কথা আছে, বলতে কিন্তু সে ভীষণ ভয় পাচ্ছে। তার মনিব তাকে অভয় দিয়ে বলল যে তার যা বলবার আছে তা সে বলতে পারে, কোন ভয়ের কারণ নেই। তখন মজুরটি তাকে সব কথা খুলে বলল, এবং তার ঘরে আর থাকতে রাজী হলো না। একথা বলে সে চলে গেল, আর সেই লোকটিও মরে গেল। মজুরটির এর পর আর নাগাল পাওয়া গেল না। [ডোমজুড়ি গ্রাম থেকে ১৯৬৬ খৃঃ সংগৃহীত]

উপরোক্ত লোক-কথাটি অতি সাধারণ ধরণের গল্প কথা হ'লেও পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রান্তবর্তী গ্রাম থেকে প্রাপ্ত এই উপকথাটিতে ডাইনী বিশ্বাসের যে আদিম সংস্কারটি লুকিয়ে আছে তা এবং কি ভাবে সমাজ জীবনে বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। তবে এই বিশ্বাসের আবির্ভাব যে আদিম সমাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বন-জঙ্গল—উঁচু নিচু ঢিলা—পাহাড় —রুক্ষ কঠোর ধূ ধূ প্রান্তর--শুষ্ক শিলাময় নদনদী। তারই মাঝখানে কিছু আদিম উপজাতি ও নিম্নবর্ণের গ্রাম্য মানুষ।

তার সঙ্গে আছে তাদের কিছু কুসংস্কার, আদিম বিশ্বাস ও অনৈসর্গিক ভীতি। এ সমস্ত নিয়েই গড়ে উঠেছে—সীমান্ত বাংলার লোক-প্রকৃতি (Folk-Nature)—যা সৃষ্টি করেছে অসংখ্য গল্পকথা, রূপকথা, কাহিনী, ইতিকথা ও পুরাকথার বিরাট অধ্যায়। সেই বিরাট অধ্যায়েরই কছু ইতিবৃত্ত দেওয়া হলো। এই আলোচনা অংশে।

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এই বিরাট প্রান্ত জুড়ে পাশাপাশি বাস করে—আদিবাসী শবর-লোধা-সাঁওতাল-মালপাহাড়ী-ভূমিজ অন্যদিকে নিম্ন বর্ণের হিন্দু মাহাতো পদবীধারী কূর্মক্ষত্রিয়, হাড়ি, ডোম, বাউরী জোলা প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের দল। ফলে এক মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে এই সব শালবনের প্রান্তরে, মহুয়া বৃক্ষের আনাচে-কানাচে পাহাড়ের গুহায়, কয়লা কালো পাথুরে মাটীর স্থানে অস্থানে। শাল-বট-অশ্বত্থ গাছের নীচে এদের গোরাম-দেবতা, বড়াম, ক্ষেত্রপাল, ওলাই চণ্ডী, ছুটামূল, ঘাগর বুড়ি, গুহ কালী, খুদাই চণ্ডী ভিরকু নাথ ইত্যাদি নানা লৌকিক মিশ্র দেবতার অধিষ্ঠান। দু' একটি ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি, তা সিন্দূর দ্বারা বিশেষভাবে চর্চিত, কিছু লাল মাটীর পোড়া পোড়া এবং কন্ধকাটা ও হস্তপদহীন পুতুল। প্রায় সব গেরাম দেবতার থানই এক প্রকারের। এই গেরাম দেবতাকে কেন্দ্র করেই নানা বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, নানা সংস্কার ও কুসংস্কার। এরা ভূত-প্রেত-দৈত-দানা-ডান-ডাইনী সব কিছুতেই বিশ্বাস করে। সুতরাং পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার উপকথায় ডাইনী বিশ্বাস থাকবে সে আর আশ্চর্যের কি? ডাইনী বিশ্বাস যে কেবল এদের লোক-কথাকেই কেন্দ্র করে প্রচলিত তা নয়, এদের ধর্মীয় বিশ্বাস (religious belief)-এর সঙ্গেও ডাইনীতন্ত্র (witch-craft) জড়িত তার একটি বিবরণ পাওয়া ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'লোকশ্রুতি' গ্রন্থের 'বাথান ডাইন' নামক একটি গ্রাম্য দেবতার পূজা বর্ণনায়। 'গ্রামের এক প্রান্তে দুই তিনটি সাধারণ বৃক্ষের নীচে এই গ্রামের গ্রাম দেবতা অবস্থান করিয়া

থাকেন। দেবতার নাম বাথান ডাইন। নামটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। তাহাতে ডাইন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাথান বা গোচারণ ভূমির কল্পিত ডাইনি সম্ভবতঃ গো-মহিষ রক্ষার জন্য বহু পূর্বে দেবত্বে পরিণত হইয়া বৃক্ষতলে গ্রামবাসীর পূজা পাইতেছেন। দেবস্থানটি আড়ম্বরহীন, দু' একটি প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে, মনে হয় বার্ষিক পূজার সময় তাহারা সিন্দূর লিপ্ত হইয়া থাকে, বর্তমানেও তাহার সামান্য চিহ্ন দেখা যায়। বাৎসরিক এক বারেই পূজা হয়, 'পৌষ-সংক্রান্তির সময়' সর্দার উপাধিধারী ভূমিজ জাতীয় অস্পৃশ্য লোক ইহারও পূজারী। বাৎসরিক পূজার সময় গ্রামের বারোয়ারী মুর্গী, পাঁঠা পায়রা ও ব্যক্তিগত মানসিক রূপে এই সকল পশুপাখী বলি হয়।' [লোকশ্রুতি, পৃষ্ঠা ১১১]।

সুতরাং যেখানে গ্রাম্য দেবতার জায়গায় ডাইনীর পূজা পর্যন্ত প্রচলিত সেখানে এ অঞ্চলের গল্প উপকথায় ডাইনীর আবির্ভাব হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কি। কেবল পশ্চিম-সীমান্ত বাংলাতেই নয়, সমস্ত বাংলা দেশেই গ্রাম্য মানুষের মধ্যে, গ্রাম্যসমাজে ভূত-প্রেত-দৈত্য-রাক্ষস ইত্যাদি সম্পর্কে কুসংস্কার প্রচলিত আছে। শ্যাওড়া গাছে পেত্নীর অবস্থান, বাঁশবনের অন্ধকারে ভূত বসবাস করে, মাঝে মাঝে পেত্নী বা ভূত রাস্তার মাঝামাঝি কোন জায়গায় কাঁচা বাঁশ নুইয়ে রাখে যদি কোন মানুষ তাকে অতিক্রম করে বা ডিঙিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠবে এবং মানুষটি মারা যাবে। রক্ত শোষণ ও রক্তপান এই সব ভূত-প্রেত এবং ডাইনী-জাতীয় চরিত্রের প্রধান আনন্দ ও আকর্ষণ। এরকম ধরণের বহু বিশ্বাস বাংলার সর্বত্র গল্পকথায় ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি বাংলা প্রবাদ এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে যার মধ্যে ভূত বা ডাইনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা:

১। ভাঙা ঘরে ভূতের বাসা

২। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ তারে বলি ডান

৩। ভূত আমার পুত, শাঁখচুন্নী আমার ঝি
রাম লক্ষ্মণ মাথায় আছে, করবে আমার কি।

৪। ভূত দিয়ে ভূত ছাড়ানো

৫। ভূতের আবার জন্ম দিন,
পেয়াদার আবার বিয়ে।

৬। ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে,
ভূতবলে আমি পেলাম কাছে।

৭। ভূতের মুখে রাম নাম।

এর থেকেই বোঝা যায় ভূত সম্পর্কিত বিশ্বাসটি গ্রাম্য মানুষের মনে কি ভাবে স্থায়িত্ব লাভ করেছে যার জন্যে ছড়ায়-প্রবাদ প্রবচনে তার প্রভাব যুগযুগান্তর ধরে স্বীকৃত হয়ে আসছে। এই ভূত সম্পর্কিত ধারণাটিই পরে পরে রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য ইত্যাদি অমানুষিক শক্তিধারী কোন জীবে পরিণত হয়েছে বলে অনেক গবেষক ধারণা করেন। Prof Stith Thomspon এর মত: From the belief about and fear of the dead among primitive men have come all sorts of ogre stories. The ogre is nothing but the dead, who has been variously imagined by different people. Whenever we have an ogre and a hero overcoming the ogre we have the dead and the protector against the dead. Fairies, dwarfs, nixes, brownies and all ogres of any kind come from the belief in the living dead. অর্থাৎ আদিম মানুষের প্রেত সম্পর্কিত বিশ্বাস ও ভীতি থেকেই এসেছে সমস্ত রকমের রাক্ষস সম্পর্কিত কাহিনী। রাক্ষস—প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়, মানুষ তার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার সৃষ্টি করেছে মাত্র। আমরা যখনই একটি রাক্ষসকে এবং একজন নায়ক রাক্ষসকে জয় করেছে এরূপ জানিতে পারি তখন সেখানে ভূত বা প্রেতাত্মা থেকে আত্মরক্ষার কথাই মনে হয়। পরী, বামন,

দৈত্য-দানো প্রভৃতি এবং রাক্ষস সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত রকমের ধারণাই এসেছে প্রেতাত্মা বা ভূত থেকে। মৃত সম্পর্কিত যে কোন ধারণাই যে আমাদের—শাঁকচুন্নী, পেত্নী, ভূত ইত্যাদির বিশ্বাস সৃষ্টি করে এর একটি সার্থক উদাহরণ উপস্থিত দেওয়া যেতে পারে, একটি ভৌতিক উপকথা উপস্থিত করে। উপকথাটি এই : এক বামুনের বাড়ীর কাছে একটা গাছে এক শাঁকচুন্নী ভূত থাকত। বামুনের সংসার দেখে তারও সংসার করবার সাধ জাগতো এবং ভাবতো সে যদি বামনীকে মেরে বউ সেজে সংসার করতে পায় তাহলে বেশ হয়। এইসব ভেবে একদিন বামুনের বউকে কোটরে লুকিয়ে রেখে সেই শাঁকচুন্নী বামনীর মূর্তি ধরে বামুনের সংসারে এসে উপস্থিত হলো। এসব কিন্তু বামুন বা তার মা কেউই কিন্তু জানতে পারল না। তবে বউ যেন হঠাৎ পালটে গেছে বলে মনে হতো। আগে বউ আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে কাজ করতো, আর এখন খুব দ্রুত কাজ করে। অন্য দাওয়া থেকে কলসী আনতে বললে সে বিরাট লম্বা হাত বার করে এনে দিত, উঠে আর সেখানে যেতে হত না। শাশুড়ী এসব লক্ষ্য করে ভয় পেয়ে ছেলেকে সব জানালো। একদিন দুজনে দেখলো যে বউ কাঠ না থাকায় নিজের দুখানা হাত উনানের মধ্যে পুরে দিয়ে ভাত রাঁধছে তখন বামুন বুঝতে পারলো যে এ তার আসল বউ নয়, কোন পেত্নী তার বউ হয়ে এসেছে। তখন গ্রাম থেকে সে ওঝা ডেকে নিয়ে এল।

ওঝা তখন সরষে পুড়িয়ে বামুনের বউ-এর নাকের কাছে ধরতেই সে জ্বালায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। কিন্তু কোন কথা প্রকাশ করলে না। তখন ওঝা তার চুলের মুঠি ধরে জুতাপেটা করতে লাগলো। তখন শাঁকচুন্নী নিজের পরিচয় দিল এবং বামুনের বউ কোথায় আছে জানালে বামুন তার নিজের বউকে উদ্ধার করে নিয়ে এল এবং শাঁকচুন্নীকে তাড়িয়ে দিয়ে সুখে ঘর সংসার করতে লাগলো।

ইতিপূর্বে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের ডোমজুড়ি গ্রাম থেকে সংগৃহীত একটি গল্পের সঙ্গে এর মিল লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য সেখানে শাঁকচুন্নীর পরিবর্তে ডাইনীর আবির্ভাব। সেখানে শাশুড়ী ও বৌ দু' জনেই ডাইনী ছিল এবং শাশুড়ী তার নিজের ছেলের রক্ত শুষে খেয়েছিল। কিন্তু এখানে তার পরিবর্তে পেত্নীর সংসার করার সাধ জেগেছিলো এবং নিজে বউ সেজে বামুনের সংসারে এসেছিলো। বাংলা দেশের একটি প্রচলিত গ্রাম্যবিশ্বাস এই যে, কোন নারী বা পুরুষ অল্প বয়সে অতৃপ্ত কামনা নিয়ে মারা গেলে অথবা আত্মহত্যা করলে সে ভূত হয় অথবা সংসার করার জন্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। তাই মনে হয় অতৃপ্ত-আত্মা কোন নারীর মৃত্যুর পরই পেত্নী হয়ে সংসার করার সাধ জাগে এরূপ ধারণাই গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে। এই ভৌতিক বিশ্বাস থেকে হয়েছে ওঝা, গুণিন ইত্যাদি মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন নানা ব্যক্তির আবির্ভাব। ওঝা ভূত-প্রেত কে তাড়াতে পারে, গুণিন জল পড়া দিয়ে যে কোন রোগ সারাতে পারে, নানা অলৌকিকতাকে সম্ভব করতে পারে।

সীমান্ত বাংলার এই প্রান্তবর্তী গ্রামগুলি অরণ্যে ঘেরা এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। এর শালবনের ছায়াময় প্রান্তরে, অশ্বত্থ বৃক্ষের কোটরে, বটবৃক্ষের ঝুরিতে, মহুয়ার মাতাল গন্ধে, বাঁধের ধারে ধারে, ছোট কুটিরে এমন কত অসংখ্য উপকথা লুকিয়ে আছে। এখানে উপকথার রাজা শিয়ালের অসম্ভব চাতুর্য, ব্যাঘ্রের নির্বুদ্ধিতা, এখানে রহস্যময় শালবনে, গেরাম দেবতার স্থানে অসংখ্য অলৌকিক চরিত্রের আনাগোনা। মিশকালো অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ ব-দ্বীপগুলো যেন অন্ধকারের মহাসাগরে ভাসমান থাকে। অন্ধকার শালবনের প্রান্ত থেকে যখন বাতাসের শনশন শব্দে, ঘন অরণ্যের গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ভেসে আসে, যখন জ্যোৎস্না-লোকিত প্রান্তরে শালের ফুল ফোটে, মহুয়ার ফুল চারদিক গন্ধে আমোদিত করে তখন কত অশরীরী আত্মার আবির্ভাব কল্পনা

মনে জাগে। রচিত হয় নানা কথা-উপকথা, কাহিনী-উপকাহিনী। পশ্চিম-সীমান্তের অনুর্বর রুক্ষ শালবনের প্রান্তরে বৃক্ষে বৃক্ষে ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্যের অবস্থান। গ্রামের আনাচে কানাচে ডাক-ডাকিনীর অবস্থান। আর এইসব অপদেবতার আক্রোশের কল্পনায় এরা সদাব্যস্ত। তাই এদের গল্পকথায়, কাহিনী-উপকাহিনীতে রচিত হচ্ছে কত রহস্যময় অশরীরী আত্মার কথা। আবার শরীরী জীবদের নানা চাতুর্য ও নির্বুদ্ধিতার কাহিনী।

চতুর্থ পর্ব

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের ব্রতকথা

॥ **সূচনা** ॥

পৃথিবীর সমস্ত কিছুতেই আত্মার অবস্থান কল্পনা, প্রাকৃতিক বস্তুর অলৌকিক ক্ষমতা ও শক্তির বিশ্বাস থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। এর সমর্থনে বলা যায়: 'It first appeared in tylor's monumental volumes primitive culture (first edition 1871, third edition 1891), when it is shown that at a certain stage of culture men every where attribute a kind of soul to phenomena of Nature—e. g., to trees, brooks, mountains, clouds, stones, stars. Primitve man regarded all he saw as possessing a life like unto his own. [The Philosophy of Religion. P-63 by D. M. Edwards.] আদিম যুগে মানুষ নিজের মত প্রকৃতির সব বস্তুকেই সজীব বলে ভাবতো। গাছ-পালা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, আকাশ-মেঘমালা, শিলা, তারকারাজি—সমস্ত কিছুই আদিম মানুষ জীবন্ত এবং আত্মা সংযুক্ত বলে মনে করতো। বাংলা দেশের ব্রতকথায় আছে এই আদিম বিশ্বাস, কারণ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র ব্রতকথাতেই—বাংলা দেশের আদিম মানুষের সংস্কৃতির কিছু পরিচয় মেলে। আদিম ধর্ম-বিশ্বাস বাংলা দেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কিভাবে প্রকৃতির পূজায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং যা আজও শাস্ত্রীয় পরিবর্তনের মধ্যেও লুপ্ত হয়ে যায়নি তার সমর্থন হিসাবে একটি মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে: 'প্রকাণ্ড একটা ব্রত প্রকরণ না শিখলে শাস্ত্র পুরাণের জট ছাড়িয়ে

আমাদের দেশের হিন্দুধর্মের পুরাণের পূর্বেকার ব্রতগুলির নিখুত চেহারা বার করে আনা কঠিন। তবে ব্রতগুলি যে 'আর্য-পুত্রের এবং আর্য হৃদয়ের ছবি নয়' সেটা ঠিক। আর্যের চেয়ে বরং অনার্যের—অন্যব্রতদের গৃহলক্ষ্মীর পদাঙ্ক এই সব ব্রতের আলপনায়, ছড়ায়, ব্রতকথায় সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনার্য-অংশ শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির মধ্যেও যথেষ্ট রয়েছে এবং সেই অংশগুলোকে হিন্দুপুরাণ ও তন্ত্র-মন্ত্রের আবরণে ঢাকবার চেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু সব সময়ে সে চেষ্টা সফল হয়নি দেখি। [বাংলার ব্রত, পৃঃ ১৯, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর]। উদাহরণ হিসাবে তিনি লক্ষ্মী ব্রতের আলপনা, পূজা-প্রকরণ, আচার উপাচারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, লক্ষ্মী-পেঁচা এবং ধান ছড়া হলো আলপনার প্রধান অঙ্গ। ঘরে যেখানে ধান চাল জিনিষ পত্র রাখা হয় সেই ঘরের মাঝের খুঁটির, মধ্যম থামের গোড়ায় নানা আলপনা দেওয়া চৌকী পাতা হয়, খুঁটির গায়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ, পেঁচা বা পদ্ম, ধান ছড়া, কলমী লতা, দোপাটী লতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা থাকে। চৌকির উপরে ডোল বা বেড়—ডালা ও বিঁড়ে। বেড়ের মধ্যে শুয়োরের দাঁত ও সিঁদুরের কৌটা এবং তার উপরে নানা রকম ফল ইত্যাদিতে পূর্ণ ভাঁড় বা পাতিল। পাতিলের গায়ে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন ও ধান ছড়া। লক্ষ্মী সরার উর্ধ্বে আধখানা নারিকেল মালাই;—মেয়েরা এই মালাইকে কুবেরের মাথা বা মাথার খুলি বলে। যশোহর অঞ্চলে সবার পশ্চাতে একটি শীষ সমেত আস্ত ডাব—সেটিকে ঘোমটা দিয়ে গহনা পরিয়ে সাজানো। একটি কাঠের বেলায় নৌকার প্রত্যেক গলুয়ে নানাবিধ শস্য—ধান, তিল, মুগ, মুসুরি, মটর ইত্যাদি দিয়ে লক্ষ্মীর চৌকির সম্মুখে রাখার প্রথাও আছে। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের মতঃ 'মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, এই কোজাগর পূর্ণিমার ব্রতটির মধ্যে অনেকখানি অনার্য অংশ রয়েছে। শুয়োরের দাঁত—যার উপরে ফলমূল মিষ্টান্নের পাতিল; কুবেরের মাথা—যেটা সব উপরে রয়েছে দেখি; কিংবা সরার

পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি ঘোমটা দেওয়া মেয়ের মতো ডাব—হলুদ-সিঁদুর মাখানো, আর পেঁচা ও ধান ছড়া—এক লক্ষ্মীর বাহন, আর এক লক্ষ্মীর শস্য মূর্তি—এ কয়টিই অহিন্দু ও অনার্য বা অন্য ব্রতদের। [ঐ, পৃঃ ২১]।

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এই বিশাল ভূখণ্ডেই অনার্যরা অনেক দিন পর্যন্ত তাদের ধর্ম, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার নিয়ে বসবাস করেছিলো, আর্যদের আগমনে এরা হিন্দু সমাজের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলেও এদের আচার-আচরণ ধর্ম-বিশ্বাস বহু ক্ষেত্রেই আজও সজীব ভাবে প্রবহমান। ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও আদিম সমাজ পরস্পর পরস্পরের প্রভাবযুক্ত। "স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, 'মুণ্ডাদের বিবাহে সর্বত্র হলুদ মাখিবার রীতি, বর ও কন্যার পক্ষে পরস্পরকে সিন্দুর দান, ধর্মানুষ্ঠানে উপবাস ও স্নানের বিধি ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়"। [নির্মল কুমার বসু। 'হিন্দু সমাজের গড়ন', পৃঃ ৩৬]। আবার তাঁর বক্তব্য অন্যান্য বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য আচারবিধি গ্রহণ করিলেও পাঁচ পরগণার মুণ্ডারা প্রাচীন গ্রাম দেবতার পূজা ছাড়ে নাই। 'স্বীয় জাতীয় ধর্মের অপরাপর দেব-দেবীর পরিবর্তে তাহারা মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে। জুয়াঙ্গা জাতি যেমন লক্ষ্মী দেবীর নামে মোরগ বলি দেয়, ইহারাও তেমনিই মহাদেবের নিকট পশু বলি দিয়া থাকে। [ঐ, পৃ. ৩৮]। সুতরাং এই বিষয়ে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব-বিশারদ নির্মলকুমার বসুর অভিমত: 'জুয়াঙ্গা, শবর অথবা মুণ্ডা, উরাঁও জাতিবৃন্দ কিন্তু অরণ্যের ছায়া পরিত্যাগ করিয়া কয়েক শতাব্দী মাত্র অপরাপর জাতির সহিত অর্থনৈতিক বা সংস্কৃতিগত বন্ধনে সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য আজও বজায় রহিয়াছে এবং লোকাচার বা দেশাচারের কোন কোন অংশ স্পষ্টতঃ পূর্বাবস্থার স্মৃতি বহন করিয়া রহিয়াছে। [ঐ পৃঃ ৫০]

এই আর্য-অনার্য, গ্রাম্য হিন্দু সমাজ ও আদিম সমাজের মিশ্র ধর্মীয় ও সংস্কৃতির সার্থকতম রূপ পাওয়ায় বাংলা দেশের বিশেষ

করে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার ব্রতানুষ্ঠান, ব্রতের ছড়া ও ব্রতকথা-গুলির মধ্যে। করম, ভাদু, টুসু, ভেজা-বিঁধা, ইঁদপরব, বাঁধনাপরবের বিস্তৃত বিবরণ উপস্থিত করলে এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যাবে। ধর্মের Psychical origin and Development প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'the will of self-preservation against the forces of destruction and death, and in its positive aspect, the will to life's joy and fulness and power.' [The Philosophy of Religion. D. M. Edwards Page—65] অর্থাৎ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে মানুষের মৃত্যু ও ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছায়, জীবনের আনন্দলাভ, সমৃদ্ধি এবং শক্তি কামনায়। পুণ্যিপুকুর, অশত্থপাতা ব্রত থেকে শুরু করে যমপুকুর, সঙ্কটা সমস্ত রকম ব্রতানুষ্ঠানেরই একই কামনা। অশ্বত্থ পাতার ছড়ায় ঃ

পাকা পাতাটি মাথায় দিলে, পাকা চুলে সিঁদুর পরে,
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে, স্বর্ণকান্তি রূপ ধরে।
কচি পাতাটি মাথায় দিলে, কোলে পায় নবকুমার,
শুকনো পাতাটি মাথায় দিলে, সুখশান্তিতে ঘর ভরে।

এই 'the will to life's joy, and fulnes and power' চিরন্তন কামনাগুলিই ব্রতকথার মূল। কিন্তু এর আদিমতম উৎসটি কোথায়—'Thus religion is from the first rooted in biological necessity, the struggle for life,' [ibid. p—65] অর্থাৎ বাঁচবার প্রবৃত্তি, জীবনের সংঘর্ষ বা সংগ্রাম প্রভৃতি জৈবিক প্রবৃত্তিই ধর্মের মূল উৎস। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার অধিকাংশ ব্রতানুষ্ঠান আর ব্রতকথায়, ব্রতের গানে ও ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে ধর্ম আবির্ভাবের এই মূলতম প্রকৃতিটি। করম ব্রতকথায় করমের ও ধরমের যে জীবন সংগ্রাম, তাদের যে দুঃখকষ্ট এবং যার জন্যে তারা তুষ্ট করেছিলো করম রাজা বা করমঠাকুরকে তার মধ্য দিয়েই ধর্মের আদিমতম প্রেরণা বা উৎসটি চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

।। এক : ব্রতকথার উৎস ও অভিপ্রায় ।।

পুরাণে আছে, একদিন মহামুনি নারদ নারায়ণের কাছে এসে বললেন, প্রভু, এমন কোন ব্রত আছে যা দিয়ে ঐশ্বর্য যশ ও মহাপুণ্য লাভ করা যায়, তখন নারায়ণ একটি ব্রতের উল্লেখ প্রসঙ্গে একটি গল্প বললেন। গল্পটি এই :

> মহাপবিত্রক্ষেত্র বারাণসী ধামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর দুটি পুত্র ছিল। তাদের নাম ধর্ম ও কর্ম। দুই পুত্রকে সংসারী করে ব্রাহ্মণ বনে চলে গেলেন। ধর্ম ছিল ধার্মিক কর্তব্যনিষ্ঠ। আর কর্ম অধার্মিক ও বিলাসী। ফলে কর্মের দারিদ্র্যের সীমা পরিসীমা রইল না। কিন্তু ধর্মের সংসারে কোন দুঃখ-কষ্ট নেই। সর্বস্বান্ত হয়ে একদিন কর্ম বড় ভাই ধর্মের কাছে এল। এবং দাদার দেখাদেখি মাঠে কাজ করতে আরম্ভ করলো। বাড়ী ফেরার পথে দেখলো একদল লোক করমগাছের পুজা করছে। তাদের কাছ থেকে জানতে পারলো উপবাস করে করম গাছের পুজা করলে ফল-অর্থ সমস্ত লাভ করা যায়। কর্মের বউ ভাদ্র মাসে ব্রত করে পুজা করলো। এবং এই রকম ব্রতের ফলে কর্মের দুঃখ দূর হলো। তারা সুখে ঘর সংসার করতে লাগলো।

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার অন্যতম প্রধান ব্রত করম পূজা সম্পর্কিত এই কাহিনীটি ভবিষ্যপুরাণ থেকে সংগৃহীত। করম-ব্রতের একটি বিরাট লৌকিক কাহিনী বা ব্রতকথা আছে পরে সেটি উপস্থিত করা যাবে। সীমান্ত-বঙ্গের মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশে, বাঁকুড়া পুরুলিয়ার এই বিরাট ভূখণ্ডে আদিবাসী-ভূমিজ-মাহাতো-লোধা-মালপাহাড়ী-সাঁওতাল-ওঁরাও-মুণ্ডা এবং হিন্দুধর্মীয় গ্রাম্য মানুষ হাড়ি-মুচি-ডোম-মাহাতো-কূর্ম-ক্ষত্রিয়-বাগদী-বাউরী ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষের বাস। অসংখ্য পাল পার্বণ বার-ব্রত ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠানে এদের জীবন সজীব, কারণ হচ্ছে এদের 'সাংস্কৃতিক সংকরতা'। এখানে অনার্য ভাষা ও আচার-আচরণ নিয়ে বসবাস করে মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, ভূমিজ হো। পাশাপাশি এদের সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত মালভূঁইয়া, বাগদী-বাউরী শ্রেণীর মানুষ। তাই আদিম জনসমাজের রীতিনীতি আচার-আচরণ ধর্ম-অনুষ্ঠান ইত্যাদির সংযোগে এখানে গড়ে উঠছে এক সংকর সংস্কৃতি (Mixed Culture)। এই সাংস্কৃতিক সংকরতার পরিচয় আছে এখানকার ভাদু ও টুসুগানে, ঝমুর সংগীতে, করম, বাঁধনা, ইঁদপরব, ছাতাপরব ও ব্রতানুষ্ঠানে, তার পরিচয় কাঠিনাচের গানে, 'ছো-নাচে' ধর্ম-শীতলা-শিবের গাজনের উৎসবে। পরিচয় আছে এদের উপকথায়-রূপকথা-ব্রতকথায়। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার রূপকথা ও উপকথার পরিচয় দেওয়া হয়েছে এর পূর্বে, এই পর্বে পরিচয় দেওয়া হবে ব্রতকথার। কোনো এক আদিম উৎস থেকে এই বিচিত্র ব্রতকথাগুলি জন্মলাভ করে এখানকার মিশ্র জনমানসে আজও নানা অভিপ্রায় (Motif) সৃষ্টি করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতকথার উৎস প্রসঙ্গে বলেছেন: 'ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোন ধর্ম বিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত—সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষে বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে,এই হল ব্রত; পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরানো বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও—পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।' ['বাংলার ব্রত', পৃঃ ৯] অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের মতে ঋতু বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাদের বিপর্যয়কে রুখবার চেষ্টা এবং ইচ্ছা থেকে ব্রত ক্রিয়ার উৎপত্তি। উদাহরণ হিসাবে বৈশাখ মাসের ব্রতের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থিত করলেই দেখা যাবে যে প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালের ব্রতগুলির অধিকাংশই জল-সংক্রান্ত এবং উদ্ভিদ-সংক্রান্ত এবং পৃথিবী-সংক্রান্ত। অবশ্য সব ব্রতেরই কামনা একই—ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ। পুণ্যিপুকুর, অশ্বত্থপাতা, অক্ষয় ফল, জলসংক্রান্তি, অক্ষয় ঘট ব্রত উল্লেখযোগ্য। জলসংক্রান্তি ব্রতের কথায় আছে 'মাণ্ডব মুনির স্ত্রী গুণবতী

স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে ছিল, কি ব্রতের ফলে দেহান্তে নরকদর্শন ঘটে না এবং সুশীতল জল পাওয়া যায় আমাকে বলুন।' এই নরক দর্শনের ভীতি অপেক্ষা 'সুশীতল জলে'র প্রার্থনাই পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার বৈশাখ মাসের খরা প্রপীড়িত নর-নারীর অন্যতম কামনা একথা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। বৈশাখ মাসে 'জলসংক্রান্তি-ব্রত' করাই বৈশাখের খরা পীড়িত অঞ্চলের নারীর পক্ষে যে স্বাভাবিক তা বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রাখে না। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যটি যে অত্যন্ত সার্থক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই ব্রতকথার মধ্যে দিয়ে মানব-মানবী তার বিচিত্র কামনা-বাসনা সফল করতে চায়, তা যে পুরাণের চেয়েও পুরানো হবে, বেদের চেয়েও আদিম হবে তা অস্বীকার করা যায় না। এই ব্রতানুষ্ঠানের উৎস ও আবির্ভাব প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন: 'ভারতবর্ষের বাইরে থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যেরা যাদের দেখা পেলেন, তাদের ডাকলেন তাঁরা 'অন্যব্রত' বলে। এটা ঠিক, যে আর্যেরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব 'অন্যব্রত' ছেলেমেয়ে, যুবক, যুবতী, বুড়োবুড়ি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা, কৃষাণ—নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান দেবতা-অপদেবতা কলাকৌশল ভয়-ভরসা হাসিকান্না নিয়ে বাস করছিল। এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এদেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্য এবং না-আর্য বা 'অন্যব্রত'দের মধ্যে সবদিক দিয়ে, এমন কি বিয়েতে এবং ভোজেতেও আদান-প্রদান চলেছিল। পুরাণের দেবদেবীর উৎপত্তির ইতিহাস সেই আদান-প্রদানের ইতিহাস; ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই; কেবল এই মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেইসব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি, যেখানে আমাদের পূর্বতন পুরুষ অন্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। সব-উপরে হিন্দু অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গা মৃত্তিকা, গৈরিক—এমনি সব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর; তারপর বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতুস্তর; তারও তলায়

অন্ত্যব্রতদের এই সব ব্রত একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডারে'। ['বাংলার ব্রত', পৃষ্ঠা ৯]।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী মানস সঠিকভাবেই ধরতে পেরেছিলো যে আমাদের পুরানো জীবন, অর্থাৎ আদিম-জনমানবের ইতিহাস আছে মেয়েদের ব্রতের মধ্যে। ব্রতকথার মধ্যে, তবে তার উপরে আজ দুটো স্তর পড়েছে একটা বৈদিক আচার-আচরণের এবং অন্যটা হিন্দুর শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের। হিন্দুধর্মের আবির্ভাবে লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানের অদল-বদল হলেও এর আদিমতম রূপটি আজও ব্রতানুষ্ঠান ও ব্রতকথায় বিদ্যমান। যেমন 'মেয়েদের ব্রতকথায়' পুণ্যিপুকুর ব্রতের ব্রতফল সম্পর্কে হিন্দুধর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

> কুমারী ও সধবারা এই ব্রত পালন করিবে। কুমারীরা এই ব্রত করিলে সাবিত্রী সমান পতিব্রতা ও অতুল সুখের অধিকারিণী হইয়া থাকে। সধবারা এই ব্রত করিলে পিতৃকুল ও স্বামীকুলের মঙ্গল কারিণী, স্বামীসোহাগিনী ও সুপুত্রবতী হইয়া থাকেন। [পৃঃ ২]

অথচ ঐ গ্রন্থেই দেখা যাচ্ছে ঐ পুণ্যিপুকুর ব্রতের নিয়মাবলী। সেখানে বলা হচ্ছে যে বাড়ীর উঠানের একপাশ বেশ পরিষ্কার করে একটি ছোট চৌকা গর্ত কেটে তার চারদিকে চারটি ঘাট করতে হবে। তার এক ঘাটে একটি শাঁক, আর ঘাটে একটি চন্দন কাঠ, অপর ঘাটে একটি সুপারি, তার পরের ঘাটে একটি সিঁদুর কৌটা দিতে হবে এবং পুকুরের মাঝে একটা তুলসীগাছের সঙ্গে বেলগাছের ডাল বেলপাতাসহ পুঁতে দিতে হবে। আসলে ব্রতফলে হিন্দুধর্মের যাই শাস্ত্রীয় নির্দেশ দেওয়া থাকুক না কেন এই ব্রতটির আবির্ভাব যে আদিমতম জনসমাজ এবং তার লক্ষ্য ঐ প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষা এবং প্রাকৃতিক বৈপরীত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা একথা অস্বীকার করা যায় না। বৈশাখের নিদারুণ উত্তাপে যাতে পুকুরের জল না শুকিয়ে যায়; অত্যধিক গরমে গাছপালা যাতে না মরে যায় এই আদিম কামনাই

পুণ্যিপুকুর ব্রতে প্রকাশ পেয়েছে। তাই সেখানে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া হচ্ছে পুকুরকাটা, পুকুরটি জলে পরিপূর্ণ করা, তাতে বেলের ডাল ও তুলসীগাছ পোঁতা। তারপর মেয়েরা যখন তাদের চিরন্তন কামনা প্রকাশ করে ছড়া কাটে তখনও তারা তাদের সেই আদিমতম কামনাটি প্রকাশ করে, আমার সতীত্ব যেন অক্ষুন্ন থাকে, আমি যেন পুত্রবতী হই, মানুষের যেন কল্যাণ হয় :

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পুজেরে দুপুরবেলা ?
আমি সতী লীলাবতী
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী,
হয়ে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না।

কিংবা

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পুজেরে দুপুরবেলা।
আমি সতী ভাগ্যবতী
সাত ভায়ের বোন পুত্রবতী ॥
ঢালিজল তুলসী বিল্বদলে,
স্বামী-সোহাগিনী হব ফলে ফুলে।
পুণ্যিপুকুরে ঢালিজল
শ্বশুর কুলের হউক মঙ্গল।

এর ব্রতকথাটিও এই : কোন এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রী ও দু' ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে বসবাস করতো। তারা খুব গরীব, ব্রাহ্মণ ভিক্ষে করে যা আনে তাই তারা পাঁচজনে ভাগ করে খায়। এভাবে তাদের দিন কাটছিলো। কিন্তু এও বুঝি তাদের আর সহ্য হ'লো না। 'পর পর ক'বছর অজন্মা হওয়ার জন্যে জমিদারের খাজনার দায়ে মাথা গোঁজবার কুঁড়েটুকুও চলে গেল। ব্রাহ্মণ কি আর করে। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে মনের দুঃখে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী পথে নামলো। অনেক দূর হেঁটে শেষকালে তারা এক

পুকুরের ধারে এল তখন বেলা দুপুর। ছোটছেলে খাবার জন্যে বায়না ধরলে। কি আর উপায় সঙ্গে চাট্টি চালডাল যা ছিল তার রাঁধবার আয়োজন করলে ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণ গেল কাঠ যোগাড় করতে। তখন মেয়েটি বললে মা, এখনো ত রাঁধতে দেরী আছে, আমার পুণ্যিপুকুর ব্রতটা সেরে নি। ব্রাহ্মণ বললো—'আর ব্রত করে কি হবে মা নারায়ণ আমাদের উপর বিমুখ'। মেয়ে বললে, 'মা, আমি ব্রত করে আসি তুমি বরং রান্না কর'। এই বলে মেয়েটি পুকুরের পাড়ে গিয়ে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে যথাবিধি পুকুরে ব্রত করলে, তারপরে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললে —হে নারায়ণ। হে বিপদভঞ্জন! হে মধুসূদন! এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার কর। আমি আর বাপ-মার দুঃখ কষ্ট দেখতে পারি না। এই কথা বলতে বলতে তার দুচোখে জল দেখা দিল। হঠাৎ তার সামনে বৃদ্ধ বেশী নারায়ণ উদয় হয়ে বললেন, 'বাছা ব্রত তো তুমি করলে, এই ব্রতফলস্বরূপ আমায় চাট্টি খেতে দাও, আমি বড়ই ক্ষুধার্ত'। মেয়েটি তেজঃপুঞ্জ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে বড়ই আশ্চর্য হয়ে বললে—'প্রভু, আসুন আমার সঙ্গে'। এই কথা বলে ব্রাহ্মণকে নিয়ে তার মার কাছে গিয়ে সে বললে—'মা এই অতিথি ব্রাহ্মণকে খেতে দাও'। মেয়ের কাণ্ড দেখে মা তো আশ্চর্য হয়ে গেল। নিজেরা কি খায় তার ঠিক নেই, এখন অতিথি ব্রাহ্মণকে কি খেতে দেয়। আর এই ব্রাহ্মণ এলই বা কোথা থেকে। বৃদ্ধ বেশী নারায়ণ ব্রাহ্মণীর অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, 'বাছা আমি তবে চললুম'। এই বলে তিনি যখন যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন তখন মেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'মা আমার ভাগের যা ভাত আছে তাই এই ব্রাহ্মণকে খেতে দিন, আমার আজ ক্ষিদে নেই'। ব্রাহ্মণী আর কি করেন। অতিথিকে আসন করে খেতে দিলেন। ভোজনের শেষে ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করে বললেন—'তুমি বড় ভক্তিমতী মেয়ে, তুমি রাজরাণী হও। মেয়েটি আঁচল খুলে একটি কড়ি দিয়ে দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে মুখ তুলতেই দেখলো

ব্রাহ্মণ আর নেই এবং শুনতে পেল আকাশ থেকে কে যেন বলছে, 'আমি বৃদ্ধবেশী নারায়ণ তোমাকে পরীক্ষা করলুম। তোমার পুণ্যিপুকুর ব্রত উদযাপন হলো। প্রভাতেই তোমার দুঃখ দূর হবে'।

পরদিন ভোর বেলায় রাজার লোক এসে উপস্থিত। কি ব্যাপার—না, রাজা রাত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবতার স্বপ্নে আদেশ পেয়েছেন ব্রাহ্মণকে নিজের ভিটায় ফিরিয়ে আনার জন্যে আর ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দেবার জন্য। তারপর শুভলগ্নে রাজকুমারের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। আর সেই থেকে পুণ্যিপুকুরের ব্রত চারিদিকে প্রচার হলো।

এই হচ্ছে ব্রত আর ব্রতকথার উৎপত্তির ইতিহাস। বাংলা দেশের অধিকাংশ মেয়েলী ব্রতগুলির আর্বিভাব যে আদিম-জনসমাজ এর বহু প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে। তবে এরকম বহু ব্রতানুষ্ঠানের ভিতরের মালমসলা সম্পূর্ণ বদলে ফেলে তার বাইরের নামটুকু মাত্র রাখা হয়েছে। এ'প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের মত : 'কুক্কুটি ব্রতটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তবিকই ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির এ ব্রতটি ; কুক্কুটী হলেন তাদের দেবী ; এবং যেমন নানা অহিন্দু-দেবতাকে, তেমনি কুক্কুটী দেবীকেও একালে পূজো দিতে আরম্ভ করে ছিল। মৃতবৎসা দোষনিবারণ এবং তেজস্বী বহুসন্তান লাভ হচ্ছে কুক্কুটী ব্রতের ফল।' [বাংলার ব্রত, পৃঃ ১৭।]।

ছোটনাগপুরের ওরাওঁ অধিবাসীদের মধ্যে কুক্কুটীব্রত বিশেষভাবে প্রচলিত। কুক্কুটী উর্বরা শক্তি (Fertility)-র প্রতীক। বাংলা দেশের মেয়েরা আদিবাসীর এই ব্রত নিজেদের জীবনে পালন করার একমাত্র কারণ সন্তান-কামনা। কিন্তু এই ব্রতগুলি পরিবর্তীত হয়েছে নানাভাবে, নানা শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তাই অবনীন্দ্রনাথের মত : 'অনুষ্ঠানের মধ্যে এই ভাবে আঁটঘাট বেঁধে পণ্ডিতেরা ব্রতকথাটিকে কাটাছাঁটা করতে বসলেন। ব্রতকথাগুলি হচ্ছে ব্রতটির উৎপত্তির ইতিহাস। সেটাকে ঠিক রাখলে তো ধরাপড়ার সম্ভাবনা ; এবং ব্রতকথাটা চলতি ভাষায়

বলা চাই, কাজেই ব্রতীর কামনা ও ব্রতের ফলাফল সেখানে ঠিক-ঠাক বজায় রাখা চাই।' [ঐ। পৃঃ ১৭]। তখন পণ্ডিতেরা যে ব্রতকথা গড়লেন তার মধ্যে অনেকটাই কাল্পনিক এবং পণ্ডিতের শাস্ত্র-চিন্তার ফল। ব্রতকথাটি এইভাবেই তৈরী হলো: 'রাজা নহুষের রানী চন্দ্রমুখী এবং পুরোহিত পত্নী মালিকা দেখলেন সরযূতটে উর্বশী, মেনকা এঁরা হাতে আটটি সুতোর আটপাট দেওয়া ডোরা বেঁধে শিবপূজো করছেন। রানীর প্রশ্নে অপ্সরাগণ উত্তর দিলেন যে তাঁরা কুক্কুটীব্রত ব্রত করছেন। রানী স্বচক্ষে দেখলেন শিবপূজো হচ্ছে কিন্তু শুনলেন যে সেটা 'কুক্কুটীব্রত'। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'গল্পের বাঁধুনিতে মস্ত একটা ফাঁকি রয়ে গেল। তার পরে মালিকা এবং চন্দ্রমুখী ব্রতের অনুষ্ঠান প্রণালী জেনে নিলেন। এখানে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটাই দেওয়া হলো। তারপর ব্রতের নামটা কেন যে কুক্কুটী ব্রত হল তার একটা মীমাংসা পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করলেন—রানী চন্দ্রমুখী ব্রত করতে ভুললেন কিন্তু মালিকা ভুললেন না। সেই ফলে চন্দ্রমুখী সুন্দরী হলেন বানরী এবং মালিকা হলেন কুক্কুটী ব্রতের ফলে জাতিস্মরা কুক্কুটী। তারপর পরজন্মে মালিকা ব্রত করে সুখে থাকেন, চন্দ্রমুখী দুঃখ পান; শেষে একদিন মালিকা দয়া করে চন্দ্রমুখীকে আবার ব্রত করতে শেখালেন। কুক্কুটী জন্মেও মালিকা ব্রত করেছিলেন সেইজন্য ব্রতের নাম হল কুক্কুটী ব্রত।' ['বাংলার ব্রত', পৃঃ ১৮]।

এই ব্রত আর ব্রতকথার মধ্যে একটা যে বিরাট ফাঁক রয়ে গেল তা কিন্তু পণ্ডিতেরা ঢাকতে পারেন নি। এবং তার মধ্য দিয়েই সে যুগের ব্রতের আর ব্রতকথার উৎপত্তির ইতিহাসটি উঁকি মারছে সেটি বেশ বোঝা যায়। যাদের আর্যরা নাম দিয়েছিলো 'অন্যব্রত' বা 'অনার্য' তাদের কাছেই উৎপত্তির ইতিহাস আছে বাংলার অধিকাংশ ব্রতানুষ্ঠানের এবং ব্রতকথার মধ্যে। যেমন 'পৃথিবীব্রতে'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ব্রতটি সমস্ত

বাংলাদেশে বিশেষত পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। আদিম মানুষ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া এবং শক্তি (Magical act and Power)-র উপর বিশ্বাস করত, নরবলি, মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস এ সমস্তই আদিম নরনারীর নিজস্ব বস্তু। তাই কতকগুলি ব্রত সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যখন বলেন : 'বৈশাখ মাসে যে কয়টি ব্রত উদযাপন করা হইয়া থাকে, যেমন পুণ্যিপুকুর, অশ্বত্থপাতা ব্রত, পৃথিবী ব্রত ইত্যাদি সব কয়টিই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দ্বারা বৃষ্টিপাত করাইয়া ধরিত্রীর শস্যসম্পদ রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি হইতে জাত।' ['বাংলার লোক-সাহিত্য', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১১]। এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন যে, এই সমস্ত ব্রতকথার মধ্যে আদিম বিশ্বাসের সঙ্গে যুগে যুগে তৎকালীন সমাজ জীবনের কথা সংযোজিত হয়ে এর বহু রূপান্তর সাধন হয়েছে বটে তথাপি এর একটা বিরাট কিছু পরিবর্তন হয় নি, আর কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন হলেও আদিম বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি ঠিক লুকিয়ে আছে ব্রতকথাগুলির মধ্যে। 'পৃথিবী পূজা' সম্পর্কে ব্রতকথাতে বলা হয়েছে : 'আমরা এই পৃথিবীর উপর বাস করি। তাহা আমাদের নিকট স্বর্গ হতেও বড়। পৃথিবী আমাদের মা। যেমন মা ছেলের শত শত অত্যাচার বুক পেতে সহ্য করে। বর্তমান পৃথিবীও আমাদের শত শত অত্যাচারে ক্ষুণ্ণ হন না। তার ফলে আমরা চিরকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারি। যে পৃথিবী আমাদের এত করেন তাঁকে পূজা করলে সকল দুঃখের অবসান হয়।' ['মেয়েদের ব্রতকথা'। পৃঃ ৯১]।

ব্রতফলের মধ্যে যতই সংশোধিত হিন্দুরূপ দেওয়া হোক না কেন আসলে ঐ আদিম কামনা পূজা ইত্যাদি দ্বারা ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বৃষ্টিপাত প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীকে শস্যশামল করা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা, ঐ ব্রতের মন্ত্র :

এসো পৃথিবী, বসো মা পদ্মপাতে,
তোমার পতি, শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম হাতে।

তিনি বৈকুণ্ঠ-পতি নারায়ণ তুলসী চরণে-পুজি ও চরণ,
খাওয়াব চিনি, মাখন ননী জন্মে জন্মে হই রাজরাণী ;
নাওয়াব দুধে ; মাখাবো ঘী পর জন্মে হবো রাজার ঝি।
খাওয়াব ক্ষীর মাখাব মৌ আসছে জন্মে হবো রাজার বৌ।

আর ব্রতের উপাচার হচ্ছে পিটুলি, (আলোচাল গোলা) একটি শঙ্খ, মধু, দুগ্ধ, গব্যঘৃত—এই পঞ্চ উপাচার।

মন্ত্রের মধ্যে যতই নারায়ণ আর বৈকুণ্ঠ থাকুন না কেন কামনা হচ্ছে সকলের স্বর্গলাভ বা আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়, ঐহিক জীবনের সুখ ও সম্পদ। অর্থাৎ প্রত্যেক নারীর কামনা যে সে রাজার ঝি হবে, রাজার বৌ হবে, রাজরাণী হবে। এই আদিমতম কামনা বাসনাই ব্রতগুলির বক্তব্য।

এবার 'পৃথিবী ব্রতে'র প্রচলিত ব্রতকথাটি বিচার করে দেখা যেতে পারে। ব্রতকথাটির মধ্যে নায়ক-নায়িকদের যতই আধুনিক নাম দেওয়া যাক না কেন লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এর ভিতরেও সেই আদিমতম সংস্কার ও বিশ্বাসগুলি লুকিয়ে আছে। ব্রতকথাটি এই : হরিহরপুরে নরহরি নামে এক বেণে বাস করতো। তার দুই স্ত্রী ছিল। বড়র নাম লক্ষ্মী ছোটর নাম সরস্বতী। সরস্বতীকে বিয়ে করার দু'বছর পরে লক্ষ্মীর একটি ছেলে হলো। সেকারণে নরহরি লক্ষ্মীকে বেশী ভালবাসেন। তাতেই সরস্বতীর রাগ আর হিংসা। কিছুদিন পরে নরহরি সরস্বতীর ব্যবহারে হাড়ে হাড়ে চটে গেল এবং কথা বন্ধ করে দিল। এতে সরস্বতী আরো ক্ষেপে গেল। সে মনে মনে স্থির করলে যেমন করে পারি মা-বেটাকে মেরে ফেলবো। তখন সরস্বতী অন্য পথ ধরলে। লক্ষ্মী আর তার ছেলে গৌরহরিকে খুব যত্ন-আত্তি করতে লাগলো। তাই দেখে নরহরি সরস্বতীর সঙ্গে কথাবার্তা আবার কইতে লাগলে। কিছু দিনপরে নরহরি বাণিজ্যে যাবার জন্যে তার সপ্তডিঙা সাজালো। যাবার সময় তার দুই স্ত্রীকে মিলে মিশে থাকতে বললে আর বিশেষ

করে বললে ছেলের যেন অযত্ন না হয়। লক্ষ্মী স্বামীর চরণে প্রণাম করলে। কিন্তু প্রাণটা তার হু হু করে উঠলো। চোখের জলে পৃথিবীর কাছে মানত করে স্বামীকে বাণিজ্যে পাঠালেন।

নরহরি বাণিজ্যে যাবার পর সরস্বতী ছেলেটাকে মেরে ফেলবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। আর ছেলেটার উপর খুব ভালবাসা দেখাতে লাগলো। কাজেই লক্ষ্মী ছেলেকে সরস্বতীর কাছে রেখে, সংসারের কাজ-কর্ম দেখতো। এইভাবে কিছুদিন যায়। একদিন হঠাৎ ছেলের অসুখ হলো। চিকিৎসা চলতে লাগলো। তবু অসুখ আর সারে না। সরস্বতী নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে ছেলের সেবা করতে লাগলো। পাড়াপড়শী দেখে অবাক। লক্ষ্মী সংসারের কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে এসে ছেলেকে দেখে যায় আর পৃথিবীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়, 'মা ধরিত্রি! আমার ছেলেকে আরোগ্য করে দাও। আমি আজীবন তোমার পূজা করবো। দেখতে দেখতে ছেলের জ্বর ছেড়ে গেল। লক্ষ্মী পৃথিবী পূজা করতে বসলো গ্রামের আরও দু'জন মেয়েকে নিয়ে; আর সরস্বতী রইলো ছেলের পথ্য তৈরীর করার জন্য। ঠাকুর দালানে পিটুলি গোলা দিয়ে পৃথিবী আঁকলে। পৃথিবীর নীচে পদ্মপাতা আর পদ্মের ঝাড় আঁকলে। পরে একটা শাঁখ নিয়ে তার মধ্যে মধু গাওয়া ঘী, দুধ ঢেলে পূর্বমুখে পূজায় বসলো। ওদিকে সরস্বতী রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে দেখলে লক্ষ্মী পূজায় বসেছে। অমনি পথ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে সরে গিয়ে ছেলেকে খাইয়ে দিলে। ছেলে দু'বার 'মা মা' বলে ঢলে পড়লো। ছেলের কান্না শুনে লক্ষ্মী এসে দেখলো ছেলের দেহ নীল হয়ে গেছে। লক্ষ্মী বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলো। সকলে সান্ত্বনা দিলো। অবশেষে সরস্বতী তার এক বিশ্বাসী চাকরকে দিয়ে ছেলেটার মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দিতে বলল।

জলে পড়ে মৃতদেহ কিন্তু ডুবলো না। ভাসতে ভাসতে কিছুদূর যেতেই একটা সাধু জল থেকে মড়াটা তুলে আশ্রমে নিয়ে

গেল তারপর একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে রস করে সেই মরা ছেলেটার নাকে দিতেই ছেলেটা 'মা মা' বলে কেঁদে উঠলো। সাধু তাকে একবাটি গরমদুধ খাইয়ে যত্ন করে আশ্রমে রেখে দিলে। এদিকে লক্ষ্মী ছেলের শোকে পাগল; আর সরস্বতী সর্বদা চিন্তা করে কি করে তাকেও মেরে ফেলবে। একদিন রাত্রে লক্ষ্মী বিছানায় শুয়ে স্বামীপুত্রের কথা ভাবছে এমন সময় দেখলো তার ঘরের চাল দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভয়ে ঘর থেকে সে পালাতে গেল কিন্তু পারলো না। বাইরে থেকে সরস্বতী পিশাচীর মত হাসতে হাসতে চীৎকার করে উঠলো, 'সতীনের কাঁটা বিদেয় করেছি এবার সতীন কে পুড়িয়ে মারবো যাতে না সে স্বামীর ভাগ পেতে পারে'। এমন সময় এক সাধু আবির্ভূত হয়ে সেই আগুনের মধ্যে থেকে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে সরস্বতী চীৎকার করে পাড়ার লোককে ডাকলো বললো ঘরে আগুন লেগে গেছে। তখন আগুন নিবিয়ে দেখলো লক্ষ্মী কোথাও নেই।· ওদিকে সদাগর নরহরি রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসতেই সরস্বতী বুকচাপড়ে কেঁদে উঠলো বলল, 'ছেলে অসুখে মারা গেছে আর দিদি আগুনে পুড়ে মারা গেছে'। এমন সময় সেই সাধু আবির্ভূত হয়ে বল্লেন—মিথ্যে কথা। তুমি নিজেই ঘরে আগুন দিয়েছ, আর ছেলেকে বিষ খাইয়েছ। নরহরি বলল, 'প্রভু আপনি কে'?

সাধু বললেন—'বৎস, আমি পৃথিবীর পুত্র। তোমার বড় স্ত্রী পুত্র রোগমুক্ত হলে পৃথিবী পূজা করবে বলায় মা-পৃথিবী তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরই আজ্ঞায় তোমার স্ত্রী-পুত্রকে আমি রক্ষা করেছি'। তখন নরহরি বললে—'প্রভু, কৃপা করে আমার স্ত্রী-পুত্রকে ফিরিয়ে দিন। আমি এখনি চণ্ডালীকে পরিত্যাগ করছি'। একথা শুনে সরস্বতী কাঁদতে লাগলো, বললো, 'তুমি আমায় মেরে ফেলো, কিন্তু পরিত্যাগ কোরো না।' সাধু বললেন, 'সে কি মা। তোমার মুখে একি কথা, তুমি সতী-সাধ্বী। রমণীর

শ্রেষ্ঠ ধর্ম স্বামীসেবা। স্বামীই রমণীর পরম গুরু। মন থেকে হিংসা-দ্বেষ মুছে পৃথিবীর পূজা কর, তাহলেই মনে বিমল শান্তি ফিরে পাবে'। সাধুর বাক্যে সরস্বতী স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়লো। এমন সময় লক্ষ্মী ছেলেকে কোলে নিয়ে আবির্ভূত হলো এবং স্বামীকে প্রণাম করলো। আর সাধুও সেই মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর সেই দিন থেকে দু'জায়ে পৃথিবী পূজা করে, মনের সুখে হিংসা-দ্বেষ ভুলে সংসারে বসবাস করতে লাগলো।

উপরোক্ত ব্রতকথাটি বিশ্লেষণ করলে বাংলা দেশের ব্রতকথার উৎস ও অভিপ্রায়ের মূল সূত্রটি আবিষ্কার করা যেতে পারে। ব্রতকথাটির বাইরে যতই পরিবর্তন হোক না কেন, যতই কথাটি আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করুক না কেন, ব্রতকথাটির মধ্যে বহু আদিম বিশ্বাস ও আদিম মনোবৃত্তি লুকিয়ে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ এই ব্রতকথাটির মূল অভিপ্রায় (Motif) হচ্ছে সপত্নীর প্রতিহিংসা ও নিষ্ঠুরতা (Cruelty of step-wife)। ছোট বউ সরস্বতীকে দেখা গেছে যে সপত্নী বড় বউ লক্ষ্মীর সৌভাগ্যে অকারণ হিংসা এবং নিষ্ঠুর আচরণের দ্বারা সেই প্রতিহিংসার নিবৃত্তি। দ্বিতীয়তঃ Motif Index-এর তালিকা অনুযায়ী এর অন্যতম অভিপ্রায় পাশবিক নিষ্ঠুরতা [unnatural cruelty) অর্থাৎ যে বিমাতা সন্তানকে অসুখে সেবা করে ভাল করেছে সেই আবার বিষদ্বারা সপত্নী পুত্রকে হত্যা করেছে এবং নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। পরে সপত্নীকে ঘরে আটকে দিয়ে তার ঘরে আগুন দিয়ে পৈশাচিক ভাবে হাস্য করেছে। তৃতীয়তঃ ইন্দ্রজাল বা Magic। এই গল্পে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াদ্বারা সাধু বালকের জীবনদান করেছে। বালকের মাতাকে অব্যর্থ মৃত্যুর হাত থেকে অর্থাৎ জলন্তগৃহ থেকে উদ্ধার করেছে। এ সমস্তই অলৌকিক ক্রিয়া। চতুর্থতঃ মৃতের পুনর্জীবন (Resuscitation—Eo—E199) অভিপ্রায়টি লক্ষ্য করা গেছে। সাধু পাতার রস মৃত বালকের নাকে দিয়ে তাকে জীবনদান করেছে। এ সমস্ত

অভিপ্রায়গুলি বাংলার রূপকথারও সাধারণ অভিপ্রায়। এবং এর আদি উৎস যে আদিম সমাজ জীবন সে কথা সহজেই বোঝা যায়। অথচ হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ এই সব লৌকিক মেয়েলী ব্রতগুলির উপর একটি শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ ও পূজাপদ্ধতির আবরণ দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধ করবার চেষ্টা করে আসছেন বহুদিন থেকে। এ প্রসঙ্গে একটি অভিমত : 'এখানে অন্য ব্রতদের দেবতাকে এবং সেই সেই দেবতার ব্রত-অনুষ্ঠানকে আর্যদের মতো সম্পূর্ণ অনুদার ভাবটি—সবাই নিজের নিজের ধর্মাচরণ করতে থাকে এটা নয়, সবাই আসুক এক হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কবলে ; এবং এরই জন্য শাস্ত্রের ছাঁচ সবটার উপরে বেড়াজালের—মতো দেওয়া হচ্ছে।' [বাংলার ব্রত। পৃঃ ১৪]। সুতরাং ব্রতানুষ্ঠান ও ব্রতকথার অনেক শাস্ত্রীয় রূপান্তর হলেও আসলে এর ভিতরকার চেহারাটা ঠিকই আছে। তাই এদের ভিতর থেকে এদের আদিম উৎসটিকে খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না।

সীমান্ত-বঙ্গের পশ্চিম অংশ এককালে 'জঙ্গল মহল' নামে পরিচিত ছিল। বন-পাহাড় নদনদী চড়াই উৎরাই—শালমহুয়ার প্রস্তর কঙ্কর মালভূমি এই নিয়ে জঙ্গল মহল, এ অঞ্চলেরই বাঁকুড়ার বন আসুরিয়াতে পাওয়া গেছে প্রস্তর যুগের কুঠার, ঝাড়গ্রামের তামাজুড়ির তাম্রময় কুঠার খণ্ড। এগুলিই প্রমাণ করে এ অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। তাই আজও বসবাস করে গ্রাম্য মানুষের পাশাপাশি আদিমযুগের মানুষের দল। তাই এই অঞ্চলের আচার-আচরণ, পালা-পার্বণ-বার-ব্রত, দেবদেবী, রূপকথা-উপকথা ও ব্রতকথার একটু স্বতন্ত্র রূপ। বাংলা দেশের অন্য অঞ্চলে প্রাপ্ত লৌকিক উপকরণ থেকে কিছু স্বতন্ত্র পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের লৌকিক উপকরণ। এরা পূজা করে বিভিন্ন গেরাম দেবতা। বিচিত্র তাদের নাম আর বিচিত্র তাদের অধিষ্ঠান। ওলাইচণ্ডী—রাক্ষস ডাইনী—ব্রহ্মদৈত, খুদাইচণ্ডী, বড়াম বিশালক্ষ্মী, ইত্যাদি। আর পালা-পার্বণ-বার-ব্রতও এদের বিচিত্র। বাঁধনা পরব, করম

ব্রত, ইঁদ পরব, টুসু ও ভাদুব্রত, ছাতা পরব, বিঁধা পরব—এবং এই সঙ্গে গড়ে উঠেছে নানা ব্রতকথা। পশ্চিম অঞ্চলের ব্রত-কথাগুলির মধ্যে আজও আদিমতার ছাপ বিদ্যমান। তার প্রথম প্রমাণ এই ব্রতগুলির অধিকাংশই শস্যমূলক ব্রত এবং দু'একটি হচ্ছে জাগতিক কামনা-বাসনার এবং যুদ্ধ জয়; প্রতিবেশী শত্রুদের থেকে জয়যুক্ত হওয়ার আশা।

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার আদিবাসী কুটির থেকে শুরু করে নিম্নবর্ণের হিন্দুর কুটিরে মিলিতভাবে সেখানকার নারী সমাজ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করছে ব্রতকথার ব্রতের ছড়ার মধ্যে—অন্তহীন কামনার মধ্যে একটি কামনাই প্রকাশ করছে পৃথিবী শস্যশালিনী হ'ক, স্বামী পুত্র ভাল থাকুক ইত্যাদি।

॥ দুই: পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের ব্রতকথা ॥

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার জনপদের পরিচয় দিতে গিয়ে 'বাঙালীর ইতিহাস'কার ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন: 'উত্তর-বিহারের দক্ষিণসীমা ধরিয়া, রাজমহল পাহাড়ের ভিতর দিয়া মালদহের পশ্চিম ও দক্ষিণসীমা ধরিয়া রাজমহল পাহাড়ের ভিতর দিয়া, মালদহের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ঘেঁসিয়া গঙ্গা বাংলা দেশে আসিয়া ঢুকিয়াছে। রাজমহল ও গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান সাঁওতাল পরগণা প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিম সমতল অংশ—ভবিষ্যৎ পুরাণে এই ভূমিকে বলা হইয়াছে অজলা, উষর, জঙ্গলময় ভূমি, যেখানে কিছু কিছু লৌহ আকর আছে, যেখানে তিন ভাগ জঙ্গল, এক ভাগ গ্রাম, স্বল্প ভূমি মাত্র উর্বর। ভবদেব ভট্টের একাদশ শতকীয় লিপিতেও এই ভূমিকে বলা হইয়াছে, উষর ও জঙ্গলময়। ইহাই যুয়ান-চোয়াঙের বর্ণিত কজঙ্গল'। [পৃ. ৮৫]—অর্থাৎ পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এই অংশ বৃষ্টি হীন, অনুর্বর, কঙ্করময় জঙ্গলাবৃত প্রান্তর। এই অংশটি যে কোন অংশ তা আরও পরিষ্কার

করে বলেছেন ইতিহাসকার: 'বস্তুত, রাজমহল ও সাঁওতালপরগণার কিয়দংশ যে বাংলার অন্তর্গত ছিল, এসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বাঁকুড়ার পশ্চিম সীমায় মানভূম জিলা বর্তমান বিহারের অন্তর্গত; অথচ, এই মানভূম প্রাচীন মল্লভূমি = মালভূমেরই অন্তর্গত। বাঁকুড়া ও মানভূমের ভিতর কোন প্রাকৃতিক সীমা নাই; সেই সীমা মানভূম অতিক্রম করিয়া একেবারে ছোটনাগপুরের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং শৈলশ্রেণীই এই দিকে প্রাচীন বাংলার সীমা।' অর্থাৎ পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এখন যাকে পুরুলিয়া জেলা বলে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পূর্বে যা মানভূমের অন্তর্গত ছিল সেটি যে প্রাচীন বাংলার জনপদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থানের জন্য বাংলার এই সীমান্ত অঞ্চলে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সংকরতা ঘটেছে সে প্রসঙ্গে তাঁর মত: 'ভাষায়, ভূ-প্রকৃতিতে, সমাজ ও কৌম-বিন্যাসে সাঁওতাল পরগণার সঙ্গে যেমন উত্তর-বীরভূমের, তেমনই মানভূমের সঙ্গে বাঁকুড়ার ঘনিষ্ট যোগাযোগ। দক্ষিণে মেদিনীপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমায় বালেশ্বর জেলা উড়িষ্যার অন্তর্গত, এবং সিংভূম বিহারের। এই দুইটি জেলারই কতকাংশ মেদিনীপুর জেলার যথাক্রমে কাঁথি সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত—ভাষায়, ভূ-প্রকৃতিতে, সামাজিক সংস্কৃতিতে এবং কৌমবিন্যাসে'। [পৃঃ ৮৫] এই সাংস্কৃতিক সামাজিক ও কৌমবিন্যাস এবং ভূ-প্রকৃতির সমন্বিত মিশ্ররূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বাঁশপাহাড়ী গ্রামে, পুরুলিয়ার কুইলাপালে, বাঁকুড়ার কাঁঠালিয়া ও ঝিলিমিলিতে, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার হাতীবাড়ীতে। ঐসব অঞ্চলের লোক-গীতিতে, রূপকথা-উপকথা এবং ব্রতকথায় একটা অদ্ভুত মিশ্ররূপ প্রত্যক্ষ করা গেছে। এই মিশ্ররূপের দুটি ধারা। প্রথমটি হল আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নবর্ণের সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক মিশ্রণ, দ্বিতীয়টি হল বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা, ভাষা ইত্যাদির সঙ্গে প্রতিবেশী প্রদেশ বিহার ও উড়িষ্যার প্রদেশিক প্রভাব। তাই ঝাড়গ্রামের হাতিবাড়ী

অঞ্চলের ডোমজুড়ি গ্রামটি বিহারের সিংভূম জেলায় অবস্থিত হলেও এর লৌকিক সংস্কৃতির ধারাটি পুরোপুরি বাঙালীর। অপরদিকে ঝাড়াপাড়া গ্রামটি উড়িষ্যায় অবস্থান করলেও লৌকিক সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ ভাবে বাঙালী। কেবল তাই নয় ভাষার মধ্যেও দেখা গেছে যে যখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেছে তখন ওড়িয়া ভাষার প্রয়োগ আর যখন রূপকথার গল্প শুনিয়েছে তখন বাংলা ভাষা—অবশ্য মাঝে মাঝে ওড়িয়া শব্দও যে আসেনি তা নয়, যেমন হাতিবাড়ী অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি গল্পের ভিতরের শ্লোক উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করা যেতে পারে :

মস্তেগো কাঞ্চনীর ফুল নিয়ে গো ভাবে গেঞ্জিব
পত্র না বিনাশ করিব। মুই তো সধবার ঝি॥

এই অঞ্চলের বহু লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার আদিবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কাহিনীর বহু সাদৃশ লক্ষ্য করা গেছে যার আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। অতএব সোজাসুজি ভাবে বলা যেতে পারে রাজমহল থেকে যে অনুচ্চ শৈলশ্রেণী এবং গৈরিক পার্বত্য-ভূমি দক্ষিণে সোজা প্রসারিত হয়ে ময়ূরভঞ্জ—কেওঞ্জর—বালেশ্বর স্পর্শ করে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে—সেই শৈলমালা এবং গৈরিক মালভূমিই সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূম, এবং ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর-কেওঞ্জর শৈলমালার অরণ্যময় গৈরিক উচ্চভূমি এবং বাংলার স্বভাবিক প্রাকৃতিক পশ্চিম সীমা। বাংলার ভাষা, সমাজ-বিন্যাস, জল ও কৌমবিন্যাস এবং উত্তর-রাঢ় ও পশ্চিম-দক্ষিণ মেদিনীপুরের ভূ-প্রকৃতি এই সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ'সম্পর্কে সাংস্কৃতিক গবেষকের মন্তব্য : 'প্রাচীন পাথুরে-মাটি বনজঙ্গল থেকে আরম্ভ করে নবীন পলিমাটী দিয়ে ঢাকা মেদিনীপুর। রানীগঞ্জ কেন আরও উত্তর-পূর্বে-নলহাটি-রামপুরহাট থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম ঘেঁষে যদি একটি রেখা টানা যায় তুবরাজপুর, রানীগঞ্জ অণ্ডাল, গঙ্গাজলঘাটি বাঁকুড়া, শিমলাপাল গড়বেতা শালবনি মেদিনীপুর দাঁতন জল্লেশ্বর

বালেশ্বর পর্যন্ত দক্ষিণে—তাহলে সেই রেখার পশ্চিমে যে অংশ পড়ে তার ভৌগোলিক প্রকৃতি একরকম এবং পূর্বাংশের অন্যরকম দেখা যায়।...বীরভূমের কিছুটা অংশ, বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ এবং মেদিনীপুরের অনেকটা অংশ (প্রধানত উত্তর মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমা) এই রেখার পশ্চিম দিকে পড়ে। পশ্চিম বাংলা কেন, সারা বাংলা দেশের মধ্যে এই অঞ্চলই হ'ল প্রাকৃতিক বয়সের দিক দিয়ে সবচেয়ে প্রবীন ও প্রাচীন। ['পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি'। বিনয় ঘোষ। পৃ. ৩৩৩] এই পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলটি সবচেয়ে আদিমতম ও প্রাচীনতম অঞ্চল বলে মনে হয়েছে লেখকের এবং তাই তাঁর মত: 'সবুজ ও সমতলতার মনোরম একঘেয়েমি থেকে মুক্ত উঁচুনিচু বনময় রুক্ষ গৈরিক পাথুরে বাংলার এই মূর্তি অনভ্যস্ত বাঙালীর চোখে প্রকৃতির এক বিচিত্র প্রকাশ বলে মনে হয়। অথচ বাংলার সভ্যতার ও বাঙালী সংস্কৃতির অনেক উত্থান-পতন, অনেক ভাঙাগড়া, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত হয়েছে পশ্চিম বাংলার এই প্রাচীনতম অঞ্চলে। এপাশ থেকে আদিম পার্বত্য ও বন্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলার আদিম মানুষের বংশধরেরা যেন ও পাশের নদীমার্তৃক উর্বর অঞ্চলের উন্নত সভ্যতার উত্তরাধিকারীদের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে, আদান-প্রদানের আশায়। [ঐ, পৃ. ৩৩৪]। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এই সব অঞ্চলের পাথুরে মাটির স্তরে স্তরে, গভীর অরণ্যে লুকিয়ে আছে আদিমতম যুগের বহু উপকরণ। যার আবিষ্কার হয়েছে বাঁকুড়ার বনআসুরিয়ায়, ঝাড়গ্রামের লালগড়ে, দুর্গাপুর রানীগঞ্জে। এই পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলে অদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই সভ্যতার বনিয়াদ কারা গড়েছিল? অনেকে বলেন আদি অষ্ট্রালয়েডরা (Proto-Australiod) বা নিষাদরা। তাদের বংশধর হচ্ছে আজকের সাঁওতাল, লোধা, শবর, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসীর দল। বহু প্রাচীনযুগ থেকেই পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের বনে জঙ্গলে তীর ধনুক ও প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ার নিয়ে তারা শিকার করত বন্য জন্তু-জানোয়ার, সংগ্রহ করত বন্য কাঠকাঠরা,

বন্য ফলমূল ইত্যাদি, বন কেটে বসত নির্মাণ তারাই করেছিলে। আজ সভ্য মানুষের উৎপীড়ণে তারা বনছাড়া ও ভূমিছাড়া হলেও ঐ বনের প্রান্তেই তারা কুটির বেঁধে বাস করে, বন থেকে লুকিয়ে কাঠ কাটে, শিকার উৎসবে শিকার করে, গ্রাম্যমানুষের চাষবাসে দিনমজুরীর কাজ করে, মাদল বাজিয়ে গান গায় ও নাচে, মহুয়ার মদ তৈরী করে লুকিয়ে খায় এবং তা খেয়ে উৎসব পার্বণে গড়াগড়ি দেয়, হিন্দুর উৎসব পার্বণে অংশ গ্রহণ করে, হিন্দুর পুরাণ কাহিনী শোনে। কিন্তু পরিপূর্ণ ভাবে যে এরা হিন্দু সমাজের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সব আদিবাসীর আচার-ব্যবহারে, ধর্মানুষ্ঠানে, গেরাম দেবতার পূজায়, উৎসব-পার্বণের মধ্যে। আরও পরিচয় লুকিয়ে আছে পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে, প্রবাদ-ছড়ায়, গানে, রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথায়। এই অঞ্চলের রূপকথা ও উপকথার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে পর্ববর্তী অধ্যায়ে এবং সেখানে দেখান হয়েছে এর আদিম ইতিবৃত্ত ও উৎপত্তির ইতিহাস। এই পর্বে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার ব্রতকথার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করা হবে।'

ভাদু ব্রত

বাঁকুড়া পুরুলিয়ার মেদিনীপুরের প্রান্ত জুড়ে লাল মহুয়া বয়ড়া হরীতকী গাছের গভীর জঙ্গল। লাল পাথর আর কাঁকুরে মাটিতে যখন সীমান্ত-বাংলার কৃষকের কর্মক্লান্ত ফসল ভাদ্রের শুরুতে নবীন বেশে দেখা দেয়। তখন শালের বনে ফুলের গুটি ধরে, তখন রুক্ষমাটি ভেদ করে দেখা দেয় কাশ ফুলের অজস্রতা, নীল আকাশের উজ্জ্বলতা আর সবুজ শালবনের শ্যামলিমা তখন গ্রামের রুক্ষ প্রকৃতিকে কিছুটা নবীন ও তাজা করে তোলে, খরার প্রচণ্ডতা তখন বর্ষণের জলে ধুয়ে মুছে শরতের কিশলয়ে মেতে ওঠে তখন কুমারী হৃদয়ে নবীন আশা-আকাঙ্ক্ষার বান ডাকে, নারী হৃদয় উদ্বেল হয়ে কামনা-বাসনার প্রকাশে—এই কুমারী মন তখন সমস্ত হৃদয়টিকে মেলে দিয়ে গেয়ে ওঠে ভাদু গান :

ভাদু, আপন ভুলে, কেন বিয়ে করবে না তাই বল খুলে।
নবীন প্রেমিকা, ভাদু গো, কেমনে আছো ভুলে ॥
নবীন প্রাণে বঁধুর সনে শুভ-বরণ করে লে।
বর এসেছে কত শত লো, তোরে দেখিবার ছলে ॥
যদি রসিক দেখে করবি বিয়া, মনের মতন চিনে লে।
আজ বড় শুভ নিশি লো, শুভ মালা বদলে ॥
মনের আশা পূর্ণ হবে, বাসর ঘরে ঢুকিলে ॥
আইবুড়োতে বন্ধ্যা থাকা লো, অধর্ম কলিকালে।
বৃথা বয়স কেটে গেলে কে ডাকিবে মা বলে ॥

কুমারী হৃদয়ের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা-বাসনাই প্রকাশ পেয়েছে এই ভাদুব্রতের গানটির মধ্য দিয়ে। 'ভাদুব্রত' পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার একটি বিশেষ প্রচলিত ও জনপ্রিয় ব্রতানুষ্ঠান। ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে কুমারীগণ একটি মৃন্ময়ী নারীমূর্তির প্রতিমা করে—আগমনী গীত গায়ঃ

ভাদুর আগমনে, রে—
কি আনন্দ হয় গো—মোদের প্রাণে।
ভাদু আজকে এলো ঘরে গো এলো গো শুভদিনে
মোরা সাজি ভর্তি ফুল তুলেছি গো যত সব সখিগণে।

তারপর শুরু হয় নাচ, গান। সেই নাচ ও গানে মাতাল হয়ে উঠে সীমান্ত-বাংলার আকাশ প্রান্তর সবুজ শালবন মহুয়ার বন। জ্যোৎস্নার প্রান্তরে কংকরময় রুক্ষ রাঢ় প্রকৃতি যেন কথা কয়ে ওঠে। এই যে 'আদরিণী ভাদুমণি এল আজি ঘরকে' গানের ভাদুমণি কে, কেন বা তার আগমনে সীমান্ত বাংলার গ্রাম্যনারীদের অন্তরে পুলক সঞ্চার হয়, কেন বা তার অন্তরের কথা কুমারী জীবনের কামনা-বাসনা ভাদুব্রতের গানে উজাড় করে ঢেলে দেয়। কিন্তু কে এই ভাদুরানী যাকে কুমারীরা গানে বলেছে 'নবীন প্রেমিকা', তারা ভাদুরানীকে কেনই বা জিজ্ঞাসা করেছে—'কেন বিয়ে করবে না বল খুলে।' কে সে ভাদুরানী যে বিয়ে করবে না বলে মন করে

ছিল, আ-জীবন কুমারী থাকাই যার বাসনা। সেই ভাতুরানীকে উদ্দেশ্য করে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার মেয়েরা বলে 'মনের আশা পূর্ণ হবে বাসর ঘরে থাকিলে'। যেমন অনূঢ়া কুমারী হৃদয়ের আর্তধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠে :

আইবুড়তে বন্ধ্যা থাকা লো অধর্ম কলিকালে।
বৃথা বয়স কেটে গেলে কে ডাকিবে মা বলে॥

কেন কুমারী হৃদয়ের মাতৃত্বে অভিষিক্ত হবার এই সাধ। একথা যদি আবিষ্কার করতে হয় তাহলে আমাদের বহুদূরে বহু দিন আগে চলে যেতে হবে।

অনেক দিন আগে শাল আর মহুয়ার প্রান্তরে বাস করতো এক রাজা। রাজ্যের নাম পঞ্চকোট রাজ্য। বর্তমানের পুরুলিয়ার অন্তর্গত পাহাড়ে আর গভীর অরণ্যে ঘেরা এই দেশ। এই দেশের রাজার নাম নীলমণি সিংহ। দিন যায়, রাত যায়, রাজার মনে বড় দুঃখ তাঁর কোন সন্তান নাই। তাঁর বেদনায় প্রজাকুলও আকুল। মহুয়ার গাছে বুঝি ফুল ধরে না, আর ধরলেও তা ফুটতে না ফুটতেই ঝরে যায়, লাল বনের মধ্যে নীরব স্তব্ধতা আর পাহাড় পর্বতও যেন মৌনমূক।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল রানী অন্তঃসত্ত্বা। রাজপুরী থেকে শুরু করে প্রজা সাধারণের মধ্যে আমোদের হিল্লোল প্রবাহিত হলো। একদিন শুভক্ষণে পঞ্চকোটের অন্ধকার রাজপ্রাসাদ আলো করে জন্ম নিল একটি কন্যা। সাড়া পড়ে গেল রাজপুরীর মধ্যে। শুভ্র মেঘের মত সুন্দর নরম, তুলতুলে একটি মেয়ে। রাজকন্যা হবার মতই রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। নাম দেওয়া হল ভদ্রেশ্বরী। রাজকন্যা বড় হতে লাগলো। আর রূপের ছটায় দশদিক আলোকিত হয়ে উঠলো। শালের শ্যামলতা ভাতুরানীর সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতার কাছে হার মানলো, কাশ বনের শুভ্রতা ভাতুমণির বর্ণের কাছে নিষ্প্রভ হলো, ভাতুরানীর ঢল নামা কালো কেশের গভীরতায় শালবনের গহন অন্ধকার ম্লান হলো ; আর ভদ্রেশ্বরীর মহিমা-হাঁটা-

চলা সব কিছুই যেন পঞ্চকোটের পাহাড়ের চূড়াগুলোর অটল মহিমাকে পরাস্ত করলো। ভাদুরানী ক্রমশঃ বড় হতে লাগলো। ভাদুরানীর রূপের আলোক-ছটায়, বর্ণের মাধুরীতে পঞ্চকোটের পাহাড় পর্বত, অরণ্য প্রান্তর, জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ আলোকিত হয়ে উঠলো। কিন্তু সুখ কই? রাজা নীলমণি চিন্তিত হয়ে উঠলো কার সঙ্গে বিয়ে দেবেন এই আদরিণী রাজকন্যা ভাদুরানীর। এই অনিন্দিতকান্তি অপরূপের মহিমা কার হাতে অর্পণ করবেন। চারিদিকে লোক পাঠালেন ভাদুরানীর যোগ্য পাত্রের সন্ধান। কিন্তু কোথায় সেই যোগ্য পাত্র?

এদিকে রাজান্তঃপুরের গোপনীয়তা, রাজপ্রাসাদের প্রহরাকে উপেক্ষা করে রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীর রূপমহিমা পঞ্চকোটের প্রজার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। তাই রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরী যখন সখীদের সঙ্গে উদ্যান পরিভ্রমণ করেন, কিংবা শিবপূজায় বহির্গত হন তখন প্রজারা আপন বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে—'এ মেয়ে ত মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।' নিশ্চয়ই কোন শাপভ্রষ্ট দেবী পঞ্চকোটের সামন্তরাজকুলে জন্মগ্রহণ করেছে। পঞ্চকোটের ঘরে ঘরে ভাদুরানী—রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীর রূপ লাবণ্যের স্তুতি, কুটিরে কুটিরে ভাদুমণির গুণগান। কিন্তু শান্তি কই? পুষ্পস্তবক-ভারাবনম্রা ভাদুরানীর রূপ আর কতদিন অনাঘ্রাত ও অনাস্বাদিত থাকবে? অনূঢ়া রাজনন্দিনী রাজপ্রাসাদের অলিন্দে একা দাঁড়িয়ে থাকে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে, মহুয়া ফুলের মাতাল গন্ধ আর তাকে বিচলিত করে না, শালবনের পাতার মর্মরধ্বনি আর শিহরণ আনে না ভাদুরানীর অন্তঃকরণে। আদরিণী ভাদুরানী পঞ্চকোটের রাজনন্দিনী, মহারাজ নীলমণির নয়নের মণি ক্রমশঃ যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। তার সে তেজ, মহিমা, লাবণ্য যেন ম্রিয়মান। রাজা ও রানীর অন্তর দ্বৈত চিন্তায় আকুল। এক দিকে রাজকন্যার যোগ্য পাত্রের জন্যে চিন্তা, অন্যদিকে ভাদুরানীর মানসিক বিপর্যয়। রাজা

রানী, সহচরী সখিবৃন্দ রাজ্যের সমস্ত প্রজাকুল যেন আকুল হয়ে উঠলো।

দিন যায়, রাত যায়। শালের বনে নতুন পাতা দেখা দেয়, ফুটে ওঠে মহুয়ার ফুল। সেই ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে উঠে পঞ্চকোটের অপরূপ প্রকৃতি, আবার শীত আসে। সব ঝরে যায়। কিন্তু ভাদুমণির জীবনে আনন্দ কই? তারপর একদিন পঞ্চকোটের মানুষ শুনলো রাহু চাঁদকে গ্রাস করে নিয়েছে। কুমারী ভদ্রেশ্বরী মৃত্যুর কবলে। শালের বনে নতুন পাতা ঝরে গেল। ম্লান হলো মহুয়ার ফুল। বনের প্রান্তরে আদিবাসীর মাদলের ধ্বনি গেল থেমে। একটা নিদারুণ সর্বনাশে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল পঞ্চকোটের আকাশ-বাতাস-জনগণ সবকিছুই। আদরিণী ভাদুরানী আর নেই! যেতে নাহি দিব। হায় তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়'। যে যাবে চলে তাকে কিছুতেই রাখা যায় না। ভাদুরানীকেও ধরে রাখা গেল না, পার্থিব জগতে। কিন্তু ভাদুরানী মরে অমর হলো। মানবী ভাদুরানী দেবী হয়ে উঠলো পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার ঘরে ঘরে। মহারাজ নীলমণি সিংহ প্রচার করলেন, ভাদ্র মাসে তার রাজ্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে যেন ভাদুরানীর গান গাওয়া হয়। প্রচার না করলেও ভাদুরানী এমনিতেই প্রজাবৃন্দের মনে আসন পেতে ছিলো। জীবিত অবস্থায় যে ছিল রাজকন্যা, রাজপুরীতে যার অধিষ্ঠান, মৃত্যুর পর সেই রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরী ঘরে ঘরে আদরিণী ভাদুরানী রূপে দেখা দিল। দেবী মানবী কন্যা সব একাকার হয়ে গেল ভাদুমণির মধ্যে। তাই গান রচনা হলো:

কাশীপুরের রাজার বিটি বাগ্‌দী ঘরে কি কর।
হাতের জালি কাঁখে লয়ে সুখ সায়রে মাছ ধর॥
মাছ ধরণে গেলে ভাদু ধানের গুছি ভাঙিও না।
একটি গুছি ভাঙলে পরে পাঁচ সিকা জরিমানা॥

কাশীপুরের রাজার বিটি ভাদুরানী আজ বাগ্‌দী ঘরের আদরিণী কন্যায় পরিণত।

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার কুমারী নারী আজও ভাদ্রমাস ধরে ভাদু-ব্রত করে, গান গায়, নাচে, আর স্মরণ করে সেই ভাদুমণির কথা। যা সীমান্ত অঞ্চলে ভাদুর ব্রতকথা রূপে স্বীকৃত ও কথিত। তাই পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার মাঠে যখন আউশ ধান পাকে, বাঁধের ধারে যখন শ্বেত শুভ্র কাশফুল ফোটে, যখন বাঁধের জল স্বচ্ছ ও নির্মল হয়, যখন শালের বনের পাতাগুলো গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করে, যখন মহুয়ার বন থেকে তীব্র গন্ধ মহুয়ার বাতাসে ভেসে আসে, যখন সীমান্ত বাংলার এই লাল পাথুরে রুক্ষ প্রকৃতিতে কিছুটা শ্যামলতার ভাব আসে, যখন আকাশে শুভ্র মেঘের আনাগোনা দেখা দেয় তখন পশ্চিমের এই সীমান্ত বাংলার গ্রামগুলিতে ভাদুব্রতের গানে গানে, ব্রতকথায় এক নতুন স্বর্গ রচিত হয়, তখনকার মত সেখানকার নরনারী ভুলে যায় এ অঞ্চলের প্রকৃতির অকৃপণ মনোভাব, প্রচণ্ড খরার আধিক্য, রুক্ষ মাটীর হৃদয়হীন অদাক্ষিণ্য। নাচে-গানে, ছড়ায়-ব্রতকথায় মেতে উঠে এ অঞ্চলের কুমারীর হৃদয়। তারপর বিদায় দিতে গিয়ে কুমারী কন্যার মন কেঁদে ওঠে। কারণ ব্রতকথায়, ভাদুর কথায় যে তারা ভাদুমণির কুমারী-মনের সঙ্গে তাদের কুমারী মানসের একাত্মতা খুঁজে পেয়েছে। তাই বিদায়ের দিনে কেবলই আঁখিজল :

ভাদু বিধুমুখী।
এস এস হৃদয়ে ধরে রাখি॥
বিদায় কথা শুনে—তোমায় গো, অবিরল ঝরে আঁখি॥
(তুমি) যেও না গো, বিনয় করি আমাদের দিয়ে ফাঁকি॥

সীমান্ত অঞ্চলের এই ব্রতের উৎস কোথায়? উৎস সন্ধানে যাত্রা করতে হবে মোহনার দিকে নয়, উজানের দিকে। এ প্রসঙ্গে একটি মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'পশ্চিমে ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমি যখন আদিবাসীর বর্ষা-উৎসবের 'করম' সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে,

তখন পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসিনী কুমারীদিগের কণ্ঠ-নিঃসৃত ভাদু গানের ভিতর দিয়া তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব-দক্ষিণ মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম এই অঞ্চল ব্যাপিয়া কুমারীদিগের মধ্যে ভাদ্রমাসে যে গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হিন্দু প্রভাব বশতঃ বর্তমানে একটি পূজার আকার ধারণ করিয়াছে—তাহা ভাদুপূজা নামে পরিচিত ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিবাসীর 'করম' উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ মাত্র। ['বাংলার লোক-সাহিত্য', ১ম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃ. ২৪২]। অর্থাৎ লেখকের মতে আদিবাসীর করম উৎসব বর্ষা উৎসব, আর ভাদু উৎসবও বর্ষা উৎসব। ভাদুব্রত আদিবাসী রমণীর ব্রতানুষ্ঠান করম ব্রতেরই হিন্দু সংস্করণ মাত্র। তবে কিছু রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়, করম ব্রতে আদিবাসী রমণীগণের নৃত্য ও গীত দুই-ই প্রচলিত আর ভাদুব্রতে কোন কোন ক্ষেত্রে নৃত্য-গীত দুই-ই চলে, আবার কোন ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের হিন্দু গৃহে কেবল গীত গাওয়া হয়, নৃত্য পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশী তিথিই করমতিথি। রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতির বুক জুড়ে যখন অজস্র ফসলের সমারোহ, মাঠে আউশ ধানের প্রাচুর্য, খরাক্রান্ত কংকরময় প্রান্তরের, বাঁধগুলো যখন জলে পরিপূর্ণ, পার্বত্য নদীগুলোও যখন কাণায় কাণায় ভরা, শালের পাতাগুলো যখন গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে, তখন আদিবাসী-প্রধান-পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এই প্রান্তের গ্রাম্য মানুষ ও আদিবাসীগণের মনে আনন্দের হিল্লোল।

করম ব্রত

ভাদ্রমাসে শুক্লা একাদশী তিথিতে তখন আকাশ, শালবন, লাল মাটির প্রান্তর, জঙ্গলাবৃত পাহাড়গুলো, পাথুরে নদীগুলো জোৎস্নায় ভরা যৌবনের মত টল টল করতে থাকে। যখন মহুয়া ফুলের তীব্র ঝাঁজালো গন্ধ পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার বাতাসকে মাতাল করে তোলে তখন এদেশের কুটিরে কুটিরে মাঠে ঘাটে শুরু হয় করম উৎসবের নৃত্য-গীত। বন থেকে কেটে আনে তাজা সবুজ একটি করম গাছের

ডাল। সেটিকে প্রাঙ্গণে পুঁতে তাকে ঘিরেই চলে নৃত্য ও গীতোৎসব এবং নানা কথা ও কাহিনী যেগুলি ব্রতকথা নামে আজও এ অঞ্চলের ঘরে ঘরে আদিবাসীর কুটির থেকে গ্রাম্যজনের আঙ্গিনায় নানা আকারে প্রচলিত। 'করম ঠাকুর' আজ পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার কি আদিবাসী সমাজ, কি হিন্দু সমাজ সকলেরই কাছে শস্যের দেবতা—মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের দেবতা। এই করম দেবতা অসন্তুষ্ট হলে আর রক্ষা নাই ধন-মান-ঐশ্বর্য সমস্তই লুপ্ত হবে, মাঠে শস্য ফলবে না, বৃষ্টি হবে না। অরণ্য-সম্পদ হবে অন্তর্হিত, আবার করম ঠাকুর সন্তুষ্ট হলে সমস্ত কিছুই সার্থক হবে। তাই করম পরবে সকলের আবাহন :

সব পরবেই আসবি ভাই, করম পুজায় আসবি রে।
করম ফুল আনবার সময় সাথী মনে পড়ে রে ॥

কিংবা :

আজ তরে করম রাজা ঘরে দুয়ারে।
কাল তরে করম রাজা নাল নদীর পারে ॥

শুধু নৃত্য আর গীতিই নয় যুগযুগান্তর ধরে রচিত হয়েছে করম সম্পর্কে অসংখ্য কাহিনী-উপকাহিনী ব্রতকথা ইত্যাদি। এ'সম্পর্কে সাঁওতালি লোককথা দিয়েই শুরু করা যাক। C. H. Bompas এর *Folklore of Santal Parganas* গ্রন্থে একটি সাঁওতালী লোককথা আছে যেখানে করম ঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে, কাহিনীটি হচ্ছে এই :

একদা কোন এক সময়ে করম আর ধরম নামে দুটি ভাই পাশাপাশি বসবাস করতো। করম করতো চাষবাস। বন্ধ্যামাটি কর্ষণ করে সে সোনার ফসল ঘরে তুলতো। আর ধরম ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতো। এভাবে দিন কাটতে থাকে। দুভায়ে পৃথক থাকলেও পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বেশ যোগাযোগ রাখত। একদিন ধরম আশ্চর্য হয়ে গেল এই দেখে যে করম তার বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন করেছে অথচ ধরমকে কোন আহ্বানই জানায়

নি। তারপর একদিন ধরম বাড়ীতে উৎসব করলো বটে কিন্তু করমকে সে ডাকলো না। এদিকে করমঠাকুর সে উৎসব দেখতে এসে ধরমের বাড়ীর খিড়কীর দরজার কাছে লুকিয়ে রইলেন। অনেক রান্না হয়েছে। বহু লোকজন খাবে। ভাতের ফেন ফেলতে এসে অজ্ঞাতে করম ঠাকুরের গায়ে ছুঁড়ে ফেললো ধরম। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে করম ঠাকুর বাসায় চলে গেলেন দগ্ধ দেহ শীতল করার জন্যে। করমঠাকুর অভিশাপ দিলেন। ধরমের ব্যবসা-বাণিজ্য নিঃশেষ হয়ে গেল। ভাইয়ের দুঃখ দেখে করম ধরমকে নিজের ক্ষেতের কাজে লাগিয়ে দিল। এইভাবে বহুদিন দুঃখ কষ্টে থাকার পর ধরম আবার করম ঠাকুরের কৃপা লাভ করলো।

এই কাহিনীরই নানা আঞ্চলিক রূপ আছে, বহু রূপান্তরিত উপকাহিনী আছে। তথাপি Bompas-এর সংগৃহীত সাঁওতালি লোককথাটিকে প্রামাণ্য বলা যেতে পারে। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার অন্যান্য লোককথা রূপকথা, উপকথা ইত্যাদির মধ্যে যেমন বহু আদিমতার ছাপ বিদ্যমান, ঠিক তেমনি এখনকার ব্রতানুষ্ঠান আর ব্রতকথা ও ব্রতকাহিনীগুলিও বেশ প্রাচীন এবং তার উৎস ওই আদিম সমাজ জীবন যা নানা পরিবেশ, অবস্থা, আচার, রীতি-নীতি, নানা ধর্মীয় ব্যবস্থা দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আজও পশ্চিম বাংলার নারীসমাজে প্রবহমান। এই করম পূজার ব্রতকথা একটি আদিম কাহিনী ও রূপান্তরিত উপকাহিনী এখানে উপস্থিত করলে এ অঞ্চলের ব্রতকথাগুলির উৎস, পরিবর্তন এবং অভিপ্রায় সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা করা যাবে। ধলভূম এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের প্রচলিত কাহিনীটি 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে এরূপ ভাবে দেওয়া আছে: 'এক যে ছিল সদাগর। কৃষি লক্ষ্মী অচলা তার গৃহে, সিদ্ধিদাতা গণেশের কৃপালাভেও সে বঞ্চিত হয় নি। কৃষি ও বাণিজ্যের দৌলতে সে সম্পদবান। তার উপাস্য দেবতা কিন্তু করম—করম রাজা। মহা আড়ম্বরে সে করমের পূজা করে—নির্দিষ্ট তিথিতে—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের একদশী তিথিতে।

সদাগরের যমজ পুত্র ধরম আর করম। বড়ো হয়ে ধরম গেল বাণিজ্যে। সংগে নিলো একটি বলদ। পিঠে তার দ্রব্য সম্ভারের ছালা। ছোট ভাই করম গ্রামেই থাকে। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর তাকেই দেখা শোনা করতে হয় চাষবাসের। দেখতে দেখতে দিন গেল, মাস গেল। জ্যোৎস্না গেল, অন্ধকার গেল, গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল তবুও দেখা নেই ধরমের। সেই যে গেছে বাণিজ্যে আজো ফিরলো না সে। ভাদ্রমাস এসে গেছে। করম রাজার পূজোর তিথিও এসে গেল। করম দুঃখ পেলো। ধরমকে বাদ দিয়েই তাকে পূজো করতে হবে।

কি আর করে! অদূরেই অরণ্য—গ্রামের শেষে ক্ষেত, ক্ষেতের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে বন। তাজা শাল গাছের ঘন সবুজ পাতা দূর থেকে কালো কালো মনে হয়। সেই বন থেকে করম গাছের ডাল কেটে নিয়ে এলো আর সেই ডালকে উঠোনে পুঁতে তার চারদিকে নাচগান লাগিয়ে দিলো করম। করমের নামেই তারও নাম। গায়ের লোক ডাকে কর্মা বলে।

এমনি দিনে বাণিজ্য থেকে ফিরে এলো ধরম। তার বলদের পিঠে ছালা ভরা রত্ন। গাঁয়ের প্রান্তে এসে ধরম শুন্‌লো যে তার ভাই করম চাষবাস ছেড়ে দিনরাত শুধু করম গাছের ডালকে পূজো করছে—আর মদ খেয়ে, হাঁড়িয়া খেয়ে মাতাল হয়ে নাচছে। কথাটা ভালো লাগলো না ধরমের। ধনের অহংকারে সে তখন আলাদা মানুষ। বলদকে পিছনে রেখেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে ছুটলো সে বাড়ীতে সেখানে অকর্মণ্য কর্মা গাছের ডাল পুঁতে নাচছে আর গান গাইছে।

কথাটা মিথ্যা নয় মোটেই। রাগে দিকভ্রান্ত হয়ে গেল ধরম। একটানে উপড়ে ফেললো সে রকম গাছের ডাল, লাথি মেরে চুরমার করে দিলো পূজা উপকরণ; হুঁস যখন হল, রাগের মাত্রা যখন কমলো তখন মনে পড়লো রত্ন-ছালা-বোঝাই তার বলদটির কথা। কিন্তু কোথায় বলদ! গাঁয়ে নেই, ক্ষেতে নেই, মাঠে নেই, বনে নেই,

নেই তা নেই কোথায়ও নেই। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ধরম যখন বাড়ীতে ফিরে এলো আবার, তখন যা দেখলো, তাতে আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। কোথায় সেই বিরাট বাড়ী, ঘর দোর গোরু-বাছুর-ছাগল-ভেড়া আর দুধালো মেষের পাল। পশু পাখি যা ছিল তাদের চিহ্নও নেই; দেওয়াল পড়েছে ভেঙে, আগাছায় ভরে গেছে চারদিক আগের যা কিছু ছিল, সব হাওয়া। স্বপ্ন না সত্যি!

অবাক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছে ধরম। দাঁড়াবার স্থানটুকুও নেই। উঠোনে পড়ে ডুক্‌রে ডুক্‌রে—কাঁদছে করম—ধরমের ভাই। যা হবার তা তো হলো। ধরমের পাপে করম রাজা ত্যাগ করলেন ধরম ও করম দু'জনকেই। দু'ভাইতে মিলে শেষ পর্যন্ত যুক্তি করলো যে জনমজুরী করেই সংসার চালাবে ওরা। আর, তা ছাড়া উপায় তো কিছুই নেই, যা হবার তা তো হয়েইছে।

দূরের গাঁয়ে দুভাই গেল কাজ করতে গেরস্তদের ক্ষেত খামারে কাজও জুটলো। মজুরদের যখন মুড়ি খাবার সময়, গেরস্ত নিয়ে এলো মুড়ি, সবাইকার জন্যে। পেট তখন চোঁ চোঁ করছে। বেলাও প্রায় দুপুর। ক্ষেতের কাজ করা অভ্যেসও নয় তাদের। তাদের জমি-জায়গাতেই কতো মজুর কাজ করতো। সব মজুরই গেরস্তের কাছ থেকে নিজেদের গামছার খুঁটে মুড়ি নিয়ে এলো। ধরম আর করম এগুতে পারলো না লজ্জায়। তাদের আর মুড়ি খাওয়া হলো না। দুজনেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললোঃ হায় করমরাজা! উপায়ই বা কি! তেমনি ক্ষিধে নিয়েই কাজ করতে হলো আবার। কাজ না করলে গেরস্তই বা দাম দেবে কেন—'মূল' দেবে কেন? কাজের শেষে সন্ধ্যের কিছু আগে সবাই গেল 'মূল' অর্থাৎ মূল্য হিসেবে ধান আনতে। সব মজুরকে দেওয়া হলো, ধরম করমের বেলায় টান পড়লো। গেরস্ত বললেঃ 'তোমরা কাল এসে মূল্য নিয়ে যেও, আজ সন্ধ্যের সময় আর মরাই থেকে ধান আনতে পারবো না'। উপায় নেই, বাধ্য হয়ে ফিরে এলো দু'ভাই।

তারপর দুজনেরই রাগ হলো গেরস্তর উপর। যুক্তি করে ঠিক করলো রাতে গিয়ে—উপড়ে দিয়ে আসবে ধান চারাগুলো—যেগুলো রোয়া হয়েছ সেই গেরস্তর ক্ষেতে। যেই ভাবা, সেই কাজ। দুজনে মিলে রাতের আবছা জোৎস্নায় উপড়ে ফেলতে লাগলো সেই ক্ষেতের ধান-চারা; জলা জমি; তাই একটুও বেগ পেতে হলো না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ধরম-করমের অজ্ঞাতে ধান চারাগুলো ঠিকঠাক আবার নিজেদের জায়গায় বসে যেতে লাগলো আগের মতো।

পরের দিন সে গাঁয়ে না গিয়ে অন্য গাঁয়ে গেল দু'ভাই। সেখানে কাজ জুটলো আলের উপর মাটি চাপানোর। কিন্তু মূলের বেলায় এ গেরস্ত বললো: কাল এসো আজ নেই।

মনের দুঃখে পেটের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বাড়ী ফিরল তারা। তারপর দু-ভাই আর দু-গিন্নিতে মিলে কপালের দোষ দিতে লাগলো। করম বললো: 'দাদা করমরাজা বাম এ' অবস্থায় কিছুই জুটবে না আমাদের। তার চেয়ে এক কাজ করি,—বেরিয়ে পড়ি করম রাজার খোঁজে। যেখানে পাবো সেখান থেকেই পায়ে ধরে নিয়ে আসবো তাঁকে'।

ধরম বললো: আমিও যাবো।

করম বললো: না তুমি ও যেও না, ভাঙা ঘরগুলো দেখা-শোনা করো। এই না বলে করম বেরিয়ে পড়লো। কোথায় যে করম রাজা আছেন তা কি সে জানে। তবুও খুঁজে খুঁজে যেতেই হবে তাকে মাঠ ঘাট নদী নালা সাগর পর্বত অতিক্রম করে—শত বিপদকে মাথায় তুলে। তার পরণে একটি গামছামাত্র। আর কিছু নেই সংগে। করম চললো করম রাজার খোঁজে। চলেছে তো চলেইছে। পথের আর শেষ নেই। যেতে যেতে পথের ধারে একটা পুকুর দেখে জলপানের বাসনা হলো তার। কিন্তু হায় কপাল, পুকুরে গিয়ে দেখে এক ফোঁটাও জল নেই। কপাল চাপড়াতে লাগলো। সে বললে, 'হায় করম রাজা আমার ভাগ্যে

এক ফোঁটা জলও জুটলো না'। তার আক্ষেপ শুনে পুকুর বললো : 'কে ভাই তুমি, করম রাজার নাম বললে কেন'? করম বললো সবকথা। গোড়া থেকেই বললো।

পুকুর সব কথা শুনে বললো : 'ভাই, তুমি আমার কথাটি নিবেদন কোরো করম রাজার কাছে। শুধিও তো কেন আমার জল নেই, কেন আমি শুক্‌নো? জিজ্ঞেস করো, কি পাপে আমার এই দুর্গতি আর মুক্তিই বা আমার কিসে?

পুকুরের কথা শুনে করম রাজার কাছে নিবেদন করবার প্রতিশ্রুতি দিল করম। তারপর এগিয়ে চললো আবার। চলছে চলছে, চলছে তো চলেইছে। দেখলে সামনে এক বিশাল প্রান্তর। কচিকচি দূর্বা ঘাসে ভরা সবুজ মখমলের মতো মনে হচ্ছে। আর সেই তৃণ ভূমিতে মনের আনন্দে চরে বেড়াচ্ছে একপাল গাই-গোরু। লাল, কালো, সাদা—নানা বর্ণের সব হৃষ্ট পুষ্ট গোরু। করম ভাবলো গোঠের মধ্যে ঢুকে দুধ দুয়ে খেয়ে যাবো। কিন্তু দুর্ভোগ যখন আছেই—তখন গাই-ই বা দুধ দেবে কেন? করমকে দেখে এ গাই তেড়ে আসে শিং বাগিয়ে ও গাই কসিয়ে দেয় চাট। আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বললো, 'হায় করম রাজা'। করম রাজার নাম শুনে সব গাই স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে যে 'শির গাই' অর্থাৎ শীর্ষ স্থানীয়া, সে জিজ্ঞেস করলো করমকে : 'কে হে তুমি করম রাজার নাম করছো'? আবার গোড়া থেকে শুরু করে সব কথা খুলে বললো করম। উৎকর্ণ ধেনুর পাল যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলো! এক বাক্যে তারা করমকে অনুনয় করতে লাগলো : 'আমাদের দুর্দশার কথা জানাতে ভুলো না ভাই'—

: কি আবার দুর্দশা তোমাদের।

: দেখছো বটে এতো বড় গোরুর পাল; দেখছো বটে সুস্তনা গাভীকুলকে; কিন্তু আমাদের কোনো বাগাল রাখাল নেই। শির গাই উত্তর দিল।

আচ্ছা, মনে থাকবে তোমাদের কথা। বলেই করম আবার মনের দুঃখে প্রান্তর ছড়িয়ে এগিয়ে চললো। মাথার উপর প্রচণ্ড তাপ, উদরের মধ্যে আগুন, অঙ্গ অবশ; আর পারে না করম। হঠাৎ দেখলো এক পাল ঘোড়া। তেল চুক্‌চুকে দেহ, উন্নত স্কন্ধ, এক একটি উচ্চৈঃশ্রবা যেন। একটি বেগবান তেজস্বী অশ্ব পেলেও কিছুটা স্বস্তি পায় করম। এই ভেবে একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু হায় করম রাজা! এ কি হলো! পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল তাকে সেই ঘোড়া, আর এলোপাথাড়ি লাথি চালিয়ে করমকে প্রায় আধমরা করে ফেললো। প্রাণপণে করম ডাকতে লাগলো তার দেবতাকে—করম রাজাকে। খট্-খট্ করতে করতে কেশর ফুলিয়ে, লেজ উঁচিয়ে ছুটে এলো শির ঘোড়া, ঘোড়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া—বললো, 'কে, কে তুমি? করম রাজাকে চেন নাকি?' কি আর করে। বাধ্য হয়ে করমকে সব কথা খুলে বলতে হয়। ঘাড় বাঁকিয়ে কান খাড়া করে সবকথা শুনলো তারা, তারপর বললো, 'তুমি ভাই আমাদের হয়ে একটি কথা জেনে এসো করম রাজার কাছ থেকে।' 'কি কথা?' 'আমাদের সওয়ার নেই, মালিক নেই। কেন নেই, সেই কথাটাই জানতে চাই শুধু, আর কি করলে সওয়ার পাবো, মালিক পাবো, সে'কথাও অম্‌নি জেনে নিও ভাই।' আচ্ছা তাই হবে।

আবার চলা। হাঁটতে হাঁটতে এক গাঁয়ের ধারে এসে আশার আলো দেখতে পেলো করম। কান পেতে শুনলো চিঁড়ে-ঢেঁকির শব্দ। সেই শব্দ ধরে এগিয়ে চললো, আশা যদি দু-এক মুঠো চিঁড়ে পাওয়া যায়। ঢেঁকিশালে পৌঁছে দেখলো, যে মেয়েটি চিঁড়ে কুট্‌ছে ঢেঁকিতে পা দিয়ে, তার পা ঢেঁকিতে লেগে আছে তো আছেই, কিছুতেই সে পা সরাতে পারছে না, আর যে মেয়েটি চিঁড়ের ধান ভাজা-ভাজা করছে তার হাতও খোলার ভেতর; কিছুতেই সে খোলা থেকে হাত ছাড়িয়ে আনতে পারছে না। ব্যাপার দেখেই তো চক্ষু চড়কগাছ, চিঁড়ে আর চাইবে কি? এদের

অবস্থা দেখে দুঃখ হলো তার। নিজের পেটও অবশ্য বাগ মানছে না। করম রাজার নাম স্মরণ করা ছাড়া আর কিই বা করবার আছে। বললে, 'হায়। হায়। করম রাজা।' 'কে তুমি গো বিদেশী? করম রাজার নাম করলে কেন?'

তাদের কাছেও খুলে বলতে হলো সব কথা। তাদের অনুরূপ অবস্থার কারণ এবং এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তি লাভের উপায়ের কথা জেনে আসার জন্যে অনুরোধ জানালো তারাও। করম সম্মত হয়েই বিদায় নিলো।

চোখে অন্ধকার দেখছে করম। পা টলছে, মাথা হেলছে, কানের ভেতর—ভোঁ-ভোঁ শব্দ; চোখে সর্ষের ফুল, সামনের পথটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। 'কে হে তুমি? দেখতে পাও না চোখে? কানা না কি?'

সম্বিৎ ফিরে পেলো করম। অজান্তে একজন বুড়োর সংগে ধাক্কা লাগিয়েছে সে। বুড়োর অবস্থাও কাহিল। জরাজীর্ণদেহ, অথর্ব, দুর্বল। তার উপর এক কাঁটার বোঝা—গোদের উপর বিষফোঁড়া। করুণা হলো করমের। বললে, হায় করম রাজা! এই কথা শুনে বুড়ো একেবারে আলাদা মানুষ। করমকে বললো সে: 'ভাই তুমি কি করম রাজাকে চেন?' আবার খুলে বললো সব কথা করম। 'দেখ ভাই, এই বুড়োর দুর্দশার কথাটা গিয়েই জানিও ঠাকুরকে।' 'কি দুর্দশা তোমার?' করম জিজ্ঞাসা করে। বৃদ্ধ বল্লো, কি যে অপরাধ করেছি আমি, কিছুতেই এই কাঁটার বোঝা নামাতে পারিনে মাথার ওপর থেকে। সব সময় কাঁটার বোঝা নিয়েই থাকতে হয় আমাকে। হায় হায় দেখ আমার দুর্ভোগ।' কাঁদ কাঁদ হয়ে বুড়ো তার আবেদন জানাতে অনুরোধ করলো করমকে। করম বললো: 'নিশ্চয়ই জানাবো; তোমার কথাই আগে জানাবো।'

ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে করম রাজার নামে মগ্ন হয়ে পথ চলতে লাগলো সে। পথেরও কি শেষ নেই? শেষ নেই কি দুঃখেরও?

অনেক দূর যাবার পর করম যা দেখলো তাতে তার প্রাণ চলে এলো কণ্ঠায়। বাঁচবার কোন পথ নেই আর—অবধারিত মৃত্যু—পাহাড় প্রমাণ দেহ নিয়ে মুখব্যাদান করে পড়ে আছে পথের উপর। চোখে তার অগ্নিদ্যুতি, নিঃশ্বাসে ঝটিকা। বিচিত্র বর্ণাকৃতি সেই দেহ—ভয়ংকর একটা অজগর। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলো করম। বহু বিপদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে সে। কিন্তু আজ আর পরিত্রাণ নেই। 'হায় করম রাজা তোমার দেখা পেলুম না'। 'কে তুমি'? 'আমি কর্মা'। চোখ খুললো করম। 'করম রাজার নাম করলে কেন?'

'তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছি তাই। করম ছাড়া কে বাঁচাবে বল?' অভয় দিলো বিরাটদেহী নাগরাজ, বললে, 'ভয় নেই, কিছু করবো না আমি। তুমি শুধু জিজ্ঞেস করে এসো করম রাজাকে, কেন আমি পাহাড়ের মতো অনড়; কিছুতেই নড়তে পারি না।' করমের ধড়ে প্রাণ এলো। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই জানাবো তোমার কথা—অজগরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললো করম। দেখলো, সামনে এক ডুমুর গাছ। পাকা ডুমুর গাছের তলায় পড়ে আছে। যাক বাঁচা গেল, ডুমুর খেয়েই পেটটাকে শান্ত করা যাক। এই ভেবে কতকগুলো ডুমুর কুড়িয়ে গামছার খুঁটে বাঁধলো। তারপর যে ডুমুরটিকে ভাঙে, সেই ডুমুরেই বিজ বিজ করছে পোকা। 'হায় করম রাজা'! ডুমুর গাছ শুনলো করমের দীর্ঘ নিঃশ্বাস, বললো, 'করমের নাম করলে, তুমি কোত্থেকে আসছো, যাবে কোথায়'? আবার গোড়া থেকে শুরু করে সব কথাই বললো করম।

এবারে ডুমুরগাছের আবেদন জানাবার পালা। বললো: 'তাহলে যাচ্ছোই যখন—করম রাজার কাছে, আমার আবেদনটাও জানিও, কেন আমার ফল অভক্ষ্য? পাকলে পোকায় ভরা কেন'? 'বেশ, মনে, থাকবে তোমার কথা'।

আরো বহু পথ বহু প্রান্তর, অরণ্য, নদী, গ্রাম, পর্বত আর নগর অতিক্রম করে সীমাহীন-নীলসাগরের তীরে এসে পৌঁছুলো

করম। উত্তাল দুর্দমনীয় তরঙ্গ গর্জন করতে করতে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। দিগন্তহীন-সমুদ্র, পার হবে কি করে। এই কথা ভাবতে লাগলো করম, সমুদ্রের তীরে বসে। বসে বসে ভাবছে তো ভাবছেই—বেহুঁস হয়ে। হঠাৎ বিরাট এক কুমীরকে দেখে ভাবনা-চিন্তা উড়ে গেল। প্রাণ-বাঁচানোর জন্য আকুল হয়ে উঠলো সে। 'হায় হায়, করমরাজা'—বলে চেঁচিয়ে উঠলো সে। কুমীর বললো, 'করমের নাম করছো কেন'? ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে সব কথা খুলে বললো করম। কুমীর বললো: 'ভয় নেই তোমার। আমি তোমায় সমুদ্র পার করে দেব আমার পিঠে চড়িয়ে। শুধু একটি কথা তুমি জেনে এসো কেন আমি ডুবতে পারি না, রাতদিন কেন ভেসে থাকতে হয় আমাকে।' প্রতিশ্রুতি দিলো করম আর ভয়ে ভয়ে শেষ পর্যন্ত কুমীরের পিঠেই চড়ে বসলো। যা থাকে কপালে। হয় করম রাজাকে খুঁজবো না হয় মরবো।

তারপর কত দিন—কত রাত কেটে গেল কুমীরের পিঠের ওপর। তীরে এসে যখন পৌঁছুলো তখন পূর্বদিগন্তে নতুন প্রভাত; লাল হয়ে গেছে আকাশ আর সমুদ্র। অদূরে এক বিরাট কুণ্ডে করম রাজা হাবুডুবু খাচ্ছেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না করম। 'সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে' এসে কি সফল হলো তার স্বপ্ন, তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। সেই কুণ্ডের দিকে পাগলের মতো ছুটে চললো করম। কিন্তু একি মর্মান্তিক দৃশ্য! কুণ্ডটা যে বিষ্ঠা কুণ্ড। তার ভিতরে করম রাজা হাবুডুবু খাচ্ছেন। প্রাণপণে ছুটছে করম। বিষ্ঠা থেকে—ঠাকুরকে উদ্ধার করতেই হবে। কুণ্ডের ধারে এসে শুনতে পেলো করম রাজা বলছেন, 'হাঁ, হাঁ! করছিস কি? দেখছিস না এটা বিষ্ঠাকুণ্ড, কিলিবিল করছে পোকায়'। কে শোনে কার কথা। করম ততক্ষণে বিষ্ঠাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, সমস্ত ঘৃণা, সংকোচ বিসর্জন দিয়ে। 'ছুঁবি না, খবরদার ছুঁবি না আমাকে'—করমরাজা গর্জন করেন। সে কি আর কথা শোনে। একেবারে বুকের ওপর জাপটে ধরলো করম রাজাকে। আর সে

কিছুতেই ছেড়ে দেবে না তার ঠাকুরকে। করমরাজা সন্তুষ্ট হলেন। এক মুহূর্তে—বিষ্ঠাকুণ্ডের কোন চিহ্নও রইলো না। করমের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন করমঠাকুর। বললেন: 'কি জন্য এসেছো, বল; কি চাও তুমি?' কিছুই চাইনে শুধু তোমাকে চাই। তোমাকে নিয়ে যেতে চাই ঠাকুর। করম হাত জোড় করে রইলো। কপট রোষ প্রকাশ করলেন করম রাজা: কিছুতেই যাবো না আমি, কিছুতেই না। তোর দাদা ধরম আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আমাকে অশ্রদ্ধা করেছে; কিছুতেই যাবো না আমি।'

'কিন্তু আমি ছাড়লে তো? তোমাকে যখন পেয়েছি, কিছুতেই ছাড়বো না আমি। ধরম তাঁর ভুল বুঝেছে; তোমাকে না পেলে এইখানেই প্রাণ বিসর্জন দোবো আমি।' করম রাজা বললেন: 'আচ্ছা, সব অপরাধ ক্ষমা করলুম। আমি যাবো; তবে, তোর সংগে নয়। তুই এগিয়ে গিয়ে আমার পূজোর আয়োজন কর। বন থেকে করম গাছের শাখা নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা কর; আমি যাবো ঠিক সময়ে, ভাদ্র মাসে—শুক্লপক্ষে—একাদশী তিথিতে।'

ভক্ত করমকে বহু বছর ধরে অভুক্ত রেখেছিলেন করম দেবতা। বারো বছর পার হয়ে গেছে জানতে পারেনি সে। বারো বছর ধরে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিল করম। করম রাজা তাকে এবারে খাদ্য দিলেন। খাবার খেয়ে করম ফিরলো তার দেশের পথে, যে পথ দিয়ে এসেছে সেই পথে। কিছু দূর যেতে না যেতেই মনে পড়লো পথের ঘটনা। আবার ফিরলো সে। করম ঠাকুর জানতে চাইলেন: 'আবার কেন?' 'অনেক কথা আছে আমার। উত্তর পেলে যাবো।' 'বল্ কি কথা?' একে একে পথের সব ঘটনার কথা, তাদের আবেদন-নিবেদনের কথা, কর্মা জানালো করম ঠাকুরকে। ঠাকুর একে একে তার উত্তর দিলেন। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরলো করম। কুমীর তখনো অপেক্ষা করছে সমুদ্রতীরে। করমকে দেখে বললো: 'জানতে পারলে আমার কথা'? 'জেনেছি,

আগে আমাকে পার করে দাও, তারপরে বলবো।' বেশ, তাই হোক। করমকে ওপারে নিয়ে গেল কুমীর। তীরে নেমে করম বললে, 'শোন, করম রাজা বললেন যে কুমীর অনেক জীব হিংসা করেছে, হত্যা করেছে বহু নরনারীকে ; তার পেট বোঝাই গহনাপত্র। সেই গহনাপত্র যদি দান করতে পারো সদ্‌ব্রাহ্মণকে তাহলেই রক্ষে, তাহলেই তুমি ডুবতে পারবে, সব সময় ভেসে থাকতে হবে না।' কুমীর শুনলো সব, তারপর বললো ঃ 'কথাটা ঠিক, বহু নরনারীকে খেয়েছি আমি, তাদের গয়নার্গাটিও আমার উদরে ; দান করতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু কোথায় পাবো ভাই বামুন, কোথায় পাবো বোষ্টম, তুমিই আমার বামুন, তুমিই আমার বোষ্টম, তুমিই নিয়ে যাও এই সব।' এই বলে পেট থেকে উগরে দিল বহু মূল্যবান অলংকারসমূহ। হৃষ্ট চিত্তে সমস্ত গ্রহণ করে করম চললো এগিয়ে।

আবার সেই ডুমুরগাছ। প্রশ্ন করলো ডুমুরগাছ ; 'কি ভাই, আমার কথা জেনেছো তো ?' 'হ্যাঁ জেনে এলুম বৈকি। তোমার শেকড়ের নীচে একটা কলসী পোঁতা আছে, টাকার কলসী। ওটা সদ্‌ব্রাহ্মণকে দান করো, তাহলেই তোমার দুঃখ দূরে যাবে।' ডুমুবগাছ বললো, 'ঠিক কথা। কিন্তু কোথায় পাবো বামুন, কোথায় বোষ্টম। তুমিই আমার সব, তুমিই নাও এই টাকার কলসী।' আর দ্বিরুক্তি না করে টাকার কলসী খুঁড়ে বার করলো করম। তারপর যাবার সময় গোটাকয়েক ডুমুর মুখে দিয়ে দেখে যেন অমৃত। বেশ মিষ্টি লাগছে।

এবারে দেখা হলো সাপের সংগে। সাপের পেটেও অনেক গয়নার্গাটি রয়েছে, অনেক মানুষ মেরেছে সে, হত্যা করেছে অনেক পশু, তাই এই স্থবিরতা। সাপও উদ্‌গীরণ করলো অলংকারপত্র। সেগুলিও করমেরই সম্পত্তি হলো। কাঁটার বোঝা মাথায় সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধটি ছিল হাড় কৃপণ। অনেক টাকা তার, তবু একটি পয়সাও খরচ করতে রাজী নয় সে। করম তাকেও করম রাজার কথা বললো। বুড়োকে দান করতে হবে সব।

এক্ষেত্রেও সদ্‌ব্রাহ্মণ হলো করম নিজে। চিঁড়ে বিক্রি করে সেই মেয়ে দুটি বেশ পয়সা জমিয়েছিলো। দুর্গতির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য তারাও সব পয়সাকড়ি তুলে দিল করমের হাতে।

ঘোড়ার পাল তখনও চরে বেড়াচ্ছে সেই প্রান্তরে। সেখানে গিয়ে করম বললো যে, শির ঘোড়াটি দিতে হবে সদ্‌ব্রাহ্মণকে। 'তুমিই ব্রাহ্মণ, তুমিই বৈষ্ণব'—বলে শির ঘোড়া রাজী হলো করমের বাহন হতে। সংগে সংগে সব ঘোড়াই চললো তাদের নতুন মালিক করমের অনুবর্তী হয়ে। করম রাজার নির্দেশ অনুসারে 'শির গাই'ও তার দলবল নিয়ে করমের সংগে চললো।

এবার শুকনো পুকুর। 'তোমার চার কোণে চারটে টাকায় ভরা কলসী পোঁতা আছে। কোন সদ্‌ব্রাহ্মণকে তা দান করো, পুকুরে আবার কাকচক্ষু জল হবে', বললো করম। পুকুর বললো, 'তুমিই আমার সব। টাকার কলসী তোমার-ই।'

স্বপ্ন সার্থক হলো করমের। করম গোঁসাই, করম রাজা, করম ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করে সব কিছু ফিরে পেলো সে। ঘোড়াশালে ঘোড়া, গো-শালায় গোরু, গোলাভরা ধান আর কলসী ভরা টাকা। আর কি চাই।

একাদশীর দিনে করম গাছের ডাল আবার আনা হলো কেটে,—পূজো হলো ধূমধাম করে। ভোজ হলো, নাচ হলো, গান হলো, বাজনা হলো। হাঁড়িয়া খেয়ে মাতাল হলো সবাই। করম ঠাকুর সন্তুষ্ট হলেন। সেই রীতি আজও চলেছে। বহুদিন ধরে চলবে, যদ্দিন এই পৃথিবী থাকবে। ধরম-করম দু'ভাই মিলে করম শাখা ছুঁয়ে শপথ করলে:

আমার করম
ভায়ের ধরম—

[সীমান্ত বাংলার লোকযান। পৃঃ ১১৮। ড. সুধীর কুমার করণ]।

আজও পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার বর্ষার রেশ যখন একটু ঘনীভূত হয়ে আসে, যখন খরাক্লান্ত ঊষর প্রান্তর জলে পরিপূর্ণ

হয়ে ওঠে, কংকরময় গৈরিক প্রান্তর যখন শ্যামল রূপ পায়, শাল আর মহুয়ার পাতা যখন গাঢ় সবুজ হয়ে দূর থেকে কালো দেখায়, ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে দূরের রুক্ষ পাহাড়গুলো, মাঠ ভরে যায় সবুজ সবুজ ধানে—তখন এই অঞ্চলের মানুষের প্রাণে এক নতুন হিল্লোল জাগে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার প্রান্তরে কিংবা থক্‌থকে অন্ধকারে। জোনাকিভরা প্রান্তরের কোণ থেকে বাজতে শুরু করে ধামসা, কেঁদরা, বাঁশী আর ঢোল এবং গান শুরু হয় করম পূজার :

আজ ত'রে করম রাজা ঘরে দুয়ারে।
কাল তরে করম রাজা কাঁসাই নদীর ধারে॥
করম কাটতে যায়েছিলি করম টলমল।
রাজার বেটি দুলালী টাঙ্গি ঝলমল॥

আর তখন ব্রতকথার নির্দেশমত কাহিনী বলার সংগে সংগে যথাসময়ে ডুমুর, মাটির ঘোড়া, চিঁড়ে-দুধ ইত্যাদি উৎসর্গ করতে হয় করম গোঁসাইকে। শুক্‌নো পুকুরের কথা বলতে গিয়ে করম ঠাকুরকে জল দানও করতে হয়। তারপর ব্রতধারীরা ডাল ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করে।

করম ব্রতকথার উল্লিখিত চরিত্রগুলির সমস্তই আজও ব্রতের উপাচার সামগ্রীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। কারণ ব্রতকথাগুলি সীমান্ত-বাংলার মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। করম ব্রতকথাটির যে কয়টি বৈশিষ্ট্য সর্বাগ্রে মনে আসে তা হচ্ছে প্রথমতঃ কাহিনীটির আদিমভাব। কাহিনীর বলার ভঙ্গি, কাহিনীর বিন্যাস রীতি পুরোপুরি প্রাচীন, অবশ্য সব ব্রতকথারই তাই। দ্বিতীয়তঃ করম ব্রতকথা যে একান্তভাবে পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চল ও ছোট-নাগপুরের আদিবাসীদের ব্রতকথা তার চিহ্ন আছে পুকুরের জল শুকানোর ইঙ্গিতটিতে। পুকুর করমকে করম রাজার কাছে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল যে কোন্-অভিশাপে সে শুষ্ক ও জলহীন। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার খরা-পীড়িত

অঞ্চলের গ্রীষ্মের শুষ্কপ্রায় জলাশয়গুলি এর প্রমাণ-স্বরূপ। অবশ্য করম রাজার দয়া হলে শুষ্ক পুকুরও জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে —এই বিশ্বাসটি আজও এ অঞ্চলের জনমানসে সদা জাগ্রত। তৃতীয়তঃ আদিম ব্রতকথার মধ্যে হিন্দুধর্মের সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের অনুপ্রবেশ। করমকে করম রাজা বলেছিলো যে, —অভিশপ্ত ব্যক্তি জীব ও বৃক্ষের দল তাদের সঞ্চিত ও প্রোথিত অর্থ হয় ব্রাহ্মণকে নয় বৈষ্ণবকে দান করবে। আজও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুব জেলার পচাপানি, কুইলাপাল, বাঁশপাহাড়ী, হাতিবাড়ী, ডোমজুড়ি, অযোধ্যা প্রভৃতি গ্রামে বিশেষ করে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব আদিবাসী ও গ্রাম্য হিন্দুগণের মধ্যে বিশেষভাবে যে সক্রিয় সেটাও লক্ষ্য করা গেছে।

করম ব্রতকথাটিরও অভিপ্রায় (motif) বিচার প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রথমতঃ এই কথাটিতে প্রথম পর্যায়ে যে অভিপ্রায়টি প্রকাশ পেয়েছে তা Stith Thompson অনুযায়ী ভাগ্য বিপর্যয় বা Reversal of Fortune। ব্রতকথার প্রথমাংশে এক সদাগরের সব কিছুই ছিল—বাড়ী ছিল, ঘর ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল, গোলাভরা ধান ছিল, দুই পুত্র ছিল। ধরম ও করম একজন বাণিজ্য করে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেছিল, অন্যজনে চাষবাস করে বিত্তবান হয়েছিল। কিন্তু ধরম করম গাছের ডাল ছুঁড়ে ফেলায় করম রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের সমস্ত কিছু বিনষ্ট করে দেন এবং ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে ধরম ও করমকে মজুরের কাজ নিতে বাধ্য হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সুযোগ ও ভাগ্য অর্থাৎ Chance and Fate। এই অভিপ্রায়ের বিচারে দেখা যায় করম নানা দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-বিঘ্ন সহ্য করে করম রাজার সন্তুষ্টি সাধনের দ্বারা বহু ধনরত্ন, সুপুষ্ট তেজী অশ্ব লাভ করেছিলো। ভাগ্য বিপর্যয় থেকে সে ভাগ্যের উচ্চশিখরে উঠেছিলো। তৃতীয়তঃ যে অভিপ্রায়টি গল্পটির মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল তা হচ্ছে Marvels বা বিস্ময়। করম রাজাকে খুঁজতে

গিয়ে কর্মা বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে, যেমন—চিঁড়ে কোটা মেয়েটির হাত আটকে থাকা, কাঁটা বোঝাই বৃদ্ধের মাথা থেকে বোঝা নামাতে না পারা, বিরাট অজগরের সম্মুখীন হওয়া, পুকুরের কথা বলা, ডুমুর গাছের বাক্‌শক্তি (Talking tree), কুমীরের পিঠে করে সমুদ্র পার হওয়া—এ সমস্তই বিস্ময়কর ঘটনা যা করমের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। চতুর্থতঃ ইন্দ্রজাল বা Magic অভিপ্রায়টি গল্পের পরিসমাপ্তিতে বিশেষভাবে সক্রিয়। করম রাজাকে জোর করে ছোঁয়ামাত্র বিষ্ঠা অন্তর্হিত হয়েছে, কুমীরের পেট থেকে সোনা-দানা বার করে দেওয়াতে কুমীর ডুবতে পেরেছে, ডুমুর গাছের তলা খুঁড়ে কলসী বার করে নেওয়াতে ডুমুর গাছে সুমিষ্ট ডুমুর ফলেছে, অনুরূপভাবেই শুষ্ক পুকুর জলে পরিপূর্ণ হয়েছে। আর সমস্তই সম্ভব হয়েছে করম রাজার ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায়।

করম ঠাকুর একান্তভাবে আদিবাসী সমাজেরই দেবতা। কিন্তু পরবর্তী যুগে হিন্দু ও আদিবাসী মানসিকতার সঙ্গে ধর্মের যখন সংমিশ্রণ ঘটলো তখন এই দেবতার পূজাও হিন্দু জনসমাজে গৃহীত হয় এবং এই করম ঠাকুরের ব্রতকথাও প্রচার লাভ করে। কিন্তু করম ঠাকুরের ব্রতকথায় যে আদিম রূপটি বর্তমান গল্পে উপস্থিত তার কোনও চিহ্ন কিন্তু বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচারিত করম ব্রতের গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় না। পূর্ব-মৈমনসিংহ থেকে প্রাপ্ত, শ্রীপ্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী সংগৃহীত 'ব্রত ও আচার' গ্রন্থে দেখা যায় করম ঠাকুরের গল্পটি অন্যভাবে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে গল্পের শুরু হচ্ছে, 'এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, তাহার দুই মেয়ে, জয়া আর বিজয়া'। তারপর জয়া-বিজয়া কি ভাবে বিমাতার অত্যাচারে গৃহ ত্যাগ করে অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে করম ঠাকুরের পূজা করে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিলো তার বিস্তৃত কাহিনী আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, করম ঠাকুরের ব্রতকথা কেবল পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের মধ্যে, কিংবা ছোটনাগ-

পুরের পার্বত্য অঞ্চলে অথবা অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত নয়, বরং এই ব্রতকথাটি হিন্দু জন-মানসের গভীর স্তরে বিস্তারিত হয়ে নানা কাহিনী ও গল্পকথার মধ্যে প্রসারিত হয়ে পড়েছে।

'ইতু ব্রত' বাংলা দেশের একটি অতিপ্রচলিত ব্রতানুষ্ঠান। কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন একটি নতুন গামলা অথবা সরাতে পাতলা এঁটেল মাটি দিয়ে তার উপর ঘট বসিয়ে চারদিকে ধান, মান কচু, হলুদ এইসব গাছ একটি করে বসিয়ে তার পাশে মটর, কলমী, বট, সরষে, শুষনীর ডাল বসিয়ে পাঁচকলাই ভিজান ও পঞ্চশস্য ঘটের চার দিকে ছড়িয়ে দিতে হয়। অঘ্রাণ মাসের প্রতি রবিবারে পূজা এবং সংক্রান্তির দিন সাধ দিয়ে—ইতু বিসর্জন দেওয়া হয়। এই ইতু পূজাটি একান্তভাবে শস্যপূজা। এই শস্য বা বৃক্ষকে পূজা করা আদিম জনগণের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ, যা গ্রাম্য মানুষের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার খরা পীড়িত অঞ্চলে আজও এই ব্রতের বহুল প্রচলন আছে। পূজার শেষে ইতুর ছড়া বলবে মেয়েরা :

ইতু ব্রত

কাটি মুঠি কুড়াতে গেলাম, ইতুর কথা শুনে এলাম।
একথা শুনলে কি হয়? নির্ধনের ধন হয়।
অপুত্রের পুত্র হয়, আইবুড়োর বিয়ে হয়,
অশরণের শরণ হয়, অন্ধের চক্ষু হয়,
অন্তকালে স্বর্গে যায়॥

এই ইতুর ব্রত কথাটি কি এবার দেখা যাক :

এক দেশে এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বাস করতো, তাদের দুটি মেয়ে উমনো আর ঝুমনো। ব্রাহ্মণ ভারী গরীব। কোন রকমে দিন কাটতো। একদিম ব্রাহ্মণের পিঠে খাবার বড় সাধ হলো, সমস্ত যোগাড়-যন্ত্র করে দিয়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলল যে সে যদি মেয়ে দুটোকে একটুও পিঠে দেয় তাহলে তাদের বনবাসে দেবে। ব্রাহ্মণী আর কি করে সন্ধ্যা হতে না হতে মেয়ে দুটোকে ঘুম পাড়িয়ে

পিঠে ভাজতে বসলো। আর ব্রাহ্মণ করল কি যাতে তাকে ফাঁকি দিয়ে ব্রাহ্মণী মেয়েদের পিঠে না দিতে পারে তার জন্যে কতকগুলো তেঁতুল বীচি নিয়ে রান্না ঘরের কানাচে বসে এক একটা পিঠের ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হচ্ছে আর ব্রাহ্মণ একটি করে তেঁতুল বীচি গুণছে। রান্না ঘরের ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দে উমনো আর ঝুমনোর ঘুম ভেঙে গেল। তারা রান্নাঘরে এসে আব্দার করতে লাগলো একখানা পিঠের জন্যে। ব্রাহ্মণী আর কি করে দুজনকে পিঠে দিয়ে বলল—যা তোরা চুপি চুপি খেয়ে মুখ মুছে শুয়ে পড়। পিঠে ভাজা শেষ হতে—ব্রাহ্মণ গোণা তেঁতুল বীচি নিয়ে এসে বলল ঘরণী পিঠে দে, বামুন এক একটা পিঠে খায় আর এক একটা তেঁতুল বীচি পাশে সরিয়ে রাখে। সব খাওয়ার পর দুটো তেঁতুল বীচি বেশী রয়ে গেল। আর পিঠে কোথায়? বলে ব্রাহ্মণ চীৎকার করে উঠলো। ব্রাহ্মণী কত বোঝাল। কিন্তু ব্রাহ্মণ সব বুঝতে পেরে সকাল না হতেই মামার বাড়ীর নাম করে মেয়ে দুটোকে নিয়ে বনে দিতে চললো। উমনো-ঝুমনো কখনো মামার বাড়ী যায় নি। আনন্দে তারা বাবার সঙ্গে পথ চলতে লাগলো। অনেক পথ চলার পর তারা একটা গভীর জঙ্গলে এসে উপস্থিত হলো। ঝুমনো বললো —'বাবা, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে, আর আমি চলতে পারছি না'। সেকথা শুনে ব্রাহ্মণ কল্লে কি, একটা বড় বট গাছের নীচে বসিয়ে জল আনার ছুতো করে বাড়ী চলে গেল।

উমনো-ঝুমনো এত পথ হেঁটে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, গাছের নীচে ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর জেগে উঠে দেখে রাত হয়ে গেছে অনেক, আর সব দিকে বাঘ-ভাল্লুক ডাকছে। বাবা কোথায়? ভয়ে জড়সড়ো হয়ে দুজনে কাঁদতে লাগলো। উমনো বলে বসলো, 'কেঁদে আর লাভ কি? পিঠে খেয়েছিলুম বলে বাবা আমাদের বনবাসে দিয়ে গেছেন'। তখন তারা আর কি করে। বটগাছের কাছে যেয়ে বললে—'বট বৃক্ষ, বট বৃক্ষ! তুমি যদি সত্যকার বটবৃক্ষ হও তবে আমাদের দুজনকে তোমার

গহ্বরে স্থান দাও'। বটগাছ অমনি দু' ফাঁক হয়ে গেল, উমনো আর ঝুমনো গাছের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। আবার সকাল হতে তারা বটবৃক্ষকে বলে বেরিয়ে পড়লো। বন থেকে ফলমূল যোগাড় করে খেল। একদিন তারা ঘুরতে ঘুরতে দেখলো এক জায়গায় দেবকন্যারা আসন পেতে পূজা করছে। তাদের দেখে দেবকন্যারা বলল, 'তোরা কে রে'? উমনো-ঝুমনো বললে—'আমরা বড় অভাগিনী। পিঠে খেয়েছিলুম বলে বাবা আমাদের বনে দিয়ে গেছে।' দেবকন্যারা বললো, 'যা তোরা নেয়ে-ধুয়ে এসে আমাদের সঙ্গে ইতুপূজা কর, তোদের সব দুঃখ দূর হবে।'

যেমনি শোনা অমনি কাজ। উমনো-ঝুমনো পুকুরে ডুব দিয়ে এলো। দেবকন্যারা কেউ দিলে ঘট, কেউ আসন, কেউ পিঠুলি গুলে, কেউবা পূজোর নিয়ম বলে দিলো। পূজোর পরে দেবকন্যারা বললেন আজ অগ্রাণ মাসের রবিবার। এই মাসে এই দিনে উপবাস করে যে শুদ্ধচিত্তে ইতুর পূজা করে তার আর দুঃখ থাকে না, এই বলে দেবকন্যারা অন্তর্হিত হলো। উমনো-ঝুমনো দেখে কি, তাদের দেহে রূপ আর ধরে না। তখন তারা ইতুর ঘট নিয়ে বাড়ী চললো। ইতুর কৃপায় ফেরার পথ ছোট হয়ে গেল। এক গা গয়না পরে উমনো আর ঝুমনো ঘরে এলো। পাড়াপড়শী সকলে তো অবাক। ব্রাহ্মণী মেয়েদের ফিরে পেল, কুঁড়ে হলো রাজ প্রাসাদ, হাতীশালে হাতী হলো ঘোড়াশালে ঘোড়া হলো, মরাই ভরা ধান হলো, গোয়াল ভরা গরু। ব্রাহ্মণ ফিরে এসে সব দেখে অবাক। ব্রাহ্মণীকে যেই বলেছে, 'দেখলি ব্রাহ্মণী অলক্ষণে মেয়ে দুটোকে তাড়িয়ে দিতেই কেমন ধনদৌলত হয়েছে।' অমনি মেয়েরা এসে বললো, 'ইতু-ঠাকুরানীর কৃপায় এইসব হয়েছে, অত অহংকার করো না!'

এভাবে দিন যায়। একদিন সেই দেশের রাজা শিকারে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তাঁর সেপাই-লস্করের খুব তেষ্টা পেল। জল কোথাও নাই, একটা বড় দালান দেখতে পেয়ে সেপাইরা

জল নিতে এলো। উমনো করলো কি, ইতু ঠাকুরানীর একটা ছোট্ট ভাঁড়ে করে এক ভাঁড় জল দিল। রাজা ত রেগে অগ্নিশর্মা, এত লোক আর ঐটুকু ভাঁড়ে জল। উমনো বললে ওতেই হবে। যেই বলা সেই কাজ। ঐ জল রাজা খেল তবুও ভাঁড়ের জল ফুরোয় না। রাজা দেখে অবাক। ব্রাহ্মণকে ডেকে বললো আপনার কন্যা দুটিকে আমার সঙ্গে ও আমার বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে দিন। ব্রাহ্মণের আনন্দ তখন দেখে কে। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বড় ধুম, ভারে ভারে দই, ঝাঁকা ঝাঁকা মাছ, বস্তা বস্তা আলু, ময়দা-ঘি আসছে—কি না উমনো-ঝুমনোর বিয়ে। বিয়ের পর মেয়ে-জামাই চলে যাবে। সেদিন ছিল অঘ্রাণ মাসের রবিবার। উমনো সকালে উঠে লুচি-সন্দেশ খেল, জল খেল। ঝুমনো পুকুর ঘাটে স্নান করে আসন পেতে, ঘট নিয়ে ইতু পূজার সব যোগাড় করে দিদিকে ডাকতে গেল। উমনো বললো ‘ভাই, আমি জল খেয়েছি, আমার আজ আর ইতু পূজা করা চলবে না। তাছাড়া আমি হ’লাম রাজার রাণী আমার কি ওসব করা সাজে।’ ঝুমনো কি আর করে, মাটিতে রেখা দিয়ে একলাই ইতুর কথা কইলো। যাবার সময় হলো। উমনো পান চিবুতে চিবুতে সোনার পাল্কীতে উঠলো, ঝুমনো ইতুর ঘট নিয়ে ডুলিতে চড়লো। উমনো যে পথ দিয়ে গেল কেবল মড়া যায়, গাছপালা শুকিয়ে যায়, রোদের তাপে প্রাণ যায় যায় হয়ে এলো, আর ঝুমনো যে পথে চললো সে পথে শাঁখ বাজতে লাগলো, কাঁচা শস্যে মাঠ পরিপূর্ণ হলো, লোকজনের মোটেই ক্লান্তি হলো না রোদের তাপে। এদিকে হলো কি ঝুমনোর স্বামীর দিন দিন উন্নতি হতে লাগলো, আর উমনোর স্বামী রাজার হাতীশালে হাতি মরলো, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরলো, গোয়ালে গরু মরলো—রাজ্য যায় যায়। সকলে হায় হায় করতে লাগলো কি অলক্ষুণে বৌ নিয়ে এসেছে আমাদের রাজা। রাজা তখন সাত-পাঁচ ভেবে কোটালকে বললে, উমনোকে বনবাসে দিয়ে আসতে। কোটাল করলে কি রানীকে বনবাসে না দিয়ে বোন

ঝুমনোর বাড়ীতে পৌঁছে দিল। ঝুমনো ত দিদির অবস্থা দেখে অবাক। সব শুনে ঝুমনো বললে, 'ইতু পূজা না করে তোমার এই ফল, আবার অঘ্রাণে ইতু পূজা কর, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দিন যায়, মাস যায়, উমনো ঝুমনোর বাড়ীতে থাকে। অঘ্রাণ মাস এলো। ঝুম্‌নো বললো, 'দিদি কাল রবিবার সকলে উঠে নেয়ে-ধুয়ে ইতু পূজা করতে হবে।' ঝুমনো পুকুর থেকে নেয়ে এসে দিদিকে ডাকলো, কিন্তু উমনো তখন জল খেয়ে ফেলেছে। এরকম করে তিনটি রবিবার গেল। শেষ রবিবারে ঝুমনো উমনোকে কাছে নিয়ে আঁচলের সঙ্গে গেরো বেঁধে শুলো। ভোর হতেই চান করতে গেল দুজনে। তারপর ইতু পূজা হলো। পূজোর শেষে বর চাইলো রাজার যেন তাকে মনে পড়ে, আর সে যেন সুখে থাকে। ইতুর কৃপায় রাজার রানীর কথা মনে পড়লো কোটালকে হুকুম দিলো রানীকে খোঁজ করবার জন্যে। কোটাল এসে সংবাদ দিলো, রাজা নিজে না গেলে রানী আসবেন না। রাজা চতুর্দোলায় করে উমনো রানীকে নিয়ে এলো রাজপুরীতে। আবার হাতিশালে হাতি হলো, ঘোড়াশালে ঘোড়া। উমনো-ঝুমনোর কার্তিকের মতো ছেলে হলো। সুখে দু'বোন স্বামী পুত্র নিয়ে ঘরসংসার করতে লাগলো। ইতু ঠাকুরানীর পূজা সেই থেকে পৃথিবীতে প্রচার হলো।

উপরোক্ত ব্রতকথাটির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমতঃ মামার বাড়ী নিয়ে যাবার নাম করে ছেলে বা মেয়েকে বনে বিসর্জন দেওয়া বাংলা দেশের লোককথার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ বিস্ময় বা Marvel, বটবৃক্ষ বিস্ময়করভাবে উমনো-ঝুমনোর কথা শুনে তার কোটর ফাঁক করে উমনো-ঝুমনোকে আশ্রয় দিয়েছে। এই পরিকল্পনাটি একান্তভাবে বাংলার রূপকথা-ব্রতকথার নিজস্ব সম্পদ। তৃতীয়তঃ ইন্দ্রজাল বা Magic অভিপ্রায়টি এখানেও বিশেষ সক্রিয়। ইতুদেবীর বরেই হোক আর যে কারণেই হোক একটি ছোট ঘটের জল রাজা এবং তাঁর সমস্ত

লোকজনের তৃষ্ণা মিটাতে সক্ষম হয়েছে। ঐন্দ্রজালিক উপায়ে যেন ঘটটি প্রতিবার জলপূর্ণ হয়ে গেছে। চতুর্থতঃ এরই ফলে রাজার ছেলে ও মন্ত্রীপুত্র উমনো ও ঝুমনোকে বিবাহ করেছে। ভিখারীর মেয়ের রাজরানীতে পরিণত হওয়ার যত ঘটনা বাংলার ব্রত-কথায় পাওয়া যায় তার সবই দেবতার আশীর্বাদে কার্যে পরিণত হয়েছে। এখানে ['Chance and Fate'] সুযোগ এবং ভাগ্যের অভিপ্রায়টি বিশেষভাবে সক্রিয়। সবচেয়ে বড়কথা এই ব্রতটির মধ্যে পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের খরা পীড়িত অঞ্চলের ছাপ আছে। কারণ ব্রতকথার এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, উমনো যে পথে যায়, সে পথে কেবল মড়া যায়, গাছপালা শুকিয়ে যায়, রোদের তাপে সকলের প্রাণ যায় যায় হয়। এ বর্ণনা পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের খরা পীড়িত অঞ্চলেরই বর্ণনা। সেই খরা পীড়িত অঞ্চলের নারী তাই ইতুর ব্রত করে একটি সরায় নানা রকমের শস্যের বীজ বপন করে তাতে জল ঢেলেছে। আসলে এটি একটি প্রতীক। শস্যক্ষেত্র জলে পরিপূর্ণ হয়ে মাঠ শস্যে ভার যাক সেইটিই এই ইতুর ব্রতের নারীগণের একমাত্র কামনা। বৃষ্টিহীন এই অনুর্বর প্রান্তরের মানুষের মনে বৃষ্টির জন্যে যে কি প্রার্থনা তা এ অঞ্চলের লোকগীতি, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, লোককথা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানগুলি লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যাবে।

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের একটি অন্যতম উৎসব ইঁদপরব। এই পরবের মধ্যে বৈদিক হিন্দু দেবতা ইন্দ্র এবং অনার্যদের 'বৃক্ষদেবতা' একই সঙ্গে মিশে গেছেন। আসলে এ অনুষ্ঠানটি বর্ষার দেবতা ইন্দ্রের পূজা, এবং বৃক্ষ পূজার মাধ্যমেই সেটি সম্পাদিত হয়েছে। ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে গ্রামের ময়দানে একটি ২০।২৫ হাত শালগাছ প্রোথিত করে তার উপর একটি লাল শালুর ছাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, তারপর সেই শালখুঁটিকে নানা উপাচার দিয়ে পূজা করা হয়। সাঁওতাল

ইঁদ্‌পরবের ব্রত

প্রভৃতি আদিবাসী ও গ্রাম্য মানুষের দল মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করে এই উৎসব পালন করে। মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এরূপ ইঁদপরব অনুষ্ঠিত হয়। এই ইঁদপরবের নানা পৌরাণিক কাহিনী ও লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন, অসুরদের সঙ্গে রণে পরাস্ত হয়ে দেবতাধিপতি ইন্দ্রদেব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্মরণাপন্ন হন। বিষ্ণু ইন্দ্রের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে একটি ধ্বজা প্রদান করেন এবং সেই ধ্বজা নিয়ে ইন্দ্র অসুরদের পরাজিত করেন। পরে ইন্দ্রদেব সেই ধ্বজা চেদীপতিকে দান করেন। চেদীপতি নিষ্ঠাসহকারে এই ধ্বজা পূজা করায় দেবরাজ ইন্দ্র আশীর্বাদ করলেন যে, কোন রাজা যদি এই ধ্বজা পূজা করে তাহলে তার ঐশ্বর্যলাভ, শস্যবৃদ্ধি এবং সর্বকার্যে সিদ্ধিলাভ ঘটবে।

এবিষয়ে একজন গবেষকের মন্তব্য: 'আর্যরা যখন যুদ্ধে অনার্যদের পরাজিত করেছেন, রাজা হয়েছেন, তখন এইভাবে বিজয়োৎসব পালনের রীতি প্রচলিত করেছেন। যুদ্ধে যে অনার্যদের সহজে তাঁরা সর্বত্র পরাজিত করতে পারেন নি তার আভাস সুস্পষ্ট-ভাবে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেই রয়েছে। অনার্যরা জঙ্গলে বাস করত অনেকে এবং জঙ্গলের বড় বড় গাছও পূজো করতো। সেই অনার্য বৃক্ষোৎসবকেই রাজকীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে কি আর্যরা এই ধ্বজ-উৎসবে পরিণত বা রূপান্তরিত করেছেন। ['পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'। বিনয় ঘোষ। পৃ. ৩৫৩] এরই কারণ হিসেবে দেখা যায় শালবৃক্ষের খুঁটি যদি অনার্যদের বৃক্ষপূজার প্রতীক হয় তবে তার মাথার উপর ছত্র হলো আর্যদের জয়ের প্রতীক চিহ্ন। শাল খুঁটির মাথায় রাজকীয় প্রতীক চিহ্ন অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধে আর্যদের জয়লাভেরই ইঙ্গিত করে। কিন্তু পরবর্তী যুগে আর্য-অনার্য যখন পাশাপাশি বসবাস করেছে, তারা পরস্পর একীভূত হয়ে গেছে তখন উভয়েই একই সঙ্গে সংঘর্ষ ভুলে গিয়ে ইন্দ্র পূজা বা ইঁদপরবে মেতে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে, এরই কারণ হিসেবে বাংলা ভাষা, আর বাঙালী জাতির গোড়ার

কথা প্রসঙ্গে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর একটি মত প্রণিধানযোগ্য : 'এইসব আর্যাবর্তীয় ব্রাহ্মণ বাংলায় এসে উত্তর-ভারতের সঙ্গে তাদের যোগ হারিয়ে ফেলেন, আর অতীতের অন্ধকারময় যুগে—যার কোনও ইতিহাস আমাদের নেই, সেই যুগে—স্থানীয় বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে, বা ব্রাহ্মণেতর অন্য জাতের সঙ্গে, বৈবাহিক সূত্রে মিশে গিয়েছিলেন।' ['বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিক'। পৃ. ৪২] এবং এরই ফলে যে মিশ্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মানস তৈরী হয়েছিল বাংলা দেশে তারই পরিচয় আছে পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের এই সব উৎসব অনুষ্ঠানে ও ব্রতকথায়।

ওরাঁও, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী সাঁওতালদের বিশ্বাস পাহাড়ের আনাচে-কানাচে, শালবনের জঙ্গলে, শিলাময় প্রান্তরে ভূত-প্রেতের অবস্থান, অথচ সেই শালবনের ধারে, পাহাড়ের পাশে ও রুক্ষ প্রান্তরে চরে বেড়ায় গ্রামের গরু-মহিষের দল। তারপর আছে নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ। এর থেকে গো-সম্পদকে রক্ষার মানসে গড়ে উঠেছে 'বাঁধনা পরব' বা গো-ব্রত বা গো-পূজার অনুষ্ঠান। পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের প্রতি ঘরে এই পূজার অনুষ্ঠান। এই পূজার শ্রেষ্ঠ তিথি দীপান্বিতা তিথি। তবে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় দেখা গেছে ১লা বৈশাখেও পূর্বদিনে অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তিতে গো-সেবা ও গো-পূজা একটি বিশেষ উৎসব। ঐ দিন গোরু অথবা মহিষকে স্নান করিয়ে হলুদ ইত্যাদি মাখিয়ে ফুল নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করা হয়। গোরুর বাসস্থান গোয়াল ইত্যাদিও পরিষ্কার করা হয়। এ অঞ্চলের সমস্ত প্রান্তর জুড়ে অপদেবতা ও হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এই বাঁধনা পরব বা গো-ব্রতের অনুষ্ঠান। এই পরবকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন হবে নৃত্য-গীত :

গো-ব্রত

জাগ মা, ভগবতী, জাগ মা লক্ষ্মী
জগতে অমাবস্যা রাইত জাগে মা পতিপদ (প্রতিপদ)
দেবে গা মাইখান
পাঁচ ওঁতা দশ ধেনু গাই আজিকার দিয়ে বরদা,
জাগে সতী সেবে, জাগেতি অমাবস্যার রাইত
সিংহ হেলিবে, বরদা ফুল হরি তেল
মুখেতে লিঅ কাটা ঘাস।
আজি বরদা তোদেরই পরবরে, দেহ দেহ দেহ লক্ষ্মী,
লাখভরি শিশির বাড়ুক লাখে লাখে,
আর যে আসিবে বন্দনা পরব রে। [বাঁশপাহাড়ী]

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে ব্রতকথা: অনেকদিন আগেকার কথা। রাঢ় অঞ্চলের এই প্রকৃতি যখন ছিল আরও রুক্ষ কঠোর দুর্বিনীত উত্তপ্ত সূর্যের কিরণ ক্লান্ত তাপিত ধরণীবক্ষ। কোথাও ঘাস নেই, বৃক্ষ শুষ্কপ্রায়। আর এই অরণ্য প্রান্তর জুড়ে যখন খরাপীড়িত খরাক্লান্ত। ঠিক সেই সময় এ অঞ্চলের গো-মহিষাদি ঠিক করলো আর কাজ করবে না। কারণ খাটুনি অসম্ভব, অথচ খাদ্য নেই। তারা রুক্ষ কঠিন প্রান্তরকে বিদীর্ণ করে ফসল ফলায়, গাড়ী টানে, বোঝা বয়, দুধ দেয় অথচ সারাদিনের পরিশ্রমের পর একগাছি শুকনো খড়। ওদিকে কৈলাসাধিপতী দেবাদিদেব মহাদেব একথা জানতে পারলেন। মর্তের গোবৃন্দ অনুযোগ জানালো পশুদের বিরুদ্ধে মহাদেবের কাছে। মহাদেব তাদের আশ্বাস দিলো এ বিষয়ে তিনি বিচার করে দেখবেন। এদিকে মানুষেরা করলো কি অমাবস্যার অন্ধকারে গরুগুলোকে পরিষ্কার করলো, তেল সিঁদুর মাখালো, পেটভরে খাওয়ালো। মহাদেব এসে দেখলেন পৃথিবীর গোজাতির অবস্থা খুবই ভাল। মানুষ ওদের বেশ যত্নেই রাখে। ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন অকৃতজ্ঞ গো-জাতিকে যে তাদের চিরকাল খাটতে হবে। মানুষকে করে গেলেন আশীর্বাদ।

ব্রতকথার একটি বিষয় কিন্তু অপরিবর্তিত থেকে গেল সেটি হচ্ছে অমাবস্যার দিনে গো-জাতির সেবা ও পূজানুষ্ঠান।

পায়ে আলতা কুলিকাদা, তাই এসেছে লিতে গো,
টুসুমণি মাগো ;
আলতা পরা গো, সোনার খাটে হেলান দিয়ে
রূপার খাটে পা গো। [পুরুলিয়া]

এই আলতা পরা পায়ে সোনার খাটে হেলান দিয়ে রূপার খাটে পা দিয়ে যে টুসু শুয়ে থাকে সেই টুসুর ব্রত পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার একটি প্রধান উৎসব। পৌষের মাঠে যখন সোনার ধান কাটা হচ্ছে, গৃহস্থের প্রাঙ্গণ আর মরাই যখন সোনার বরণ ধানে ভরে উঠছে যখন ঘরে ঘরে পিঠা-পার্বণের আনন্দ কলরবে মুখরিত, তখন সীমান্তবঙ্গের এই অঞ্চলগুলি টুসু পরবে মেতে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে অন্যত্র যা তুষ-তোষলা ব্রত বলে তাকেই পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গে টুসু ব্রত বলা হয়।

টুসু ব্রত

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার প্রান্ত জুড়ে এরকম বহু লৌকিক পূজা-পার্বণ আর নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠান। এইসব পূজা ও পরব কেন্দ্র করে যেমন নানা ভঙ্গির নৃত্য আর বিবিধ ধরণের গীত, ঠিক তেমনি বিচিত্র ধরনের ব্রতকথা প্রচলিত। এই ব্রতকথাগুলির মধ্যে আছে একদিকে সীমান্ত বাংলার মানুষের নানা আচার-অনুষ্ঠানের কথা আর সংস্কার কুসংস্কারের রূপ, অন্যদিকে আছে পৃথিবীব্যাপী লোককথার নানা অভিপ্রায়ের প্রতিফলন। একান্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্রতকথা হলেও এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর লোককথার চিরন্তন অভিপ্রায়গুলি যা বিশ্লেষণ করলে এ অঞ্চলের দ্বৈত সংস্কৃতি অর্থাৎ একদিকে আদিম জনসমাজের ও অন্যদিকে হিন্দুর লৌকিক জীবনের একটি মিশ্রসংস্কৃতির রূপ পরিলক্ষিত হয়। তাই পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের কেবল ব্রতকথা কেন, অন্যান্য যে কোন লোককথা একদিকে যেমন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি পৃথিবীর লোককথার অভিপ্রায় বহন করে আন্তর্জাতিক বিশিষ্টতার গৌরবে মণ্ডিত।

*

পঞ্চম পর্ব

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের লোকগীতি

॥ সূচনা ॥

ভোরের আলো তখনো ভাল করে ফুটে ওঠেনি। শাল আর মহুয়ার বনে তখনও চাপ চাপ জমাট বাঁধা অন্ধকার। মানভূমের লাল কাঁকুরে মাটির রঙ তখনো ভালকরে দেখা যাচ্ছে না, আলো আর আঁধারের মিশ খাওয়া একটা মায়াময় আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে চতুর্দিকে, প্রভাতের ঠাণ্ডা বাতাসে ভেসে আসছে তাজা বনফুল আর মহুয়া ফুলের মাতাল-মদির গন্ধ। নিম-ডি ষ্টেশন। প্লাটফর্মে লোকজন নেই, আমরা ক'জন ছাড়া ষ্টেশনের পাশে বসে একটা কুকুর শালপাতা চাটছে, বাতিগুলো জ্বলছে বটে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ওদের আয়ু সমাপ্ত-প্রায়, লালকুর্তা গায়ে দু'একটা কুলি গুঁড়ি মেরে বেঞ্চির উপর শুয়ে আছে, একটা নিথর নিস্তব্ধ পরিবেশ। রেলের লাইন দুটো মৃত পাইথনের মত যেন যুগযুগান্তর ধরে শুয়ে আছে, অচল-অটল। কেবল গুটিকয়েক প্রাণীর চলার শব্দ কাঁকুরে মাটির উপর। হঠাৎ স্টেশনের নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে শালবনে শিহরণ তুলে, প্রাগূষার ওড়না খুলে দিয়ে, বাতাসের চাঞ্চল্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে লাল কাঁকুরে মাটিতে আছড়ে পড়ল গান :

এতো যদি ছিল মনে, আগে না বললে কেনে হে,
যা যথা যাবে কিন্তুক বঁধু পরে মজো না রে ;
যাতনা দিও না, জ্বালা সইতে পারি না ॥
দুখ দিলি সই হৃদয় মাঝে সইতে নারি এ জীবনে গো।
হেন রাজনের বাণী, পিরীত শিখালে ধনী গো।
যা যথা যাবে কিন্তুক পরে মজো না রে,
সইতে পারি না।

সমস্ত প্রান্তর আকাশ-বাতাস যেন আকুল বেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলো—কোন অনির্দেশ্য বেদনায় আমাদের মনও উদ্বেল হয়ে উঠলো, কে এই গান গায়? কোথায় পেল সে এই মাধুর্য, কথার এই সারল্য? কতক্ষণ গান হয়েছিল জানি না, যখন গান শেষ হলো, মনে হলো 'শেষ হয়ে না হইল শেষ।' রেশ লেগে রইল কাণে। খুঁজতে লাগলাম গায়ককে। লালমাটির প্রস্তরের এই গানের উৎসকে, কিছুক্ষণ পরে দেখলাম উঁচু ওভার ব্রীজের উপর বসে আছে একটি মানুষ। নিকষ কালো কষ্টি পাথরের মত চেহারা। শক্ত মজবুত লোহার মত। খালি গা, পরণে ছোট কাপড়। ঘাড়ে বাবরি চুল। হাতে বাঁশের বাঁশি। মনে হল এইত সেই মোহন মূরতি চিকণ কালাচাঁদ—যাকে বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস—গোবিন্দদাস—জ্ঞানদাসে পেয়েছি। আজ রুক্ষ রাঢ় মাটির প্রান্তরে চোখে দেখলাম। আর গান—এতো গান নয়, যেন শ্রীরাধিকার বেদনায় রক্তাক্ত হৃদয়। মনে হল সমস্ত রাঢ় মাটির অন্তর যেন গানের মধ্য দিয়ে কথা কয়ে উঠলো। সেই আদিবাসী যুবকের পাশে বসেছিল তার সঙ্গিনী আদিবাসী যুবতী। তারা দুজনে আরও অনেক গান শুনিয়েছিল। পরে গানগুলির পরিচয় জানতে পেরেছিলাম। সেগুলি ঝুমুর গান। পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের প্রেম-সঙ্গীত এই ঝুমুর। সেদিন ঝুমুর গানের মধ্য দিয়েই সমস্ত পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের লোকগীতির যে পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো, তা হচ্ছে একান্ত লৌকিক নরনারীর প্রেম। সেদিনের সেই আদিবাসী যুবক-যুবতীর আর একটি গানে তারই প্রতিধ্বনি:

প্রিয় আসিবে বলে চলে গেল, কেন নাগর গো
আমার না আইল,
ও যে মনের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ কার কাছে নিভাই॥
প্রেম শরে গো যেমন দহিছে হিয়া
ফুল শরে গো যেমন বিধিছে হিয়া।
ও ললিতা, ও বিশাখা
শুনগো তোরা কটি কথা,

আমার শ্যামকে আনিতে তোরা যা গো মথুর‍্যা।
যে কথাটি বলবি গোপনে মথুরাতে গো যেন কেউ না জানে;
আমার শ্যামকে লুকায়েছে কুটিল কুবুজা।
থাকি থাকি পড়ে মনে রইতে নারি গো যেমন বৃন্দাবনে।
যেমন বলরাম ভণে বৃন্দাবনে কাঁদায় না রাধা॥

তারপর যখন পুরুলিয়া থেকে কিছু দূরে একটি নির্জন বিচ্ছিন্ন টিলার উপর অযোধ্যা পাহাড়ে আদিবাসীর কুটিরে গিয়েছিলাম, সেখানকার এক বৃদ্ধা রমণী গান শুনিয়েছিল:

হাড়ি মোর ভাঙাইতে বিড়ি মোর সমুদে বহাইল,
কহে গো ধনি দুধারে বিকাই গেল
তাঁহারে হে তানা না…

অর্থাৎ রাধা বলছে দুধ বিক্রি করতে গিয়ে তার হাড়িটি ভেঙে গেল আর বিঁড়া সমুদ্রে ভেসে গেল। অযোধ্যা পাহাড়ের অনুর্বর রুক্ষ টিলার উপর বাস করে আদিম অধিবাসীর দল, রোগ-গ্রস্ত, দরিদ্র, কংকালপ্রায় জীর্ণ নরনারী, দারিদ্র্য তাদের চিরসঙ্গী। কিন্তু গান তাদের নিত্যবন্ধু। সেদিন সেই নির্জন বিচ্ছিন্ন টিলাটি গানে গানে ভরে উঠেছিলো। যুবতী, বিবাহিত নারী গান শুনিয়েছিলো 'যাওয়া পরবে'র:

বনে ফোটে কুরচি ফুল বন করে, আলা লো,
বিটি ছিলার মিছাই জনম, শ্বশুর ঘরে জ্বালা লো॥

তাই এই গানে সেদিন শুধু কথাই নয়, সেই আদিবাসী যুবতী-মনের মর্মান্তিক দুঃখ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিংবা সাহেব-ডিহির পুত্রহীনা বন্ধ্যা যুবতী গানের মধ্য দিয়ে তার আর্তনাদ প্রকাশ করেছিল:

আমার ভগবান কোলে লিবার সখ;
তুমি ভগবান উপরে, আমি ভগবান তলে,
কোলে লিবার সাধ (হে)
কোলে লিবার সাধ (হে)॥

সেদিন এই গানকে শুধু গান বলে মনে হয় নি। মনে হয়েছিল এ যেন রাঢ়ের নরনারীর চিরন্তন সুখদুঃখের হৃদয়োচ্ছ্বাস। তারপর বাঁশপাহাড়ী, কুইলাপাল্ল, নতুন-ডি, ডোমজুড়ি, দহমুণ্ডা—পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের যে গ্রামেই গেছি সেখানকার নরনারী তাদের প্রাণের বার্তা জানিয়েছে গানের মধ্য দিয়ে। সমাজ-জীবনের আশা আনন্দ, ব্যথা-বেদনা, আচার-রীতি-নীতির সুর-ভারতী রচনা করেছে সেই সব গ্রাম্য সরল মানুষের দল। তাই হারাধন, সুধীর নামাতা, ভোলানাথ কালিন্দী, রসরাজ সহিস, মহেশ্বর টুডু—সকলেই তাদের সরল প্রাণের মাধুর্য প্রকাশ করেছে গানে গানে। পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গে এইসব গ্রামগুলি পর্যবেক্ষণ করে এটা দেখা গেছে যে, এ অঞ্চলের লোক-গীতির প্রধান উৎস গ্রাম্য উৎসব, যেমন করম, ভাদু, টুসু, জাওয়া, পাতানাচ। এমনি বহু ঝুমুর গানের আসল উদ্দেশ্য শস্য দেবতার পূজা, শস্যের আগমন প্রার্থনা। তারপর যে শ্রেণীর গান শোনা গেছে তা হচ্ছে প্রেম-সঙ্গীত। ঝুমুরই তার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। এছাড়া আছে আচারমূলক সঙ্গীত, যেমন বিবাহের গান। একটা জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে লোক-সঙ্গীতের যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি রূপান্তর, পরিবর্তন, বিবর্তন ও স্থানান্তরীকরণ—এ সমস্তই এই সীমান্ত-বঙ্গের লোকগীতিতে বিদ্যমান। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে আদিবাসীর কুটিরে যে গান শোনা গেছে সেই গানই নতুন-ডি গ্রামের মহেশ্বর টুডু তার কেঁদরী বাজিয়ে শুনিয়েছে। মেদিনীপুরের বাঁশপাহাড়ীতে যে দেহতত্ত্ব, ঝুমুর, কাঠি নাচের গান বা বিয়ের গান শোনা গেছে তাই আবার কুইলাপালের কুটিরে কুটিরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাই বাংলার লোক-গীতিতে কোন অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা সমস্ত বাংলার—কোন বিশেষ গ্রাম বা জেলায় তা সীমাবদ্ধ নয়। পরবর্তী অংশে গ্রাম-ভিত্তিতে সংগৃহীত কিছু লোক-গীতির সংগ্রহ উপস্থিত করে তার পর্যালোচনা করা হবে।

*

॥ এক : কুইলাপালের লোকগীতি ॥

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার বঙ্গভাষী আদিবাসী যুবতীরা ঝুমরি নাচের সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়েছিল :

কুইলাপালের হাটে যাব, চুড়ি কিনিব, গো তোরই মতন।
ধসকিটে চলি গো দিদি তোরই মতন ॥

বাঁশপাহাড়ীর আকাশে বাতাসে, শালবনের প্রান্তরে সেদিন সাঁওতাল রমণীদের আনন্দবার্তা আমাদের মনেও পুলক সঞ্চার করেছিল। মহুয়ার গন্ধে, মাদলের দ্রিম্ দ্রিম্ শব্দে আমাদেরও মন যেন তাদের সঙ্গে গেয়ে উঠেছিল :

কুইলাপালের হাটে যাব,
চুড়ি কিনিব গো দিদি, তোরই মতন।
দিদি, হাত নাড়িব গো তোরই মতন ॥

এক অনির্দেশ্য বেদনার সঙ্গে এক অজানা পুলক সেদিন মনকে আকুল করেছিল। মন যেন বলেছিল, কুইলাপালের হাটে যাব, চুড়ি কিন্‌ব, হাঁড়ি কিন্‌ব, চুড়ি পরে হাত নাড়বো। সেদিন মনের পর্দায় কুইলাপালের হাটের যে চলচ্চিত্র ভেসে উঠেছিল তা হচ্ছে এই : একটি ধূলিধূসরিত গ্রাম্য পথ তার দুপাশে কয়েকটা ভগ্ন চালা, মাঠের দুধারে এলোমেলো কয়েকটা বট-অশ্বত্থের গাছ, তার নীচে কাত করা দু'একটা ছোট গরুর গাড়ী যার চাকায় লেগে রয়েছে গ্রামের এঁটেল মাটির কাদা, এপাশে ওপাশে কয়েকটা গোরু, অলস মধ্যাহ্নে দুগাছা খড়ের আঁটি সামনে রেখে জাবর কাটছে, ধুলো ওড়া রাস্তার ধারেই কয়েকটা স্থায়ী দোকানঘর, বাসী তেলেভাজা আর জিলিপীর পসরা সাজিয়ে বসেছে, সামনে বাঁশের মাচায় হাট ফেরতা দেহাতী মানুষ দিনান্তের জলযোগ সারছে, কানে তাদের গোঁজা আধপোড়া বিড়ি, রুক্ষ চুল, জলে ভেজা ও রোদে পোড়া লোহার মত শক্ত চেহারা। সোজা রাস্তা থেকে নেমে এলে হাটের মধ্যে দু-তিন সারি চালায় পসারীরা তার পসরা নিয়ে বসেছে, কোথাও মহুয়া ফুলের রাশ;

তার পাশেই হয়তো গ্রামের কামারশালায় তৈরী কাটারী, লাঙ্গলের ফলা এবং কাঁসার বাসন, একটু এগিয়ে গেলেই গ্রাম্য মেয়েদের মন ভোলাবার নানা সস্তা সামগ্রী নিয়ে বসা ফেরীওলার দল, কাঠের কাঁকই, পুঁতির মালা; কাঁচের রকমারি চুড়ি সেফ্‌টিপিন, গিল্টির গয়না আরও কত কি। মোড় ঘুরলেই দেখা যাবে একরাশি মাটির হাঁড়ি বাসন নিয়ে বসা গ্রাম্য কুমোর গোরুর গাড়ীটি পাশে রেখেছে, তার উপর বিছিয়েছে বিচালী, তার পরে সাজিয়েছে হাঁড়ি, কলসী, সরা আরও কত কি। গ্রাম্য মানুষ আর দেহাতী জনতার ভিড়ে ধুলিধূসরিত হাটের পরিবেশ—যেন গ্রাম্য জীবনের এক চলচ্চিত্র।

এবার গিয়েছিলাম কুইলাপালের হাটে। মনের পর্দায় আঁকা সেই হাটের চলচ্চিত্র আমার কাছে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেই ধূলিধূসর গ্রাম্য পথ, রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তর, শুকনো শালপাতায় ছাওয়া হাটের চালা, পথের ধারে গ্রামের তেলেভাজার দোকান, সবই দেখেছি। দেখছি শুক্রবার হাটের দিনে, অলস মধ্যাহ্নে কর্ম্মমুখর হাটে জনতার সজীবতা। গ্রাম্য ও দেহাতী মানুষের উন্মুখ অথচ সরলতায় ভরা মুখগুলি। আমি মিশে গেছি, এক হয়ে গেছি সেই মানুষগুলির সঙ্গে। আমার মনে হয়েছে কুইলাপালের হাট কেবল হাট নয়। এ যেন মানুষের আত্মার দেওয়া-নেওয়ার কেন্দ্রস্থল—মানুষের মনের আদান-প্রদানের কেন্দ্রভূমি। তাই গেছি শুধু হাটে নয় মানুষের প্রাণের দরজায়। নতুন-ডি গ্রামের মহেশ্বর টুডু চারপাই পেতে বসিয়েছে, কেঁদরি বাজিয়ে গান শুনিয়েছে, কুনারাম সারেন বাঁশীতে সুর দিয়েছে, গান শুরু হয়েছে:

বেলা গেল সন্ধ্যে হলো কই এল রে বনমালী,
গুনিতে ভাবিতে গেল দিন;
চিন্তা জোড়া মন তনু যে হলো খান খান।

জিজ্ঞেস করলে বলেছে এ গান হচ্ছে শাদীর গান। সঙ্গে সঙ্গে আবার গেয়ে উঠেছে :

এত বড় সাগর নদী কিসেতে পার হব,
বাঁশেতে আড়ব, পাথরে বাঁধব
কটকে পাইরব ও লঙ্কা দেশ।

কেবল নতুন-ডি গ্রামের মহেশ্বর টুডু কিংবা কুনারাম সারেনই নয় কুইলাপালের লক্ষ্মণচন্দ্র দাস, ভোলানাথ কালিন্দী, বঙ্কুচন্দ্র সহিস, তরণী সহিস, সুধীরচন্দ্র নামাতা, রামপদ দাস, ভূতনাথ কালিন্দী, রসরাজ সহিস, অন্য পাড়ার শশাঙ্কশেখর পাণ্ডা ভিড় করে এসেছে; শুনিয়েছে তাদের অজস্র গান, লোককথা আরও কত কি! অবশ্য কোন কোন জায়গায় অনেক অনুরোধ-উপরোধ করতে হয়েছে। মানিনীর মান ভাঙ্গাতে হয়েছে, গ্রাম্য বধূর লজ্জাকে স্নেহ ও মমতা দিয়ে দূরে সরাতে হয়েছে, তারপর তারা গেয়ে উঠেছে গান। কুইলাপালের শ্রীমতী কালিন্দী—তাদেরই মধ্যে একজন। লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গতেই সরল গ্রাম্য বধূ প্রাণ ঢেলে গেয়ে উঠেছে সদ্য বিবাহ-অনুষ্ঠানের গীত—বিভিন্ন আচারের গান। তাই কুইলাপালের হাটে কেবল পণ্যেরই আদান-প্রদান হয় তা নয়, কুইলাপালের হাঠে, মাঠে, ঘাটে, আকাশে, প্রান্তরে; গ্রাম্য মেঠো পথে শালবনের সবুজে ও রুক্ষতায় যে অজস্র গান ছড়ান কুইলাপালের হাটে তারও আদান-প্রদান। কুইলাপালের মানুষ তাই পণ্যের কারবারী শুধু নয়, রসেরও কারবারী। তাই ভোলানাথ কালিন্দী গানে গানে তার প্রাণের কথা ছড়িয়ে দিয়ে বলে :

দেখা হলে বলবে নাগরে,
ধরিতে সোনার চাঁদ, পাতিয়া পীরিতের ফাঁদ,
না দেখিলে না রইতে পারি।
বনের বাঘে পোষ মানে সই, মনের মানুষ পোষ মানে না রে
দেখা হলে বলবে নাগরে,
তুষের অনল জ্বালি দিয়া ঘরে রে
দেখা হলে বলবে নাগরে ॥ (২) ॥

কুইলাপাল পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের একটি গ্রাম। কুইলাপালের লোকগীতির আলোচনা প্রসঙ্গে কুইলাপালের অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন। লোকসংগীত প্রসঙ্গে একটি উক্তি এইসূত্রে প্রণিধানযোগ্য : 'Folk songs are best defined as songs which are current in the repertory of a Flok-group. * * * The repertory of the village or the country side and that of the city have exchanged some of their product time and again. Much influence has been at work in both directions'. [Standard Dictionary of Folk-Lore, pp. 1033.] যেহেতু লোক-সংগীতে সমাজ-জীবনের তথ্য পরিবেশিত হয় এবং তা সময়-বিশেষে সমাজের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, সেহেতু লোক-সংগীত আলোচনা প্রসঙ্গে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় আচার-নীতি বাদ দিলে চলে না।

কুইলাপাল গ্রামটি পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চল অর্থাৎ বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার সংযোগ স্থলে অবস্থিত। একদিকে বাঁকুড়ার খাতড়া, ঝিলিমিলি অন্যদিকে পুরুলিয়া সহর, টাটানগর—এ সমস্ত নিয়ে গ্রামটি একদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্যদিক দিয়ে বৃহত্তর অর্থনৈতিক জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে গতিশীল। এ অঞ্চলের একটি অতি-প্রচলিত টুসুগান :

ইপারেতে লণ্ঠন বাতি, উপারেতে বিজলী বাতি,
ছল করেছে টাটা নগরী।
টাটা যাবো আনবো আটা, বানাই দিব পরটা,
টুসু পরবে ॥

গ্রামটি মূলতঃ কৃষিনির্ভর। জমি খুব উর্বর নয়, বরং রুক্ষ, কঠোর। তাই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই এদের ফসল ফলাতে হয়—ধান, বজরা, দড়ি বুনবার একরকম ঘাস, সামান্য তরি-

তরকারী—এ অঞ্চলের অন্যতম উৎপন্নদ্রব্য। কাছাকাছি বন থেকে কাঠ সংগ্রহ, মহুয়া ফুল সংগ্রহ কিছু লোকের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। এছাড়া কয়েক ঘর কামার এবং কুমোরদের অবস্থানও লক্ষণীয়।

সুরম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ কুইলাপালের মানুষের মনে রসের খোরাক জুগিয়েছে। অনুর্বর রুক্ষ পরিবেশে শালবনের অজস্রতা তার পরিবেশকে করেছে সবুজ। এছাড়াও কয়েকটি দীঘি এবং বাঁধ থাকার জন্য কুইলাপাল খরার প্রকোপ থেকে কিছুটা মুক্ত। শালবনে সবুজ পাতার শনশনানি, দোয়েল আর শ্যামা পাখীর ডাক, মহুয়া ফুলের মাতাল-মদির গন্ধ কুইলাপালের মানুষের মনে রস-চেতনা সৃষ্টি করেছে। তাই গড়ে উঠেছে সান্ধ্য কীর্তনের আসর, যাত্রার দল, কথকতার পালা, ছো-নাচের আসর। মাদলের ধ্বনি আর ধামসার গুরু গুরু রব, মাতাল বাতাস শালবনের শব্দকেও ছাড়িয়ে গেছে। উওাল উদ্দাম হয়ে উঠেছে তাদের নৃত্যগীত। অন্ধকার রাত্রে সেই শব্দের মত্ত ধ্বনি শুনে মনে হয়েছে এ কোন আরণ্যক আদিম পরিবেশ গুহাযুগ থেকে উঠে এসেছে এই শালবনের প্রান্তরে।

কুইলাপালের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, অদ্ভুত এদের সামাজিক পরিবেশ। একদিক দিয়ে উচ্চবর্ণের কিছু হিন্দু, অন্যদিকে নিম্নবর্ণের অগণিত মানুষ, তারি মাঝখানে আদিম সমাজ থেকে বিছিন্ন কিছু দেহাতী মানুষ। পাশাপাশি এরা বাস করে, একই অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে গড়ে উঠেছে এক সুসংহত সাংস্কৃতিক ঐক্য। তাই গাঁয়ের পরব অনুষ্ঠানে যেমন একদিকে মুর্গীবলি হচ্ছে, অন্যদিকে দেহাতী গ্রামে রাধাকৃষ্ণ-সংগীতের আসর বসেছে। যেমন একটি পরবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবটির নাম চরকাসিনি। এটি হচ্ছে দেবী পূজা। ১লা মাঘ এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পাথরে গড়া সিঁদুর মাখানো একটি মূর্তি। খড়ের চালাঘরেই দেবতার মন্দির। এই পূজাতে মোষ ও মুর্গী

বলি হয়ে থাকে। জনশ্রুতি আছে যে এই দেবী আগে কুইলাপালে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে চিঁড়ে কোটার শব্দে বিরক্ত হয়ে দেবী বেকখুজা গ্রামে চলে যান। এবং সেখানে যেয়ে দেবী পূজারীকে স্বপ্ন দেন যে সে যেন প্রত্যহ ঐ গ্রামে গিয়ে দেবীকে পূজা করে আসে। এইভাবেই জনশ্রুতির মাঝখানে গড়ে উঠেছে এদের লৌকিক মনটি। তবে কুইলাপাল গ্রামে কালিন্দী, সহিস ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাই অধিক। প্রথমতঃ এরাই গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনটিকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত রেখেছে।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের লোক-সংস্কৃতি উপাদান সংগ্রহের শিবির স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে—কুইলাপালে। তার সামগ্রিক সংগ্রহ থেকে দেখা যায় কুইলাপাল অঞ্চলের লোকগীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বিষয়-বৈচিত্র্য। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকগীতি এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। একমাত্র কুইলাপাল গ্রামে যে সমস্ত লোকগীতি পাওয়া গেছে তার একটি বিশদ বিবরণ এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে।

কুইলাপালের লোকগীতিকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। যেমনঃ ১। ধর্মসংগীত; ২। কর্মসংগীত; ৩। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গীত; ৪। সামাজিক বা ব্যবহারিক সংগীত; ৫। প্রেম সংগীত; ৬। আনুষ্ঠানিক সংগীত; ৭। রসের গান। মোটামুটি এই শ্রেণীকরণ বাদ দিলে যে সব বিচিত্র ধরণের গান কুইলাপাল গ্রামেই পাওয়া গেছে সেই গানগুলির নাম যথাক্রমে ১। শাদীর গান; ২। ঝুমুর; ৩। খেমটি; ৪। ঢুয়া; ৫। ঢেঁকির গান; ৬। পাতানাচের গান; ৭। বিয়ের গান; ৮। দেহতত্ত্বের গান; ৯। কাঠিনাচের গান; ১০। বৈঠকী গান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লোক-সংগীতে সাধারণত ধর্মের প্রাধান্য থাকে না। কারণ লোক-সংগীত জীবনাশ্রয়ী, ধর্মসংগীত মূলতঃ তত্ত্বাশ্রয়ী। কিন্তু বাংলার জনজীবনের সঙ্গে ধর্ম এতই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে ধর্মকে বাদ দিয়ে তার কোন সংগীতই রচিত হয় না। কিন্তু বাংলার লৌকিক ধর্মের মূল কথাই হলো জীবনসম্বন্ধীয়। জীবনের নানা আচার-নীতির সঙ্গেই সে ধর্ম যুক্ত। সুতরাং ধর্মের অনুপ্রবেশ লোকসংগীতকে দুর্বল করেনি বরং অধিকভাবে জীবনাশ্রিত করেছে। তাই বাউল গানে, নাথ সাহিত্যে, দেহতত্ত্বের গানে, ঝুমুরে কিছু কিছু স্বর্গীয় অনুভূতি, ঐশ্বরিক চিন্তা থাকলেও পরোক্ষভাবে এসব গানে মনুষ্যত্বের মহিমাকে জয়যুক্ত করা হয়েছে। যেমন ঝুমুর গানে রাধাকৃষ্ণ থাকলেও সেখানে প্রেমেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। একটি ঝুমুর সংগীতে দেখতে পাওয়া যায়ঃ

বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায় গো, পরাণ রাখা দায়।
দেইখেছি তাঁরে পথে ঘাটে জল আনিতে পুকুর ঘাটে,
দেইখে আমার হিয়া মাঝে হল বরিযায়।
গো বঁধুর লাগি পরান রাখা দায়।
হেরিল মুখ চন্দ লোকে বলে ভালো মন্দ
আমি বলি বরাত মন্দ, নাহি যদি পাই।
গো বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়॥ [পুরুলিয়া]

এখানে রাধাকৃষ্ণ নিত্যবৃন্দাবনের নায়ক-নায়িকা নন, বাংলার সাধারণ লৌকিক জীবনের প্রেমিক-প্রেমিকারূপে এখানে বিধৃত। বৈষ্ণব ধর্মের যে বৈশিষ্ট্যটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে তা শাস্ত্রীয় নয়, লৌকিক। অপরদিকে দেহতত্ত্বের গানে মাঝে মাঝে যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার সুর লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যেও জীবনের মূল সত্যটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে। ধর্ম এখানে মানবিক রসে পরিপ্লুত হয়েছে। বাউল সাধকগণ যেমন সাঁই অর্থাৎ ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তারা যেমন বলে, 'সাঁই, তোমার পদ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে' অপরদিকে দেহতত্ত্ববাদীগণ ঈশ্বর অপেক্ষা

আত্মার অস্তিত্বে অধিক বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন দেহরূপ পুষ্পোদ্যানে আত্মারূপ ভ্রমর বিরাজ করে। এই আত্মার মূল্যেই দেহের পার্থিব এবং অপার্থিব মূল্য। দেহতত্ত্বের বা ঝুমুর গানের মধ্যে ধর্ম এবং অধ্যাত্মবাদের সংস্পর্শ থাকলেও যারা এই গান আপন মনে গেয়ে থাকে তারা আর পাঁচজনের মতই সাধারণ সংসারী মানুষ। কুইলাপালের হাটে মানুষের কুটিরে এই গানই শোনা গেছে :

মন তোমার মায়ার শিকল—মুখে হরি হরি,
ও তুই দিনের বেলা বেড়াস ঘুরে, নকল সোনার ব্যবসা করি।

কুইলাপালের মানুষের জীবনে ইহলোক এবং পরলোক, ঐহিক জীবন এবং পারত্রিক জীবন এভাবেই একসূত্রে বাঁধা পড়েছে। জীবনোচিত কর্মের সঙ্গে ধর্ম ও অধ্যাত্মতত্ত্বকে একত্রিত করে প্রমাণ করেছে তাদের কাছে ধর্মসংগীত জীবনসংগীত মাত্র।

ধর্মের সঙ্গেই কর্ম বাঙালী জীবনের স্তরে স্তরে এমন নিগূঢ়-ভাবে বাঁধা পড়েছে যার জন্যে ধর্মের পরেই আসে কর্মের কথা। কুইলাপালের মানুষ রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই জীবন নির্বাহ করে। অর্থনৈতিক জীবন তাদের ভয়ানক কঠোর, তাই কর্মকে সুরের বন্ধনে তারা বেঁধে ফেলেছে। কুইলাপালে তাই সংগৃহীত হয়েছে অজস্র ধানভানার গান, চাষের গান ইত্যাদি।

বাংলার লোক-সংগীতের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু গান লক্ষ্য করা যায়। লোক-সংগীতের দিক থেকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা দেশকে প্রধানত পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। যেমন, রাঢ় অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব বঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলা নিয়ে রাঢ় অঞ্চল। হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা নদীয়া, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের অন্তর্গত। মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, রংপুর নিয়ে উত্তরবঙ্গ অঞ্চল। পূর্ব মৈমনসিংহ, পশ্চিম শ্রীহট্ট, উত্তর ত্রিপুরা নিয়ে উত্তর-পূর্ব

অঞ্চল এবং নোয়াখালি, চট্টগ্রাম নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। এর মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের পটুয়ার গান, ভাদু, টুসু, জাওয়া ঝুমুর ও সাথী গান অন্যতম। পশ্চিম বাংলার আলকাপ, বোলান, পাঁচালী, তর্জা; উত্তর বাংলার গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, চট্কা, জাগ এবং পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালী, ঘাটু, জারী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কুইলাপাল যেহেতু পুরুলিয়া জেলায় সেহেতু রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসকল কুইলাপালে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাই সেখানেও বিভিন্ন আঞ্চলিক গান যেমন ভাদু, টুসু, জাওয়া, ঝুমুর সংগৃহীত হয়েছে।

ইংরাজীতে যাকে বলে Functional Song বাংলায় তাকেই বলে ব্যবহারিক সংগীত। একে আমরা সামাজিক আচারমূলক সংগীত হিসেবেও অভিহিত করতে পারি। কথায় আছে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। বিধাতার অবস্থান হয়ত এখানে আছে, কিন্তু জীবনের নানা পর্যায়ে বাঙালীর লোক-সাধারণের গান কিন্তু থেমে যায়নি। গর্ভাধান থেকে শুরু করে জন্ম, বিবাহ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এর নানা সংগীত। কুইলাপালের সমাজ-জীবনেও এরকম অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান। তাই সেখানেও গর্ভধান থেকে শুরু করে বিবাহের বিভিন্ন পর্যায়ে সুরের মেলা।

প্রেম মানবজীবনের সমস্ত কামনা বাসনার মানসলক্ষ্মী। বাংলার লৌকিক জন-জীবনেও এই প্রেমের ধারা অবিছিন্ন গতিতে প্রবহমান। তাই তা রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমেই হোক আর অন্য যে কোন ভাবেই হোক বাঙালী জীবনের স্তরে স্তরে তা সুগ্রথিত হয়ে আছে। প্রখ্যাত লোকশ্রুতিবিদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার প্রেমসংগীতগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন: ১। ভাবমূলক প্রেম-সংগীত; ২। বর্ণনামূলক প্রেম-সংগীত। এই ভাবমূলক প্রেম-সংগীতকেও আবার দু-ভাগে ভাগ করেছেন: ক। লৌকিক, খ। পৌরাণিক। পৌরাণিক প্রেমসংগীতে যে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় তা পুরাণ ভাগবতের রাধাকৃষ্ণ নয়, লৌকিক জন-জীবনের নায়ক-নায়িকা। যেমন একটি গানে:

বৃন্দে সই,
আসবে বলি প্রাণ কালিয়া নিশি জেগে রই।
আজ আসবে কাল আসবে বলে পথ পানে চেয়ে রই।
বুঝি আমার কপাল মন্দ, না আসিল প্রাণ-গোবিন্দ,
আমার মনের দুঃখ মনে রইল, তোমায় বিনা কারে কই।

এখানে বৃন্দে, কালিয়া ইত্যাদির যে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিত্য বৃন্দাবনের নিত্যকালের নায়ক-নায়িকা বা পুরুষ-প্রকৃতির লীলা নয়, এ হচ্ছে একটি নর, একটি নারীর কামনা-বাসনার কথা, হৃদয় বেদনার সুরভারতী। কিংবা পল্লী কবি যখন বলেন :

ওগো, কালার পিরীতে কুলমান হারাইলাম সই, আর যাব কই!
না জাইলে কঠিনের সনে কেন প্রাণ সঁপিলাম, আর যাব কই!
যার জন্য পাগলী হইলেম সে বা কই আর আমি কই
পান খাইয়া চূণে মইলেম, মনে ছিল কাঁচা দই!

এভাবেই পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণ বাঁধা পড়েছে জন-জীবনের স্তরে স্তরে। এদের মান-অভিমান, বিরহ-মিলন আবর্তিত হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে। কুইলাপালের যুবক-যুবতীরাও তাদের প্রেম জীবনের নানা গান গায়; কখনও তা রাধাকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে, কখনও তা অন্যভাবে। কুইলাপালের মানুষের কাছে পাওয়া গেছে এমনি কত ঝুমুর—যা লৌকিক প্রেমের রসে মহুয়া ফুলের মত মাতাল-মদির। কুইলাপালের যুবক শশাঙ্কশেখর পাণ্ডা তাই আপন মনে গেয়ে উঠেছিল সেদিন :

এ ভাদর রাতিয়া, তড়পে হো ছাতিয়া,
কাহার রহল প্রিয়া পর প্রেমে মাতিয়া
কুন্দ বরষে ঘন চমকে বিজলিয়া,
মনে পড়ে আধ হাসি বদনে মুরলিয়া।
শশাঙ্ক কহিত শ্যাম স্বপনেতে আসিয়া,
নিন্দয়ে যাওরে বন্ধু হানে রতি পাতিয়া।

ইংরাজীতে যাকে বলে Calendric Song বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে আনুষ্ঠানিক সংগীত বা পার্বণ সংগীত। বিবাহ

সংগীত যেমন একান্তভাবে পারিবারিক সংগীত, আনুষ্ঠানিক গীত ঠিক তেমনি বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অনুষ্ঠান সংগীত। বাংলার সমাজ-জীবনে বার মাসে তেরো পার্বণ। মনসা পূজা, কালী পূজা, ভাইফোঁটা, পৌষ-পার্বণ, শীতলা পূজা, পাতা পরব, কাঠিনাচ, গাঁজন, ঘেঁটুপূজা উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে কিছু কিছু গান কুইলাপালেও সংগৃহীত হয়েছে।

রসের গান বলতে বোঝায় দৈনন্দিন জীবনের রঙ্গ রসিকতার গান। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেও কুইলাপালের মানুষ যে তার গান আজও ভোলেনি, তার হাসি যে ফুরিয়ে ফেলেনি তার চিহ্ন পাওয়া যায় সংগৃহীত এ ধরণের কিছু গানের মধ্যে। প্রবন্ধের শেষাংশে এসে এবার কুইলাপালে সংগৃহীত কয়েকটি শ্রেণীর লোকগীতি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত বিস্তৃত আলোচনার ধারাটি সুপরিস্ফুট হবে।

কুইলাপাল থেকে কয়েক মাইল দূরে নতুন-ডি গ্রাম। এই গ্রামে কিসকু, হাঁসদা, ডিপুটি, টুডু, সারেণ প্রভৃতি পদবীধারী কিছু আদিবাসীর বাস। এই গ্রামেই বাস করে মহেশ্বর টুডু। সে গান শুনিয়েছিল অনেকগুলি। সঙ্গে বাজিয়েছিল কেঁদরি—একতারার মত একটি যন্ত্র—নারকেলের খোল, ছাতার বাঁট, চামড়া এবং তার সহযোগে তৈরী। সুন্দর নিকানো দাওয়াতে চারপাই পেতে

শাদির গান

বসিয়ে অনেকগুলি গান পর পর গাওয়ার পর জিজ্ঞাস করা হলে, গানের নাম বলেছিল শাদির গান। আদিবাসীর বিবাহে গীত এ গানগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পাহাড়-ঘেরা কাঁকুরে লাল মাটির দেশ এই পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল। চারিদিকে শাল, পিয়াল, মহুয়া, পলাশ, হরীতকী ও বয়ড়া গাছের ঘন বন। মাঝে মাঝে আম, জাম, কাঁঠালের ছোট ছোট বাগান। অত্যন্ত খরার জন্য এই অঞ্চলে সবুজ পাতার সমারোহ নাই বললেও চলে। কিন্তু তবু তাদের জীবনে সবুজের

আহ্বান কম নয়। মহুয়া ফুল সিদ্ধ খেয়ে জীবন তাদের রসহীন নয়। এই শাদির গানগুলির মধ্য দিয়ে সেই রসময় জীবনীশক্তির পরিচয় মেলে। আদিবাসী হয়েও তাদের জীবনে বনমালী, রামচন্দ্র, লঙ্কার দেশের প্রভাব যে কতদূর নীচের গানগুলি লক্ষ্য করলে তা বোঝা যাবে:

১। বেলা গেল সন্ধ্যে হল কই এল রে বনমালী
গুনিতে ভাবিতে গেল দিন চিন্তা জোড়া মন তনু যে খানখান।
[নতুন-ডি, পুরুলিয়া]

২। এত বড় সাগর নদী কিসে তে পার হব
বাঁশেতে আড়ব পাথর বাধব,
কটকে পাইরব ও লঙ্কা দেশ। [ঐ]

৩। ওরে রাম রে কেন গিয়েছিলেন বনবাসে
পিতার প্রতিজ্ঞা করি নাই তার জন্য বনবাস। [ঐ]

৪। শ্বশুর কো মানি নাই,
ভাসুর কো মানি নাই,
চুল ছাড়ি মাথা নাড়ি নাচি ধরিব। [ঐ]

বাংলা কিন্তু এদের মাতৃভাষা নয়। কারণ কুর্মী, মাহাতো, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা এরা যে ভাষায় কথা বলে তা মূলতঃ কুর্মী উপভাষা। কিন্তু মাঝে মাঝে এরা বাংলায় গান গায়। 'বুঢ়ি দং' নামক একটি গানে বিবাহ পরবর্তী একটি বালিকার বেদনার কথা এদের নিজস্ব ভাষায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

হপন হপন রেম্ ইদি লিদি এঞ,
হারা তরারেম্ বপি কিদি এঞ।
বাহালেকা হড়ম সাগে মাদি এঞ,
নং কান উমের রেম্ বাগি কিদিএঞ॥

এর বাংলা অর্থ হচ্ছে, ছোট বেলায় বিয়ে করে নিয়ে গেছে। বড় হতে ত্যাগ করেছে। ফুলের মতন আমি যখন ফুটে উঠলাম তখনি সে আমাকে ত্যাগ করে গেল।

এরই সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী এবং এদেরই প্রতিবেশীর বিবাহের গানের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

ব্যবহারিক সংগীতের মধ্যে অন্যতম বিবাহ সংগীত। বাংলার জনজীবনে এককালে এর অপরিসীম প্রভাব ছিল। গান ছাড়া বাংলার লোক-জীবনের কোনো অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ হতে পারত না। কিন্তু আজ বাংলার সীমান্ত অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র এই সংগীত প্রায় লুপ্ত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আজও কিন্তু এই সংগীত চিরপ্রবাহিত: এর মধ্যে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের সীমান্ত অঞ্চল অন্যতম। মাহাতো, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, হাঁড়ি, বাউড়ি, বাগ্‌দী প্রভৃতি জাতির বাস। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ রুক্ষ, অনুর্বর। নীরস এ অঞ্চলের ভূমি। দূরে দূরে অনুচ্চ রুক্ষ পাহাড়, পঞ্চকোট, বাগমুণ্ডি, শুশুনিয়া। চারিদিকে ঘন বন। শাল আর শাল। ছোট, বড় মাঝারী অগণিত শালের সারি। মাঝে মাঝে মহুয়া, পিয়াল, পলাশ, হরীতকীর ঘন জঙ্গল। লতানে অজস্র বনফুলের গাছ। কোথাও বা তীব্র গন্ধ, কোথাও বা মনোমুগ্ধকর বর্ণে প্রস্ফুটিত। এই জঙ্গলের ছোট ছোট গর্তে, ঝোপে ঝাড়ে বাস করে বন চিতা, ছোট হরিণ, খরগোস। মাঝে মাঝে দু' একটা ভল্লুক। গাছের সবুজ ডালে ডালে অসংখ্য পাখীর বাস তিতির, শ্যামা, দোয়েল, চন্দনা, বুলবুলি, বিচিত্র এদের রং, ঝুঁটিতে হয়তো লাল, গলা হলদে, লেজটা ঘন নীল। জ্যোৎস্না রাত্রে কিংবা মেঘগর্জিত দ্বিপ্রহরে কখনও কখনও নাচে বিচিত্র বর্ণবিহারী নৃত্যরতা ময়ূরীর দল। গাছে গাছে পেকে ওঠে মহুয়ার ফুল, বাতাস গন্ধে হয় মাতাল। মাদলের উপরে পড়ে তান। এরি মাঝে ছোট ছোট কয়েকটি গ্রাম। বিরাট বনজ সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। এখানে বাস করে পাশাপাশি সাধারণ গ্রাম্য মানুষ আর—দল বিচ্ছিন্ন কিছু দেহাতী নরনারী। রুক্ষ পরিবেশ কিন্তু এদের জীবনকে অনুর্বর করতে পারেনি।

বিবাহের গান

কৈশোরে উত্তীর্ণ নরনারী কখনও ছয় সাত বৎসরের বালক-বালিকার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের দিন পনেরো পূর্ব থেকে পল্লীর কুটীর প্রাঙ্গণটি গৃহকর্ত্রী গোবর মাটি দিয়ে নিকিয়ে তকতকে করে। গৃহদ্বারে, তুলসীমঞ্চে বর্হিবাটিতে আলোচাল আর খড়িমাটির সঙ্গে বিচিত্র রং দিয়ে এঁকে দেয় আলপনা। ঘরের কাঁসার বাসনগুলিকে বালিমাটি দিয়ে মেজে করে রাখে চকচকে, আর পরণের অল্পদামী কাপড়গুলি সাজিমাটি দিয়ে করে তোলে শ্বেতশুভ্র। তারপর বিয়ের আগে থেকেই শুরু হয় প্রতিবেশীর আনাগোনা। প্রতিবেশীরা গেয়ে ওঠে :

মিনিকে যে বিহা দিইভ রাজার বেটার সঙ্গে গো।
রূপার বাঁধা পাল্কী দিইভ রাস্তায় চ্যইলে যাতে গো॥ [পুরুলিয়া]

কুইলাপালের আকাশে বাতাসে তখন আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়। তারপর বিয়ের আগে থেকে কুইলাপালের মেয়েরা শশীসেনা বাঁধে যায় জল সইতে। লোকশ্রুতি যে রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন দিগ্বিজয়ে যাবার পথে পায়ের গোড়ালী দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়াতে এই বাঁধ গড়ে ওঠে। বটগাছের নীচে আছে বিক্রমাদিত্যের একটি পাথরের মূর্তি। ১লা মাঘ এখানে পূজা হয় আর হয় বড় মেলা। কুইলাপালের মানুষের কাছে এই বাঁধ আর বাঁধের জল অতি পবিত্র। কন্যাকে লাল পাড় সাদা কাপড় পরিয়ে হলুদ মাখিয়ে, গলায় বনফুলের মালা দুলিয়ে জল সইতে নিয়ে আসে শশীসেনা বাঁধে। রাস্তায় আসতে আসতেই গান চলে :

১। চলরে মা বুনিরা জল সইতে যাব
পথে আছে কামরাঙা সব জনে খাব। [কুইলাপাল]

২। জড় গাছের আগে শাঁক চিলের বাসা
সাও মেরে নিয়ে গেল গায়ের গামছা। [ঐ]

মেয়েরা জল সওয়ার সময়ে শুধু গানই গায় না তারা নাচেও। এ নাচের উৎস অনাবিল আনন্দ। তাই সেদিন শ্রীমতী কালিন্দী শুনিয়েছিল জলসওয়ার নৃত্য সমন্বিত গান :

৩। পস্ত গাছে চটি বসেছে এ চটিকে মেরো না,
মধু খেতে বসেছে, পস্ত গাছে চটি বসেছে।
[কুইলাপাল, পুরুলিয়া]

৪। বিলাতি বাজারে শ্বশুর বাড়ী বিলাতি খাবি যদি,
পলাশ পাতে খেলাঘর, বিলাতি বাজারে শ্বশুর বাড়ী। [ঐ]

কন্যার বিবাহের অর্থ কন্যা বিদায়। তাই কুইলাপালের মায়ের মন কেঁদে ওঠে। সে কান্নার সুর যেন শোনা যায় দূরে শশীসেনা বাঁধের ওপারে যে শালবন তার শন্ শন্ শব্দে। হৃদয়টা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে কেবল মায়ের নয় মেয়েরও! মা বলে বেদনায় আপ্লুত হয়ে:

৫। বালাকে যে মানুষ করলাম কাঁচা দুধের সরে গো
এবার বালা চলে যাবে যাবে পরদেশে গো। [কুইলাপাল]

এখানেও তাই শেষ নয়। মা শুধু কাঁদেই না। মনে মনে ক্রুদ্ধও হয়। ভাবে এতদিন বুকের দুধ দিয়ে যাকে মানুষ করেছি সে আজ পর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? তাই মা বলে:

৬। তুমি যে যাচ্ছ বালা দেশে বিদেশে গো
দিয়ে রাখ বালা, দুধেরই ধার গো। [ঐ]

মেয়ে জানে এ ধার তো শোধবার নয় তাই সে বলে:

৭। নাই যে শুধিব মা তোমারই ধার গো,
গয়ায় গঙ্গার জলে করিব উদ্ধার গো। [ঐ]

তারপর নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত হয় বিয়ের দিন। সকালেই হয় গায়ে হলুদ। মেয়েকে দাওয়ায় বসিয়ে এয়োস্ত্রীরা ঘিরে বসে পরস্পরের মধ্যে হলুদ মাখামাখি করে আর গান গায়:

৮। ফুল বাড়ীর ভিতরে কে ঘোড়া ছাড়িল রে,
এক কলি ভেঙে গেলে
তোমার বাপা যাবেন বাঁধা গো।
সাতদিন পরে গো তোমার বাপা ছাড়ায় আনবে। [ঐ]

৯। হাত মেল ধনি পায় মেল
মেলিতে ধনি মগন পাত [ঐ]

তারপর বেলা যায়। শুরু হয় বিয়ের নানা আয়োজন, অনুষ্ঠান। ক্রমশঃ সন্ধ্যে হয়। দূর থেকে দেখা যায় বরযাত্রীর শোভাযাত্রা গান হয়:

১০। ডালে বসিলে সুগা ডাল ঝাঁঝরা,
পাতে বসিলে সুগা পাত ঝাঁঝরা।
এসা কাড় বিঁধিব সুগারে,
ডাল ভেঙ্গে যায় পড়ে। (ঐ)

বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হয়। নানা মেয়েলী আচারের মধ্যে দিয়ে। সেখানেও নানা আচার-আচরণ, রীতি-নীতি গান কিন্তু সেখানে স্তব্ধ নয়। সেখানেও শ্রীমতী কালিন্দী গায়:

১১। খেল ভাঙ সঙ্গতীরা
মায়ে আমার গাল দিছে
হাতের কড়ি ফিরিয়ে দাও
মা আমার কান্দিছে। [ঐ]

সুখের পর দুঃখ, মিলনের পর বিরহ, পালনের পর বিদায়। কারণ তিনদিন খেলা তারপরে হয় প্রতিমা বিসর্জন। যে মেয়েকে মানুষ করেছি দিনের পর দিন, রোগে শোকে, তাপে আনন্দে বুকের পাঁজর করে রেখেছিলেম, যে ছিল নয়নের মণি, হৃদয়ের রত্নস্বরূপা সেই কন্যার বিদায়ের দিনে মায়ের মন অশ্রুসজল, বেদনায় আকুল। তার চোখের জলে শশীসেনা বাঁধের জলে বুঝি দেখা দেয় প্লাবন। শালের বনে নীরব স্তব্ধতা। যেন এক চরম দুঃখের মুহূর্ত উপস্থিত। সমস্ত গ্রাম আজ ভেঙ্গে পড়েছে, মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কন্যা বিদায়ের মুহূর্তে। কারণ এ মেয়ে নয়, এ কুইলাপালের নাড়ীকাটা ধন। তাই আজ সেই নাড়ী ছেড়ার দিনে সকলের হৃদয় করে উঠেছে টন টন, কন্যা আজ যাবে কোন পরদেশে চলে, দূরদেশী কোন রাখাল ছেলে হবে তার সাথী। তাই গান ওঠে কুইলাপালের আকাশে-বাতাসে। প্রতিবেশীরা গেয়ে ওঠে:

১২। গৌরী বিদায় কর মা, কেঁদো না,
কেঁদো না জননী, ভেবো না জননী
গৌরী বিদায় কর মা কেঁদোনা। [ঐ]

কন্যার আর্তস্বর খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে :

১৩। আমাকে মা বিয়ে দিলে কাঁসাই নদীর পারে
এতগুলো পরব ছেড়ে রাখলে পরের ঘরে। [ঐ]

মায়ের মন বেদনায় পড়ে ভেঙ্গে। বিদায় যদিও দিতে হচ্ছে তবু তো সে তার প্রাণের পুতলি! এই দূর অজানা পথে যেতে তার হয়তো হবে কত কষ্ট। তাই মমতাময়ী মা বেদনায় আপ্লুত হয়ে বলে :

১৪। উড়কি ধানের মুড়কি দিব পথে ছড়িয়ে খেতে,
আম কাঁঠালের বাগান দিব ছায়ায় তুমি যাবে। [ঐ]

ঝুমুর পশ্চিম বাংলার তথা রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তবর্তী সুবিস্তীর্ণ এলাকার সর্বাধিক জনপ্রিয় লোক-সংগীত। ছোটনাগপুর মালভূমির যে পূর্বাংশ নীচু হয়ে ক্রমশঃ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে মিশেছে সেই অঞ্চলের আদিবাসী সমাজের লৌকিক প্রেমসংগীতের নামই ঝুমুর। পরবর্তী যুগে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ এবং প্রচারের ফলে ঝুমুরের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম ক্রমশঃ অনুপ্রবিষ্ট হতে শুরু হয়।

ঝুমুর গান

এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিভাসম্পন্ন কিছু গ্রাম্য কবি মহাজন পদাবলী রচনা করতে আরম্ভ করে। এই উভয় শ্রেণীর পদই পরে ঝুমুর নামে পরিচিতি লাভ করে।

কুইলাপাল মূলতঃ বৈষ্ণব প্রধান অঞ্চল। পূর্বেই বলা হয়েছে আদিবাসী এবং গ্রাম্য মানুষের বৈষ্ণবীয়তা এদের জীবনকেও বৈষ্ণবমুখী করে তুলেছিল। উভয় শ্রেণীর মানুষই বৈষ্ণব কিন্তু গলায় কণ্ঠি ধারণ করলেও এরা উভয়তই মাংসাহারী। ঘরের প্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চের পাশে কুক্কুটশাবকের স্বচ্ছন্দবিহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বৈষ্ণবধর্ম এদের প্রাত্যহিক জীবনধারার ওপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও এদের সাংস্কৃতিক জীবনকে

রসসমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। কুইলাপালে লোকসংগীত সংগ্রহের মধ্যে ঝুমুরের সংখ্যাধিক্য একথা সপ্রমাণ করে। কুইলা-পালের বহু গৃহেই আছে শ্রীখোল, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি কীর্তনের সরঞ্জাম। সন্ধ্যাবেলায় কুইলাপালের মানুষ গৃহকর্ম সমাধা করে কোন একটি জায়গায় সকলে সমবেত হয়। শুরু হয় গান :

১। দেখা হলে বলবে নাগরে

ধরিতে সোনার চাঁদ, পারিয়া পীরিতির ফাঁদ
না দেখিলে না রইতে পারি।
বনের বাঘে পোষ মানে সই
মনের মানুষ পোষ মানে না রে,
দেখা হলে বলবে নাগরে।
তুষের অনল জ্বালি দিয়া ঘরে রে
দেখা হলে বলবে নাগরে। [কুইলাপাল, পুরুলিয়া]

২। প্রথম পীরিতি কালে হাতের উপর চাঁদ দিলে,
ঘর থেকে বাহির করলে কত না দিয়ে ভুল (মিথ্যা),
পীরিতি হল শূল।
বর্ণ ছিল চাঁপার কলি আমি ভেবে ভেবে হলাম কালি
বসলে উঠিতে নারি হাতে ধরি তুল গো।
এই ত আমার জীর্ণ তরী তায় চাপিছে বংশীধারী
মাঝেতে দাঁড়ায়ে তরি একূল ওকূল গো। [ঐ]

কুইলাপালের ভোলানাথ কালিন্দী একসঙ্গেই এই দুটি গান শুনিয়েছিল। গান দুটির কোন জায়গাতেই রাধাকৃষ্ণের নাম ধরে উল্লেখ নেই। প্রথম ঝুমুরটি একটি পরিপূর্ণ বিরহ-মূলক লৌকিক প্রেমসংগীত। দ্বিতীয় গানটিতে বংশীধারীর উল্লেখ আছে বটে কিন্তু গানের মধ্যে বৈষ্ণব-বিরহ অপেক্ষা লৌকিক বিরহ-বেদনার ভাবটি অধিকতর স্পষ্ট। পীরিতি নায়িকার কাছে শূল হয়ে উঠেছে। চাঁপার কলির বর্ণ কালি হয়েছে। নায়িকার বেদনা-বিধুরতায় গানটি বিরহ করুণ। রসরাজ সহিসও সেদিন কয়েকটি

ঝুমুর গান শুনিয়েছিল। তার মধ্যেও ছিল না রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ। একান্ত লৌকিক নায়ক-নায়িকা এবং তাদের ব্যথা বেদনা, আনন্দ মিলনের কথায় তা উজ্জ্বল।

৩। লাল শালুকের ফুল, ফুটে আধা রাতে,
যার সঙ্গে যার ভাব থাকে মরিলে না টুটে!
মেঘ আঁধারি রাতি মেঘেতে বিজলী দেখি,
এমন সঙ্কট কালে এলে কার সাথে।
আসিলে ওহে বন্ধু বসিলে পালঙ্কে।
পা ধুয়াব নয়ন জলে মুছাইব কেশে।
হেন উদয় বলে, তোমারে না দেখিলে,
সব জ্বালা যায় দূরে তোমার দেখা পাইলে। [ঐ]

৪। পাখী যাও রে যাও রে যাও বন্ধুর দেশে
পাখী কইও তারে আমার মাথা খাও।
চন্দন দুঃখের ডালি,
কইও দুঃখের কথা আমি কেঁদে মরি। [ঐ]

অন্ধনারী মঙ্গলাও একটি ঝুমুর গান গেয়ে শুনিয়েছিল। অবশ্য সে বলেছিল সে বিধবা। ঝুমুর আনন্দের গান। ঝুমুর গাওয়া তার চলে না। অনেক অনুরোধ উপরোধে সে একটি গান শুনিয়েছিল:

৫। ওগো রাধা বিনোদিনী, আমরা হলাম রাজ নন্দিনী,
বিনয়, শুন গো বারণ জীবন মরণ
চাস না কালার নয়নেতে;
পারবি না রাই সামালিতে।
করবি না ভাব গোপনেতে প্রেম করবি না গোপনেতে
নরোত্তম কয় জোড় হাতে,
ধৈরয কয় সামালিতে।
গুরুজনের সেবা কর ঠিক মতে॥ [ঐ]

একদিকে সুরের মায়াজালে, অন্যদিকে ভাষার গভীরতায় সেদিনের এই ঝুমুরটি অপূর্ব উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল।

ঝুমুর গানে সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণ অথবা রামচন্দ্র ইত্যাদির উল্লেখ

থাকে। কুইলাপালে ছুটি ঝুমুর পাওয়া গেছে সেখানে উল্লেখ করা করা হয়েছে মহাদেবের ও পার্বতীর রূপ ও মহিমার :

৬। জিনি কটি শশধর কটি তটে বাঘাম্বর
কে যোগী বৃষবাহন।
বরং বরবদনে গো,
কে যোগী বৃষবাহন ॥ [ঐ]

৭। হেম হেমাঙ্গিনী জগতের জননী,
মাগো মহিমা কে জানে তার ;
ও মায়ের স্বামী ভোলা মহেশ্বর গো।
ওগো মা ছলনা কে জানে তোর,
মহিমা না জানি তোর, তুমি মা ত্রিনয়নী।
কার্তিক গণেশের জননী মাগো
মায়ের বাহন ব্যাঘ্র ফণীবর গো।
তুমি মা দশভুজা, ত্রিজগতে করেন পূজা,
অকালে পূজেন রঘুবর গো ॥
তুমি মা পার্বতী কন্যা লক্ষ্মী-সরস্বতী মাগো
মায়ের পদতলে মহিষাসুর গো ॥
মুর্খ শ্যামা ভনে রেখো মাগো শ্রীচরণে
অস্তিমে দিও ঠহর গো। [ঐ]

কুইলাপালের শশাঙ্ক পাণ্ডাও আমাদের একটি ঝুমুর গান শুনিয়েছিল। গানটি এই :

৮। যেমত বরিষা কালে নির্মল জোছনা মিলে,
গোপীপদ্ম আনন্দের বিভূতি
শ্যাম ভ্রমরারে দিয়ে কুল
ষোলশত পাতা কেয়াফুল
রও শ্যাম ভ্রমরারে দিয়ে কুল ॥
আট সখি সে মিলালে চৌষট্টী কলি কমলে,
গোপীপদ্মে আনন্দে বিভুল।
শ্যাম ভ্রমরারে দিয়ে কুল ॥

শশাঙ্ক শেখর বলে, কেশরী কৃপা হইলে,
হেরি শুভ সে রূপ অতুল।
শ্যাম ভ্রমরারে দিয়ে কুল ॥ [ঐ]

খেমটি নৃত্য সমন্বিত লোকগীতি। পশ্চিম সীমান্তবর্তী পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত অংশে খেমটি নামক একপ্রকার নৃত্য-ব্যবসায়িনী নাচের সঙ্গে এই গান গেয়ে থাকে। প্রেম এই গানের প্রধান বিষয়বস্তু। তবে কখনও তা লৌকিক, কখনও বা তা রাধাকৃষ্ণের নিত্যপ্রেম। কুইলাপালে এই খেমটি গানের প্রচলন বহুল না হলেও বিভিন্ন মেলা ইত্যাদিতে নৃত্যসমন্বিত এই গান প্রায়শই অনুষ্ঠিত হয়। এবং সেই অনুষ্ঠান থেকেই গান শ্রবণ করে কুইলাপালের যুবক-যুবতীরা বিশেষ করে যুবকেরা আনন্দের সময়ে এই গান নিজেদের মধ্যে গেয়ে থাকে।

খেমটি নাচের গান

তবে কুইলাপালে এটা দেখা গেছে যে কোনো গৃহস্থ নারী এই গান সহজে সকলের সামনে গায় না। খেমটি গান সেইজন্য সাধারণতঃ এই অঞ্চলের নিষিদ্ধ গান বললেও চলে। যদিও কুইলাপালে উমেশ সিংহ বাবু যে গানটি গেয়ে শুনিয়েছিল তার মধ্যে অশ্লীলতার চিহ্ন তো নেই-ই বরং রাধাকৃষ্ণ প্রেমের সরল প্রকাশ সেখানে লক্ষ্য করা যায়। বিরহ-বিধুর শ্রীরাধিকার অন্তর্দাহের একটি চিত্র এখানে উদঘাটিত :

১। শুন গো বৃন্দে,
দিবানিশি রাধার প্রাণ কান্দে গো,
আমি কেন রহিব ধৈরয ধরি,
এখনো না এলো কালিয়া।
ভাবি ভাবি তনু হলো ক্ষীণ
সোনার অঙ্গ হল মলিন গো।
বেঁচে বল আর কতদিন এমন মতেতে
প্রাণে দারুণ জ্বালা সইব ললিতে।
যখন যাই যমুনার জলে ক্ষণেক বিলম্ব হইলে
ঘরে পরে মন্দ বলে, বলে ও কালাটে। [কুইলাপাল]

দ্বিতীয় গানটিতে লৌকিক প্রেমের বিরহ-বেদনার কথাই অধিক প্রস্ফুটিত। যেমন :

২। কোকিলের ডাক শুনি নিজমনে ভাবি গণি
আমার কলপে কলেপ ওঠে ছাতিরে।
ওরে কেন ডাক নিশি ভোরে রাতি রে ॥
নিশি অবসান হইলে,
নাগর কালা না এল গো,
যে আমারে দিয়া গেল ফাঁকিরে।
ওরে পাখী কেন ডাক নিশি ভোর রাতি রে ॥ [ঐ]

রাজশাহী, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে যাকে ধূয়া গান বলে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈরাগ্যমূলক সেই গানকে ঢুয়া গান বলে। বাউলের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে বাউল গানে ঈশ্বর আর সাধক একাত্ম। ঢুয়া গানে বৈরাগ্য ও ইহজগতের অসারতাই বিধৃত। প্রখ্যাত লোক-শ্রুতিবিদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পশ্চিম বাংলার ঢুয়া গানকে প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করেছেন। যেমন বৈরাগ্য-মূলক, দেহতত্ত্বমূলক, কৃষ্ণপ্রসঙ্গমূলক এবং লৌকিক। কুইলাপালের মানুষের জীবনে আসক্তি ও বৈরাগ্য পাশাপাশি অবস্থান করে। তারা জানে শালবনের নূতন পাতা যেমন সবুজবর্ণ ধারণ করে পৃথিবীতে আসে আবার বসন্তের শেষে বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে ঠিক তেমনি মানুষেরও জীবন, যৌবন সবই ক্ষণস্থায়ী। তাই তারা ভাবে :

ঢুয়া গান

১। বল বল বল মন ভাবিলে কি হবে
ওরে যা আছে কপালে ফলবে কালে কালে।
কর্ম্মসূত্রের ফল আপনি পাবি ॥
বল বল বল মন ভাবিলে কি হবে
বিধি যা লিখেছেন কপাল উপরে
কার সাধ্য তা খণ্ডাইতে পারে ॥ [ঐ]

দেহতত্ত্বমূলক ঢুয়াও কুইলাপালে সংগৃহীত হয়েছে। কুইলাপালের উমেশ সিংহ বাবু এই গান শুনিয়েছিলেন :

২। জান না ভাই সেদিন কবে সেদিন কবে হবে রে,
সময় খুঁজে শমন রাজা নিদান শমন দিবে রে,
সে হাকিমের হুকুম কড়া,
যেতে হবে খাড়া খাড়া ভাই রে ;
হাতি ঘোড়া টাকার তোড়া সকল পড়ে রবে ॥
বিষয় আশয় ছুটাছুটি মিছে কর চটাচটি
বেশভূষা পরিপাটি মাটিতে মিলাবে রে।
ছেঁড়া চাটাই ভাঙ্গা খাটে বিচালীতে বাঁধবে এঁটে
লয়ে গিয়ে শ্মশান ঘাটে আগুনে পোড়াবে রে।
ভাই বন্ধু দারা পুত্র কাঁদে তারা দুদিন মাত্র,
তোমার ধনে হয়ে মত্ত তোমায় ভুলে যাব রে।
আসছ একা যাবে একা কেবলমাত্র পথের দেখা।
অন্তিমকালে হরি সখা দাস পীতাম্বর ভাবে রে।

[কুইলাপাল, পুরুলিয়া]

লক্ষ্মণচন্দ্র দাস ও তার সম্প্রদায় সেদিন কয়েকটি রাধাকৃষ্ণমূলক ঢুয়া শুনিয়েছিল। একটা জিনিষ কুইলাপালে লক্ষ্য করা গেছে; তা হচ্ছে এই যে, এরা মনের আনন্দের জন্য গান গায়। তাই বিষয়গত সূক্ষ্ম পার্থক্যের ধার ধারে না। তাই অনেক জায়গায় গানের বক্তব্যে ও বিষয়বস্তুতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ঢুয়া এবং ঝুমুর একই বলে মনে হয়েছে। যেমন :

৩। পোড়ামুখী কলঙ্কিনী, কলঙ্কিনী রাই,
তোর মত কুলমজানী গোকুলেতে নাই,
যমুনাতে জল আনতে গেলে রসের খেলা কদমতলে
ওই দেখে এসে লোকে বলে সকল শুনতে পাই গো
খাওয়ায়ে পাগলা গুঁড়া পতিকে করেছিস ভেড়া
ও যে দাদার মুখে নাই কো সাড়া,
খুব বেড়েছে তাই গো।
আ মরি কি রূপের ছটা কয়লা হতে ময়লা সেটা,

ওরে তার সনে তোর প্রেমের ঘটা লাজে মরে যাই গো।
ও রাধে রাজার মেয়ে ভুলে গেলি রাখাল পেয়ে তুই গো।
ওরে খাসা দইকে ফেলে দিয়ে কপাস খালি তুই লো।
আঁকা বাঁকা ভঙ্গি খানা ভঙ্গি দেখে যম ছুঁয়ে না তাই লো।
দাস পীতাম্বর সেই সাধনা করেছে সদাই গো। [ঐ]

আরেকটি ঢুয়া গান সংগৃহীত হয়েছে যেখানে 'শ্যামের' উল্লেখ থাকলেও লৌকিক প্রেমের চিত্রই উদ্‌ঘাটিত। যেমন :

বড় দাগা দিল রে বন্ধু সুখের দিনে
শ্যামের আশায় নিরাশায় নিশি জাগরণে

* * *

বড় সুখের দিনে,
আমার শ্যাম আসিবার আশা ছিল,
সে আশা নৈরাশ হল,
আমার সাধের মালা শুকাইল বিচ্ছেদ আগুনে।
আমার প্রাণবন্ধু আসবে বলে,
সে যে বিছালাম বকুল ফুলে,
বন্ধু আমার ডুবাইল অকুল তুফানে।
নাই নাই সখি, নাইরে রাতি, মলিন হলো মোমের বাতি,
দেখ গো উদয় হল জ্যোতির জ্যোতি।
নিরাশা জীবনে। [ঐ]

কুইলাপালের মানুষ কোন কাজকেই নিছক কাজ বলে কোনদিন মনে করেনি। ফলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করে এবং গেয়ে কাজকে সরস করে তুলেছে। ঢেঁকি বাংলাদেশে ধান ভানার একটি দেশীয় ও পরিচিত যন্ত্র। পূর্বে বাংলাদেশের গ্রামগুলি ঢেঁকির আওয়াজে মুখরিত থাকত। আজ ধান-কলের প্রভাবে বাংলাদেশের যে নিজস্ব ধান কাটার রীতি বিলুপ্তির পথে হলেও কুইলাপালের মানুষ ঢেঁকিকে ভোলেনি, আর ভোলেনি তার ধান ভানার গানকে। তাই সুধীর নামাতা সেদিন শুনিয়েছিল ঢেঁকির গান :

ঢেঁকির গান

১। ও নব ঢেঁকিয়ারে সামালে কুটে ধান।
কুলাটি তো বলে, আমি বাঁশের পাতুড়ি
নব ঢেঁকি ধান ভাঙে আমি ত পাছুড়ি।
ঝাঁটাটি তো বলে, আমার কোমরে বাঁধা দড়ি
নব ঢেঁকি ধান ভাঙে আমি জড়ো করি।
থাঁক শলুইটি বলে, আমি এতটুকু কাঠ।
আমি না থাকিলে ঢেঁকি হবি যে চিৎপাত।
খুঁটা দুটি বলে আমরা দুজন মূল,
আমরা না থাকিলে ঢেঁকি হবি যে বেমূল।
ঢেঁকিটি তো বলে আমি নারদেরই নাতি,
সর্বাঙ্গ থাকিতে মোরে পিছে মারে লাথি।
ও নব ঢেঁকিয়ারে সামাই কুটো ধান। [কুইলাপাল]

২। ঢেঁকির দুজন ভানানি নাম তাদের কৃষ্ণমোহিনী
ঢেঁকির দৌলতে আমাদের উপাসনার গহনা। [ঐ]

পাতানাচ কুইলাপালের একটি জনপ্রিয় নৃত্য। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে পরস্পরের মধ্যে সখীত্ব অথবা দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করত। এই নৃত্যটি আদিবাসী নৃত্য, পরে হিন্দুভাবাপন্ন গ্রাম্য সমাজে ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করেছে। করম নাচের সঙ্গে এই নাচের ও গানের মিল লক্ষ্য করা যায়। করম গাছের পাতাশুদ্ধ ডাল দিয়ে এই নৃত্য হয় বলে অনেকে একে করমনাচ অথবা পাতানাচ বলে। কুইলাপাল গ্রামে ভোলানাথ কালিন্দী কতকগুলি পাতানাচের গান শুনিয়েছিল। তখন অবশ্য কোন উৎসব ছিল না। আমাদের অনুরোধে সেদিন সে গানগুলি গেয়েছিল :

পাতানাচের গান

১। বরষা আগত ভেল, মেঘেতে বিজুরী খেল,
মাতি গেল যত শিখীকুল গো
হরি শূন্য রহিল গোকুল। [কুইলাপাল]

২। শুকনা কাঠের বাঁশী বাজে ঝঙ্কট রে,
ঘরে না ঠহরে মন, কি হল জঞ্জাল রে। [কুইলাপাল]
৩। আশার আশে রইলাম বসে বদরি তলায় গো।
কমলিনী ধনি তোমারই আশায় গো। [ঐ]
৪। বাঁধ কুড়লে বন্ধু না বাঁধিলে ঘাটে,
ডালিম লাগায়ে বঁধু গেল পরদেশে। [ঐ]
৫। টিপটিপে ভ্রমরা বৃন্দাবনে বাসে,
পর দেশের ভোমরা ভাই এ খড়া সামায়ে। [ঐ]

ধর্মকে বাদ দিয়ে কুইলাপালের মানুষ কর্মের কথা চিন্তা করে না। দেহতত্ত্ব বাংলাদেশের একটি লৌকিক ধর্মতত্ত্ব। এঁরা ঈশ্বর অপেক্ষা আত্মায় অধিক বিশ্বাসী। দেহকে বাদ দিয়ে আত্মার স্বরূপ এরা কল্পনা করে না, তাঁরা মনে করেন দেহ ফুল বাগানে মনরূপী ভ্রমর আত্মার মধ্যে বিরাজমান। কুইলাপালে সংগৃহীত একটি দেহতত্ত্বের গানে এই সব ভ্রমরার উল্লেখ পাওয়া যায়:

দেহতত্ত্বের গান

১। মন তোমার মায়ার শিকল, মুখে হরি হরি।
ও তুই দিনের বেলা বেড়াস ঘুরে,
নকল সোনার ব্যবসা করি।
কামিনী কাঞ্চনের নেশায় ডুবে আছিস ভবের জুয়ায়
শেষে দিন ফুরালে যেতে হবে, বাঁশের চতুর্দোলায় চড়ি।
মন তোমার মায়ার শিকল মুখে হরি হরি।
বিষয় সম্পদ জৈষ্ট মধু খেয়ে মন ভ্রমরা রঙ্গ ভরি,
বেড়াস নেচে গেয়ে।
ওরে নয়ন মেলে দেখিস নাকি তোর জমার খাতায় সকল ফাঁকি
থাকতে বেলায় আলোয় আলোয় গুনে নে তোর পারের কড়ি,
মন তোমার মায়ার শিকল মুখে হরি হরি। [কুইলাপাল

কাঠিনাচ পশ্চিম বাংলার যুদ্ধ-নৃত্য সম্বলিত গীত। সামন্ত রাজাদের গৃহে বৃত্তিভোগী পাইকদের দ্বারা দুর্গোৎসব বা অন্যান্য

উৎসবের সময়ে এই নাচ ও গান অনুষ্ঠিত হতো। এখনও এই নাচ গান বাংলাদেশের পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত আছে। গানের প্রধান বিষয়বস্তু রামায়ণ, ভাগবতের কাহিনী। কুইলাপালের মানুষের কাছে এই নাচ গান আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়। কয়েকটি গানের উদাহরণ দিলে এর যাথার্থ বোঝা যাবে:

কাঠিনাচের গান

১। দধি বিক্রয় ছলে যান শ্যাম গরবিনী,
কৃষ্ণ দরশনে যান সঙ্গেতে গোপিনী।
চলিলেন গরবিনী মথুরার হাটে,
নাবিক হলেন কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে।
সঙ্গেতে বড়াই ছিল কাজে বড় পাকা,
ওপারে নাবিক বুঝি ওই যায় দেখা।
নাবিক বলিয়া ডাক দিল যত সখি
তরঙ্গে আনিলেন তরি শ্যাম কমলাকে।
ঘাটেতে লাগায়ে তরি বলেন কানাই
একবারে কেমন করিব পারাবার।
একে একে পার যদি হতে পার সবে,
ভাঙ্গা নায়ে পার করে দিব তবে।
সব সখিকে পার করিলে পাব আনা আনা
রাধিকাকে পার করিলে লিব কানের সোনা।
স্বীকার করিয়া রাধে চাপিলেন তায়
এখন খেয়াতে রাধা বিনোদিনী রায়।
মাঝেতে লাগায়ে তরী বলেন মুরারি
কেমনে করিব পার সামালিতে নারি।
খুল খুল ওগো রাধে অঙ্গের অলঙ্কার,
তরণী ডুবিয়ে গেলে কি হইবে আর।
ধীরে ধীরে খোলে রাধে অঙ্গের ভূষণ
হাসিছে রসিক কৃষ্ণ মুরলী বদন।
কৃষ্ণ বলে, বড় মেঘ ধরেছে উত্তরে,
ওই মেঘের ভরে জল হলেও হতে পারে

গৌর অঙ্গ নীল শাড়ী পরেছো গো ভাল
সাজিল দ্বিগুণ মেঘ কি করিব বল।
রায় ধনি শ্যাম চাঁদ মাঝ দরিয়ার মাঝে,
নীলপদ্ম লালপদ্ম আ মরি কি সাজে।
অনুভবে ভরে চাপায়ে রাধারে পুলকে পুরল,
মাঝ দরিয়ায় লয়ে রাধা কাঁপাতে লাগিল।
অমনি চতুরা কিশোরী দুবাহু পশারি ধরিল কানুর হাত
অমনি রাধা কোলে করি রসিক মুরারি
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে।
অমনি ভাসিতে ভাসিতে আসিতে লাগিল
নিভৃত নিকুঞ্জ বনে।
মনে যেবা ছিল বাসনা পুরাল দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে। [কুইলাপাল]

কুইলাপালের কাঠিনাচের গানে কেবল রামায়ণ-ভাগবতের কাহিনীই ছিল না, মহাভারতের প্রভাবও দেখা গেছে সেখানে। রসরাজ সহিস সেদিন তার দাওয়ায় বসিয়ে যে গানটি শুনিয়েছিল সেটি পুরোপুরি একটি মহাভারতের কাহিনী :

২। বৈশম্পায়ন বলে,
'মহাভারতের কথা শুন মহাশয়।
একদিন যাব আমি কর্ণের নিকটে,
বুঝিব সে কর্ণবীর কেমন দাতারে।
মহা কবি আইল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
অতি বৃদ্ধ রূপ হইল দুই চক্ষু অন্ধরে
পার না করয়ে কর্ণ কিবা দিতে পার হে।
কাল করে আছি ব্রত একাদশী,
পার না করাও কর্ণ কত দিতে পার হে।
কর্ণ বলে যাহা খাইতে চাও কিনে এনে দিব।
বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন,
তারে কাটি দেহ মাংস করিব ভোজন।
রানীকে জিজ্ঞাসি আমি বৈস এখানে,
কোথা হতে আইল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

অতি বৃদ্ধ রূপ হইল দুই চক্ষু অন্ধ
কাল করে আছি ব্রত একাদশী পারণ করাও কর্ণ,
বৃষকেতু বাছা মোর খেলিছে বাজারে,
খেলা ছাড়ি একবার এস বাছাধন
কি জন্য ডাকিছেন পিতা ঘরে যেতে হল রে,
তোমরা খেলহ সব বলে আসি আসি,
পদ্মাবতী বলে নাথ কি বলিব আর,
কোথা হতে আইল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
তোমার পিতাকে সে সত্য করাইল রে।
তোমারে কাটিয়ে মাংস করিবে ভোজন।
'ব্রাহ্মণে আমার মাংস করিবে ভোজন'
বৃষকেতু বলে, প্রভু কি বলিব আর
ব্রাহ্মণে আমার মাংস করিবে আহার [ঐ]

কুইলাপালে কিছু অন্যান্য রসের গানও সংগৃহীত হয়েছে। উত্তর বাংলায় যাকে চটকা-জাতীয় গান বলে কুইলাপালে সেই ধরণের গানগুলিকে রঙ্গরসের গান বলা হয়েছে। কুইলাপালের রসিক মানুষেরা রঙ্গরসকে তাদের জীবনে সাদরে গ্রহণ করেছে। গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তুর পর হাল্কা লঘু বিষয়বস্তু তাদের জীবনে হাসির খোরাক জুগিয়েছে। বাঁশডিহা গ্রামের সাধুচরণ দাস পেশায় কবিরাজ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের মানুষকে কেবল ঔষধই দিয়ে বেড়ায় না বিভিন্ন গান শুনিয়েও পরিতৃপ্ত করে। সেদিন সাধুচরণ একটি রঙ্গ-রসের গান শুনিয়েছিল :

১। বিয়া করে কি ঝকমারি,
বিয়ের আগে ছিলাম পুরুষ আমি এখন হলাম নারী।
সকাল বেলায় করবে বরাত, এনে দাও পান দোক্তা সুপারী
জোগাড় করে দিলে বলে, তোমার ঘরে নাই তরকারী ;
বিয়ে করে কি ঝকমারী॥
শাক মূলা কাঁচা কলা কিছু জোগাড় করতে নারি ;

পির্‌রা এনে দিয়ে বললাম, 'এটার নাম সরকারী তরকারী'।
কাঁথের কলসী কাঁখে ফেলে যাবে দিতাটি গণ্ডারি।
এমনি ভাবে চলবে, যেমন যুদ্ধে যাচ্ছেন পেয়ারী
উল্টা পাল্টা তেপাল্টা তিন সাত্তে একুশবার ঝকমারি,
লক্ষ্মীকান্ত বলে ভাই বরং উপাসনা সবাসনা করি। [কুইলাপাল]

এভাবেই কুইলাপালের মানুষ গান গেয়েছে, গান শুনিয়েছে। কখনও তা তত্ত্বমূলক, কখনও প্রেমের অনির্দেশ্য বেদনার কথা, কখনও বা তা সমাজ জীবনের আশা আকাংক্ষার বাণীরূপ। কুইলাপালের হাটে এমনি করেই হয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের বিনিময়। গ্রাম থেকে আসা দেহাতী মানুষ সারাদিন কুইলাপালের গ্রাম্যজনের সঙ্গে গায়ে গা মিশিয়ে হাঁড়ি কিনেছে, কিনেছে কোঁচড় ভর্তি মহুয়ার ফুল আর কিনেছে কাঁচের চুড়ি। গান গাইতে গাইতে ছোট্ট পাহাড়ী নদী পার হয়ে শালবনের ধার ঘেঁসে গ্রামে ফিরেছে। পথে গান ধরেছে ঃ

দু'পহর বেলা হইল শহরবালী তাতা হইল
আমি লক্ষ্মণ চলিতে না পারি।
পথে আছে কদম গাছ ডাল লক্ষ্মণ ভাঙ্গি দাও,
আমি লক্ষ্মণ ধীরে চলিব।

নির্জন বনান্তের প্রান্তে নিজেদের গ্রামে এসে আবার তারা পরের হাটদিনের জন্যে অপেক্ষা করে আর গান গায় ঃ

কুইলাপালের হাট যাব,
চুড়ি কিনিব গো দিদি তোরই মতন,
দিদি হাত নাড়িব গো তোরই মতন।

কুইলাপালের মাঠে, মাঠে, গৃহাঙ্গণে এখনও অজস্র গান ছড়ানো। কুইলাপালের হাট তাই অজস্র গানেরও দেওয়া নেওয়ার কেন্দ্রস্থল। কুইলাপালের হাটে যেন সেখানের মানুষের প্রাণের গানও ছড়ানো আছে।

॥ দুই : বাঁশপাহাড়ীর লোকগীতি ॥

গুরু, জনম দুঃখীর কপাল মন্দ আমি এক জনা,
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল,
আমার দুঃখ বিনে সুখ হলো না।

সেদিন বাঁশ পাহাড়ীর বিদায় মুহূর্তে হারাধনের গানের এই কলিগুলি বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই প্রকৃতির সুন্দর প্রেমের রাজ্যে মানুষের দুঃখের কেন শেষ নাই? কেন মানুষের জনম কেবল দুঃখে দুঃখেই অতিবাহিত হয়? কেন সুখ মানুষের ভাগ্যে জোটে না। কেন হারাধন বারবার গেয়ে ওঠে :

আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল,
আমার দুঃখ বিনে সুখ হলো না।

কেন গুরুকে তারা জিজ্ঞাসা করে বলে ওঠে: 'গুরু, জনম দুঃখীর কপাল মন্দ আমি এক জনা।'

হারাধনের কপাল সত্যিই তো মন্দ। না-হলে বছর না যেতে যেতেই জোয়ান ছেলে গেল মরে, আর বহু কষ্টে বাঁধা ঘর গেল পুড়ে ছারখার হয়ে। তাই যখন হারাধনের একতারা হাতে মনের আনন্দে গান গাওয়া ছবিটা ভেসে ওঠে, বহু ভাবনা মনে এসে জড় হয়, প্রশ্ন জাগে, ব্যাকুল হয়ে ওঠে আমার আত্মা, এদের দুঃখের গভীরে ঢুকে তার পরিমাপ করতে।

আজও তাই ভাবি বাঁশপাহাড়ীর সেই সরল, সাধারণ মানুষের কথা। হারাধন যাদের মূর্ত প্রতীক। শালবনের সবুজে ঘেরা নীল আকাশের নীচে বাস করা এইসব শান্ত মানুষগুলোর জীবনে কেন এত কষ্ট—কেন এত দুঃখ। একদিকে প্রতিদিনের খাওয়া-পরার নিদারুণ দুর্বিপাক, কঠোর মাটির সঙ্গে যুদ্ধ করে যাদের জীবনের প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে দুর্বিসহ; তারা আবার গান গায়, প্রাণের সুপ্ত আনন্দকে ছড়িয়ে দেয় রুক্ষ মাটির প্রান্তরে, শালবনের সবুজে সবুজে, নীল আকাশের অসীম শূন্যতার খাঁজে খাঁজে, গ্রামীন মানুষের মনের গভীরে গভীরে। বাঁশপাহাড়ীর মানুষ তাই দুঃখও

পায় কিন্তু গানও গায়। দুঃখ দিয়ে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কি? তাই মনে হয় হারাধন তার একতারাটি নিয়ে আজও গান গায় গ্রামের পথে পথে, লাল ধূলোর ওড়না উড়িয়ে গাজনতলার পাশ দিয়ে, বুড়ো শিবের আস্তানার ধার দিয়ে আজও সে যেন চলেছে। হয়তঃ পথক্লান্ত হারাধন গ্রামের শেষে অশ্বত্থ তলায় বিশ্রামের জন্যে বসেছে—একতারায় বোল উঠেছে আর গান শুরু হয়েছে:

গর্ভে রেখে মরল পিতা চোখেও দেখলাম না।
আমায় কে করিবে লালন পালন কে দিবে আমায় সান্ত্বনা।
ও যে ভবের বাজারে ছ'জন চোরে চুরি করে বেঁধলো আমারে,
তারা বিচারেতে খালাস পেল, আমার হলো জেলখানা,
আমি এক জনা॥
মনের খেদে দাগা পান, অন্তিমেতে রেখো, গুরু,
যেন না হয় নিধন॥
আমি ঐ চরণে শরণ নিব, গুরু চরণ ছাড়া করো না।
আমায় চরণ ছাড়া করো না॥

বাঁশপাহাড়ী একটি গ্রামের নাম। বাঁকুড়া থেকে ঝিলিমিলির বাস ধরে অনেক পথ অতিক্রম করে, অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে, শালবনের বুক চিরে বাঁকের পর বাঁক পার হয়ে পৌঁছতে হবে ঝিলিমিলির পাহাড়ী প্রান্তে। এখান থেকে সোজা চলে গেছে রাস্তা। বাঁকুড়ার সীমান্ত পার হয়ে ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে, উঁচু নীচু জমির প্রান্ত ধরে সোজা বাঁশপাহাড়ীতে। বাঁকুড়া জেলা অতিক্রম করে আলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে পথটি যে অখ্যাত গ্রামটিতে এসে মিশেছে তারই নাম বাঁশপাহাড়ী। এটি মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এই গ্রামটির একদিকে বাঁকুড়া জেলা, অন্যদিকে পুরুলিয়া, অনতিদূরে বিহারের সীমান্ত অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের প্রান্তবর্তী একটি গ্রাম বাঁশপাহাড়ী। চারদিকে ঘন অবিচ্ছিন্ন শাল-মহুয়ার বন, দূরে দূরে ছোট ছোট অনুচ্চ পাহাড়। এখানকার

মাটি রুক্ষ কঠোর গৈরিক বর্ণ। লালমাটি আর মহুয়ার রঙে এক নূতন বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে বাঁশপাহাড়ীর মাটিতে, তা না গৈরিক না লাল। রুক্ষ, মাটির সঙ্গে সংগ্রাম করে এদের জীবিকা। প্রধানতঃ কৃষিকর্মই বাঁশপাহাড়ীর অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করেছে। জমি অত্যন্ত রুক্ষ কঠোর, কাঁকর আর পাথরে ভরা। উঁচু ডাঙা জমি, জলসেচের বন্দোবস্ত খুবই অল্প। দু একটা বাঁধ হয়তো আছে, কিন্তু তা সংখ্যায় অতি অল্প। তাই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড অগ্নিতাপে শালের আর মহুয়ার পাতাগুলো যখন ছারখার হয়ে যায়, লাল কাঁকুরে মাটি তপ্ত হয়ে যখন অগ্নিবর্ষণ করতে থাকে তখন বাঁশপাহাড়ীর আকাশে বাতাসে বৃষ্টির জন্যে করুণ আর্তনাদ ওঠে :

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে
ধানের মা বুড়ি কাঠ কুড়াতে গেলি
ছখানা কাপড় পেলি ছবৌকে দিলি
কলা গাছের আড়ে আপনি মলি জাড়ে
কলা পড়ে ধুপ ধাপ।
বুড়ি খায় গুপ গাপ॥

কিন্তু তবু বৃষ্টি আসে কই? লাল কাঁকুরে-পাথুরে মাটি ফেটে চৌচির। উত্তপ্ত রোদের উজ্জ্বল শিখাগুলো যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে পাথুরে মাটির উপর। আদিবাসী যুবতী হাট থেকে ফেরার পথে উত্তপ্ত রোদের জ্বালায় ছটফট করে ওঠে। বাঁশপাহাড়ীর টুসু গানে তারই প্রতিধ্বনি :

উপরে রবির তাপ, মাগো, তলে তাতা বালি গো,
চলিতে না পারে সীতা কবিছে বিজলী গো।
বিধি এই করিলে মোর কপালে নিবাস লিখি দিলে।
ভাঙ্গিয়ে তরুর ডাল, মাগো, লক্ষ্মণ ধরে ছিলে গো,
ওগো, তাহার ছায়াতে সীতা চলেন ধীরি ধীরি গো,
বিধি এই করিলে॥

তবু কৃষক কঠিন, দুর্দম মাটির সঙ্গে সংগ্রাম করে হাল করে—রিক্ত সর্বহারা মাটিকে প্রাণ দেবার চেষ্টা করে—একজোড়া বলদ

আর ভোঁতা হালের সঙ্গে গ্রীষ্মের প্রান্তরের কি অসহায় সংগ্রাম। রিক্ত বসুন্ধরার বুকে বরুণদেবের বর্ষণ এখনও এল কৈ? আষাঢ়ের কালো মেঘ দেখা দিয়ে, কৃষককে একটু প্রলোভন দেখিয়ে উড়ে চলে যায় কোন দূরদেশে। আদিবাসী কৃষক বৃষ্টির আশায় মাঠে গিয়ে হাল ধরে আর কৃষক রমণী ঘরের কোণে আর্তনাদ করে ওঠে:

দু-পহর বেলা হইল, পথের বালু তাতিল
ঘরের মানুষ ঘরে ঘুরি আইল।
দুপুর কোলাহল, সময় হয়ে গেল,
তুমি কাজ ছেড়ে চলে এসো।

তারপর সত্যি সত্যি একদিন বৃষ্টি আসে। রিক্ত ধরিত্রীর বুক চিরে জলের বন্যা নামে। কৃষক রমণী গান গায়:

আমার বন্ধু হাল করিছে কানালের ধারে,
ও ননদিনী লো, আমি যাব নিজে বাসাম দিতে॥

কিংবা,

তালপাতার ছাহুনি ঘর
জল পড়ে ঝর ঝর, ও কুইলাপালের ঘর,
বাধনিকে নিতে আসে জ্বর।

বাঁশপাহাড়ীর আদিবাসী সমাজে তখন করম উৎসব। জঙ্গল থেকে করমগাছের একটি ডাল ভেঙ্গে এনে গ্রামের একটি প্রকাশ্য স্থানে পুঁতে ফেলা হয় তারপর তাকে ঘিরে মাদল বাজিয়ে নাচ ও গান চলতে থাকে:

বারো মাসে বারো পরব ভাদর মাসে ইঁদ করো,
চল, দেওরা বাইড়াম যাব।
ইঁদ দেখতে যাব, শাখা পরালো রে ঘর ফিরিবার বেলা
মার খাইল রে।

অথবা,

পদ্ম পাতারই জল করে টলমল
কন্যা করি ছেড়ে ধন,
তোকে দেখিতে আসিছি আছ কেমন।

বাঁশপাহাড়ীর আকাশে বাতাসে তখন আনন্দের হিল্লোল। পরব শুরু হয় আদিবাসীর গ্রামে গ্রামে। এ উৎসব শস্যের আবির্ভাব উৎসব। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী পুরুলিয়ার এই উৎসবের নাম জাওয়া পরব। এ উৎসবের প্রধান লক্ষ্য শস্যের অঙ্কুরোদ্গম। টুসু উৎসব যেমন শস্য উৎপাদন পরবর্তী উৎসব জাওয়া ঠিক তার বিপরীত উৎসব। ভাদ্রমাসের একাদশীর একপক্ষ কাল আগে এ উৎসব শুরু হয়। উৎসবের দিন সকলে অর্থাৎ গ্রামের মেয়েরা ডালায় বালি রেখে তাতে নানা রকম শস্যের বীজ রোপণ করে, সেগুলি জলসিঞ্চনে মুকুলিত করে গৃহস্থের আঙ্গিনায় রেখে নৃত্যগীত করে। গান গায়ঃ

বনে ফোটে কুরচি ফুল বন করে আলো লো,
বিটি ছিলার মিছাই জনম শ্বশুর ঘরে জ্বালা॥

বন আলো করে কুরচি ফুল ফোটে তাতে বন আলো যায় যায়। কিন্তু মেয়েছেলের জন্মই বৃথা। কার শ্বশুর ঘর সে আলো করতে পারে না। শ্বশুর ঘরে তার জ্বালার সীমা পরিসীমা নাই।

তারপর আসে টুসু উৎসব। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধান যখন পেকে ওঠে, গৃহস্থের মরাই যখন পাকা ধানে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন তুষ ভরা একটি মাটির সরায় ফুল দিয়ে সাজিয়ে তিনদিন পূজার পর মকর সংক্রান্তির দিন নদী অথবা বাঁধের জলে মেয়েরা ভাসাতে যায় আর গান গায়ঃ

যমুনায় জল আনিতে যেয়ে,
বড় ভয় লাগে বন্ধু—বড় ভয় লাগে।
কি জানি কেউ আছে ঘাটে,
চমকি লাগিল আমার যৌবন বয়সে।
যৌবন বয়সে আমার, যৌবন বয়সে।
কি জানি তোর কুল গো যাবে আমি যাই।
জানি ও তোর অল্প বয়সে—অল্প বয়সে।
আমার অল্প বয়সে কি জানি কেউ আছে ঘাটে।
চমক লাগলি আমার যৌবন বয়সে॥

যমুনায়, জল আনতে যেয়ে নায়িকার মনে বড় ভয় কি জানি যদি কেউ ঘাটে থাকে। নায়িকার চমক লেগেছে, যৌবন উত্তাল হয়ে উঠেছে, কি জানি কুল রাখা হয়ত দায় হবে। নায়িকা আরও বলেছে তার অচিন প্রিয়ার উদ্দেশ্যে :

ওহে ও বিদেশী, এবার আমার করতে হবে মন খুসী।
টুসু পুজার আসছে বাজার মনে আনন্দে ভাসি।
আমায় দিতে হবে জোড়া তাবিজ,
শেমিজ আর তেলের শিশি।
গত বৎসর পাইনা কিছু তারে দুঃখ প্রকাশি।
আমার কেঁদে কেঁদে দিন গিয়েছে,
জানে সব দেখন হাসি, ওহে, ও বিদেশী।

প্রবাসী প্রিয়ার উদ্দেশ্যে বাঁশপাহাড়ীর যুবতীর পাওনা এবং প্রত্যাশায় গানটি মুখর। প্রিয়তমের মনকে খুশী করতে হবে। আকাংক্ষা তার সামান্য হলেও গ্রাম্য যুবতীর কাছে তা সুপ্রচুর। একজোড়া তাবিজ, শেমিজ আর তেলের শিশি—এইমাত্র তার চাহিদা। তাও আবার গত বছর প্রিয়তমের আগমন হয়নি। প্রিয়তম আসেনি তাই দুঃখে কেঁদে কেঁদে কতদিন কেটে গেছে। তাই এ বছর প্রিয় আসবে বলে বাঁশপাহাড়ীর যুবতীর সাজসজ্জা শুরু হয়েছে :

বাঁকুড়ার আয়না-চিরুণ কলকাতার ফিতা,
অতি যত্ন ক'রে বেঁধেছি মাথা, তাও যে বাঁকা সিঁথা।

তারপর হেমন্তের দুয়ার অতিক্রম করে বসন্তকাল আসে, চৈত্র মাসে শুরু হয় গাজন উৎসব। বাঁশপাহাড়ীর গ্রামে গ্রামে তখন ভক্ত্যার দল গেরুয়া বসনে ছড়ি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঢাকের আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠেছে শালবনের প্রান্তর। মহাদেবের চরণে সেবা লাগে এই ধ্বনিতে মুখরিত বাঁশপাহাড়ী। গান উঠেছে আদিবাসীর কুটিরে কুটিরে, আদিবাসী যুবতীর দল গান গাইতে গাইতে কুইলাপালের হাটে চলেছে :

ঘাটশিলা বহিল, পুরুলিয়ার দালান ডুবিল রে।
ছাদের উপরে কেনে রানী—কেনে কাঁদিছে রে।
অগম জলে ঝাঁপ দিতে, কারে বলিব রে।
কারে বলিব রে॥

তাই হারাধনের মত বাঁশপাহাড়ীর মানুষের জীবনে অনেক দুঃখ ও সমস্যা থাকলেও সমস্ত বছর ধরে তারা উৎসবে-আনন্দে গান বেঁধেছে, গান গেয়েছে, গান শুনিয়েছে। সারা বছর ধরে নানা উৎসবে, পালে-পার্বণে জীবনকে কখনও নিরানন্দ হতে দেয় নি। মাটি তাদের রুক্ষ, কিন্তু এই রুক্ষ মাটিতেই সবুজ শাল আর মহুয়ার সমারোহ। জীবনও তাই রুক্ষ কঠোর হলেও জীবন-রসিক এই মানুষের দল তাদের জীবনকে কখনও নীরস হতে দেয় নি—পাথুরে মাটি থেকে রস আহরণ করে। মহুয়ার ফুল যেমন রসে ভরপুর, ঠিক তেমনিই তাদের জীবনে অনাবৃষ্টি, খরা, অনাহার আর দারিদ্র্য চিরসঙ্গী হলেও মনের মাটিকে তারা পালে-পার্বণে-উৎসবে-কথায়, কাহিনীতে, ছড়ায় ও বচনে মুখর করে রেখেছে। বাঁশপাহাড়ীর লোকসংগীত তাই রুক্ষ মাটির গান নয়, ও অঞ্চলের মানুষের সরস মনের সবুজ সৃষ্টি। তাই চৈত্রের শালবনে যখন সবুজ পাতায় শিহরণ জাগে, বনে বনে মহুয়ার ফুল রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন বাঁশপাহাড়ীর যুবক-যুবতী প্রেমের জোয়ারে মাতাল হয়ে ওঠে, বাঁশপাহাড়ীর প্রান্তরে তাই যখন জ্যোৎস্না নামে তখন বাঁশপাহাড়ীর রুক্ষ পাথুরে প্রান্তর কেমন যেন মোহময়, মায়াময় হয়ে ওঠে। শালের কচি পাতাগুলো চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করে ওঠে। বাঁধের জল করে ওঠে ঝিলমিল, বাতাসে ভাসে মহুয়া ফুলের মাতাল গন্ধ। দূর থেকে শোনা যায় শালবনের প্রান্তরে কে যেন বাঁশী বাজায়। তার উদাসী সুর বাঁশপাহাড়ীর যুবতীকে আকুল করে তোলে, নির্জন কুটির প্রান্তে বসে সে গান গায়, আর সে গান খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে বাঁশপাহাড়ীর জ্যোৎস্না মাখা প্রান্তরে, দূরের নীল নীল পাহাড়ের চূড়োয়, আর শান্ত মহুয়া বনের গভীরে গভীরে :

মালা গাথা রইলো,
কি কারণে বঁধুর আমার মন ভাঙ্গিল।
যার লাগি গৃহত্যাজি, থাকি গো নিজনে বসি গো।
সে বঁধু ছাড়িয়া মোরে কোথা রহিল॥
শেফালী চামেলী বেলি, যুঁই চাঁপা পারুল গো,
আধা ফোটা ফুলে আমার সাজি ভরিলো।
ফুল তুলি নানা জাতি, নির্জনে বসি মালা গাঁথি,
বঁধুর গলে দিব বলে আমার আশা ছিল॥
অধম বীনার বাণী, শুন বলি ওলো ধনী,
পর-পীরিতির এমনি ধারা যেমন হাতে চাঁদ পাইল।

বাঁশপাহাড়ীতে যে সব গান সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে করম সংগীত, পাতানাচের গান, কৃষি সংগীত কাঠিনাচের গান, খেমটি গান, গাজনের গান, চড়ক ও চৈত-পরবের গান, চাষের গান, ঝুমুর, জাওয়া, টুসু, ঢুয়া, ধান কাটা, ধান ভানা, পাতানাচের গান, বাধনা পরবের গান, দেহতত্ত্ব ও বাউল গান, বিয়ের গান ইত্যাদি। বাঁশপাহাড়ীতে সংগৃহীত গানগুলির বিষয় বিচিত্র হলেও এগুলি কোন ক্ষেত্রে পার্বণ সংগীত, কোথাও তা নৃত্যসমন্বিত গান, কোথাও তা সামাজিক আচারমূলক। বাঁশপাহাড়ীর এই গানগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এর সারল্য ও ভাবগাম্ভীর্য। বাঁশপাহাড়ীর লোক-সংগীতগুলি বাঁশপাহাড়ীর মানুষের জীবনের সঙ্গে সুগ্রথিত বলে সেগুলি বাঁশ পাহাড়ীর জীবন সংগীত। এবার বাঁশপাহাড়ীর লোক-সংগীতগুলির পৃথক পৃথক আলোচনা করে এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হবে। এই আলোচনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে এই লোক-সংগীতগুলির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও সমাজ এবং মানুষের কথা আবিষ্কার করা।

বাঁশপাহাড়ীর শাল আর মহুয়া বনের ধারে কুটির বেঁধে বাস করে অসংখ্য আদিবাসী মানুষের দল। এদেরই বর্ষা উৎসবের নাম করম উৎসব। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার এইসব আদিবাসী মানুষের

দল ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীতে গভীর জঙ্গল থেকে কেটে আনে করম গাছের একটি পাতাশুদ্ধ তাজা ডাল। তারপর সেটি গ্রামের একটি ফাঁকা জায়গায় পোঁতা হয়। তারপর চাঁদের আলোয় যখন বাঁশপাহাড়ীর প্রান্তর ভেসে যায়, জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে যায় শালবন আর মহুয়ার বন, তখন মাদলের আওয়াজ ওঠে, কেঁদরি বাজে, আর গান শুরু হয়ঃ

করম গান

১। সব পরবেই আসবি ভাই, করম পূজায় আসবি রে,
করম ফুল আনবার সময় সাথী মনে পড়ে রে।

করম পূজোয় সকলেরই আসা চাই। অন্য পর্ব-পার্বণে তো আসবেই, করম পূজোয় আসতেই হবে। তাই করম ফুল তোলার সময় সাথীর কথা বার বার মনে পড়ে, বেদনায় মন আপ্লুত হয়ে যায়। কিন্তু তারই মাঝখানে একটু আনন্দের সুর।

ঝিঙ্গা মাঝে রেঁধেছি ননদিনীর লাগে লো।
অনেক রাতে খবর এলো ননদ মরেছে লো॥

ঝিঙা মাঝে রেঁধেছি, কারণ ননদিনীর তা লাগে। হঠাৎ রাতে খবর এলো ননদ মরেছে। শাশুড়ী ও ননদিনী নিপীড়িত বধূর বেদনায় গানটি উজ্জ্বল। কিন্তু তবু সে দুঃখ প্রকাশ করে না। বলেঃ

একদিনকার হলুদ বাটা তিন দিনকার বাসি,
মা বাপকে বলি দিবি বড়ই সুখে আছি।

প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে মনের সবকিছু কামনা-বাসনার প্রকাশ করম গান। তাই করম গান যেন আদিবাসী রমণীর কামনা-বাসনার সুরভারতী। দুটি গানে এর পরিচয় আছেঃ

কলির বাগানে যাসনে ভাই একাসনে,
বলিব মনের কথা রাখবি ভাই গোপনে।
তুমি আমার বাঁকা সিঁথা তুমি আমার সিঁদুরের ফোঁটা
ভাই রসোল্লৎ॥

অথবা,

আমতলে ফুলের মালা, নিমতলে গোখের ধারা
বন মাঝারে কালা কে দিল বনফুলের মালা, কে দিল পরায়ে॥

করম সংগীতে মাঝে মাঝে সৌন্দর্য-সৃষ্টি ও অধ্যাত্ম-প্রত্যয়ের সূচনা করেছে। বাঁশপাহাড়ীতে সংগৃহীত দুটি গানের মধ্যে এর পরিচয় মেলে :

১। সারা বন ঘুরি ঘুরি বনপুষ্প তুলিতে,
হায় হায়, বন ফুল বন মাঝে মনকে ভুলেছে,
কত প্রেমের ছলে।

২। শিশু বয়সে কালে (ও যে গো), নাই জানি গো জ্বালা,
(ও যে) ধনী গো দুলালিনী শিশুকালের বেলা॥

পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নৃত্যসমন্বিত এই গানগুলি প্রচলিত আছে। নানা গ্রাম্য মেলা ও উৎসবে এক ধরণের নৃত্যব্যবসায়িনী নাচের সঙ্গে এই লোকগীতি পরিবেষণ করে। এই গান-নাচের সঙ্গে সাধারণতঃ বাঁশি, ধামসা, ঢোল ইত্যাদি বাজে। গ্রামের মেলার প্রান্তে বটগাছের নীচে ছেঁড়া চাটাই বিছিয়ে আসর বসে। 'রসিক' পুরুষ ধুয়া ধরে—গান শুরু হয় :

খেমটি গান

১। প্রেম করা ত সহজ নয়, আর প্রেম কি শুধু হয় গো।
প্রেমে পাগল হয় গুরুজন, প্রেমে জাতি কুথা যায় রে,
প্রেমে যায় জীবন এমনি প্রেমের ধারা ;
মন যে আমার ক্ষেপার পারা,
না বুঝে ডুব দিলে শেষে হারাবে জীবন।
ও প্রেম করো পারে মন,
প্রেমে জাতি কুল যায় রে প্রেমে যায় জীবন।
প্রেম-সরোবর মাঝে আর দুটি কমল ফুটে আছে,
হাত বাড়ালে কমল, নিশ্চয় সরল,
প্রেমে জাতি কুল যায় রে, প্রেমে যায় জীবন।
রায় হরিদাসে বলে আর ভুলো না মায়াজালে,
এ কূল ও কূল দুকূল যাবে শেষে হারাবে জীবন।

প্রেমই খেমটি গানের মূল বিষয়বস্তু। এই প্রেম কখনও লৌকিক, কখনও রাধাকৃষ্ণের নামে অলৌকিক। খেমটি নৃত্য-

ব্যবসায়িনীর জীবনে যতই গ্লানি থাকুক না, কেন তাদের গানের মধ্যে থাকে এক অতীন্দ্রিয় প্রেমমাধুর্য এবং সরলতা যা সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। দু' একটি গানে এর পরিচয় মেলে :

২। সন্ধ্যে শালুকের ফুল ফুটে আঁধার রাতে,
যার সনে যার ভাব থাকে মরিলে কি ছুটে ;
বন্ধু, এত রাগ তোর কিসে॥
এস, এস, এস, বন্ধু, বস পালঙ্কিতে,
পা ধুয়াইব নয়নজলে পুছাইব কেশে বন্ধু, এত রাগ কিসে॥
যতি বড্ড হারাম জাত—তার সঙ্গে করেছ ভাব গো॥
শেষে ধনি তুই পুছিবি নয়ন জল গো॥
তুই, ধনি, বড় দাগাবাজ লো॥
খাওয়া দাওয়া দিয়ে বাদ করেছি তোর কাজ গো,
তুই, ধনি, বড় দাগাবাজ, তোর জন্য ছেড়েছি ঘরের কাজ লো।
তুই, ধনি, বড় দাগাবাজ॥
তুই ধনি লোয়া জাঙ্গের মাছ গো।
সরল দেখে করলেম প্রেম আগে না ভাবি এত,
অবলাকে কাঁদায়ে সহে না অন্তরে, বন্ধু, কি বলিব তোরে।
তুই, ধনি, বড দাগাবাজ॥'

৩। জ্বালিয়া মোমের বাতি, অকারণে গেল রাতি,
গাঁথিয়া বাসকি ফুলের মালা,
সখী, আমার রহিল বাঁশী
তোমার ঐ পীরিতি আজি হইল বাজে।
হায় রে দারুণ বিধি, শাশুড়ী হয়েছে বাদী,
ঘরে আছে ননদিনী আমার বিচ্ছেদের পালা,
আমার প্রাণে সহে না দারুণ শাশুড়ীর গঞ্জনা।
শাশুড়ীর চার বেটা ঘরে ঘরে লাগায় ল্যাঠা,
হেন স্বামীর ঘরে সুখ তো হল না।
আমার প্রাণে সহে না॥

৪। শ্যামের বাঁশীটিকে আমি, কেড়ে নেব জনমকে।
যখন, কানাই, বাজাও বাঁশী তখন গৃহে রান্দি বসি,

শাশুড়ী ননদের ঘরে আমি না রহিতে পারি ফাঁকে।
যখন আমি সহি গো জলে, শ্যামের দেখা কদম তলে,
কত ছলে ডাকে আমার নাম কে,
আমি কেড়ে নেব বাঁশীটা জনমকে।

কেবল প্রেমই নয় বাঁশপাহাড়ীর খেমটি গানে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অনেক কথাই প্রতিধ্বনিত। দ্বিতীয় গানটিতে একদিকে নায়িকার বিরহ-বেদনা যেমন প্রজ্জ্বলিত, সেখানে মোমের বাতি জ্বেলে নায়িকার অকারণ রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে, গাঁথা ফুলের মালা বাসি হয়েছে—অপরদিকে ঘরে শাশুড়ী বাদী, শাশুড়ীর গঞ্জনা, ননদিনীর যাতনা—নায়িকার অন্তর আর্তনাদে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে।

কেবল প্রেমই নয়, প্রেমের উচ্চ আধ্যাত্মিকতাই নয়, সহজ বাস্তব চাহিদাও নায়িকাকে আকাংক্ষিত তুলেছে। তাই আনারকলি শাড়ী, লাল রংয়ের ব্লাউজ, হিমানী, পাউডার, কানের মাকড়ি সমস্তই নায়িকার প্রার্থিত তালিকারূপে গানে উপস্থিত হয়েছে। এ ধরণের কয়েকটি গান বাঁশপাহাড়ীতে সংগৃহীত হয়েছে :

১। আয়না লিব, চিরুণী লিব, নারকোলোর তিলকা লিব,
পিং দিয়ে মাথা বাঁধব, কারো বারণ শুনব না।
দেশে উঠেছে গয়না, আমি কুলেতে রইব না॥
আনারকলি শাড়ী লিব, বেনারসী শাড়ী লিব,
লাল রং এর বেলাউজ লিব, লাল বই অন্য লিব না,
দেশে উঠেছে গয়না, আমি কুলেতে রইব না।

২। মনের কথা বলব তোমারে।
বাজার হতে চেন মাকুড়ি এনে দেবে মোরে,
ভালবাসব তোমারে।
হাতে শাঁখা পায়ে তোড়া আধুলী মোহরী,
আরও যদি দাও হে মোরে বিছা কোমরে,
ভালবাসব তোমারে।
শিলিক শাড়ী, ফরিদ শাড়ী, উঠেছে বাজারে—

নতুন ছিট উঠেছে বেলাউজের তরে.
দুটাকা লাগবে মোরে হিমানী পাউডারে,
আরও যদি দাও হে ফুলান তেলের তরে ॥
পায়ে জুতা মাথায় ছাতা উরয়ালের তরে।
দশ আনা লাগবে মোরে পিন কাঁটা ডোরে ॥

৩। কি যুগের শাড়ী উঠেছে, উঠেছে বাজারে,
সায়া শাড়ী কিনে দাও, শ্যাম, পরিব পরবে
ভালবাসিব তোমারে।
রঙিন রঙিন ছিট ব্লাউজের তরে, হে শ্যাম, ব্লাউজের তরে,
আরো লিব পাঁচ টাকা, হে শ্যাম—
হিমানী পাউডারে, হে শ্যাম, হিমানী পাউডারে।
আরো লিব পাঁচ সিকা সানলাইট সাবানে।

৪। বিয়ে হবো বিয়ে হবো পাত্র খুঁজেছি।
বিয়ে যদি করবে আমায় জাতের খবর কি।
আগে ছিল ময়রা মুচি এবার আমি বামুন হয়েছি,
বিয়ে হবো বিয়ে হবো পাত্র খুঁজেছি।
জমি জমার খবর কি ॥
জমি জায়গা বিক্রি করে কেবল আছে মহিষ জোড়াটি,
বিয়ে হবো বিয়ে হবো
বিয়ে যদি করবি আমায় লেখাপড়ার খবর কি,
লেখা ভুলেছি আমি, কেবল আছে দেয়াত কলমটি,
বিয়ে হবো বিয়ে হবো খাবার দাবার কি,
ঢেকিশালের পাটরা কুড়া সিদ্ধ করেছি ॥

তবু খেমটি গানের মূল কথাই হচ্ছে প্রেম। যে প্রেমে শ্রীরাধা ঘরে:থাকতে পারেন না, পাড়ার লোকের বহু নিন্দা সহ্য করে নিঠুর কালিয়ার নিঠুরতায় নায়িকার মন বেদনায় আপ্লুত হয়। বাঁশপাহাড়ীর নায়িকার মনে অকারণ পুলক, অকারণ বেদনা। তাই খেমটি গানে আর.যাই থাক আছে নায়িকা মনের নিরুচ্চার বেদনা। এই ধরণের কয়েকটি গান বাঁশপাহাড়ীতে সংগৃহীত হয়েছে ঃ

১। আমারো পিরিতি দেখি সইতে নারে পাড়ার লোকে,
যে যা বলে বলুক লোকে, আমি ছাড়বো না তোমারে।
তুমি ভুইল না আমারে, আমি ভুলি না তোমারে।
তোমার ঐ অঙ্গ হেরি, আমার এই অঙ্গ ধরি
ঐ ভাবনায় আর কত দিন
তোমার ঐ ভাবনা বইবো কত দিন।
দেখ আধা দিনে হে না যাই'ও পাসরি।
তুমি ভুইলো না আমারে, আমি ভুলি না তোমারে।

২। সরল দেখে প্রেম করিলে
এত কেন নিঠুর হোলে ॥
আমি মরি তোমার তরে।
বঁধু, আমায় ফিরে চাও না ॥
অবলারে দুঃখ দিয়ে
কখনই ভালো হয় না ॥
অবলারে শেল দিয়া।
কখনই ভালো হয় না ॥
হেসে হেসে কইতে কথা।
বসতে আস্তে আমার হেথা ॥
দিবানিশি করছে আনাগোনা।
আমার হতে কোন রমণী।
তোমায় ছেড়ে দেবে না ॥
সারদা সিংহেতে কয়।
যখন ফুলে মধু রয়,
মধু ছাড়া ভ্রমর কোথাও রয় না ॥
আজ ডাল ভ্যাঙ্গে ফুল শুকাই গেল,
ভ্রমর তো আর ফিরে চায় না ॥

রুক্ষ দুর্দম রাঢ়ের প্রকৃতি। অনুর্বর অজলা-অফলা এদের প্রান্তর। তবু এই কঠিন কংকরময় প্রান্তর বিদীর্ণ কোরে পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের অধিবাসীবৃন্দ চেষ্টা করে বন্ধ্যা মাটিকে শস্যশ্যামলা করে তুলতে।

আকালে দুর্দান্ত খরা এদের নিবারণ করতে হয় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। তাই এদেশের এক একটি অন্নকণা এক এক ফোঁটা ঘর্মবিন্দুর ফসল। তাই বুঝি এ'অঞ্চলের ধান কিছু মোটা, চাল কিছু নোনা। এই ঘর্মে রোয়া ধানে সীমান্ত বাংলার মাঠগুলি যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায়, রুক্ষ গৈরিক প্রান্তর জুড়ে কেবল যখন পাকা ধান, আর পাকা ধান, যখন হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান তখন আনন্দের বান ডাকে এঅঞ্চলের মানুষের মনে। কিসকু যুবতী মনের আনন্দে গান গেয়ে ওঠে, সহিস যুবক বা কালিন্দী গৃহবধূ গানে গানে ভরিয়ে তোলে রাঢ়ের এই পল্লী প্রান্তর। ঘরে ঘরে তখন নবান্ন পিঠাপার্বণ-এর উৎসব। এরই সঙ্গে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার প্রতিটি প্রান্তর জুড়ে শুরু হয় টুসু পরব বা তুষ-তুষলী ব্রত। এটি পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের শস্যোৎসব। কোন কোন অঞ্চলে পৌষ মাসের প্রথম থেকে শুরু করে মাঘ মাস পর্যন্ত এই উৎসব চলে। আবার অন্য অঞ্চলে অগ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত এই উৎসব চলে। সেখানে গান হয় টুসুর আগমনী :

টুসু গান

১। বাগান দিয়ে ঢোল বাজিছে টুসু নাকি আসিছে
বাইরাও না গো, রঙ্গদেবী, সিংহাসন সাজিছে।
টুসু নাকি ডুবিল গো জলে—
টুসুকে ছাঁকিবো গো মাহা জলে।
টুসু নাকি ডুবিল গো জলে॥

বাগানে ঢোলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে টুসুর অধিবাস হচ্ছে। গত বৎসর যে টুসুকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই টুসুকেই আবার ছেঁকে জল থেকে তুলে নেওয়া হবে। এ টুসুর রূপ কেমন :

২। অচিরে পাচীরে পদ্ম, লাল পদ্ম বই ফুটে না,
টুসুর হাতে জোড়া পদ্ম, ভোমরা বই বসে না।
ভোমরা এল মাতা যাতা রসিক বলে ফুল পাতা,
এমন দেখে ফুল পাতালি চলে গেলি কলকাতা।
বলে টুসু মনি, তোকে কে দিল গো দুয়ানি ,

কাঁচি কাটা ডবল পয়সা জলে দিলে হয় দুটা,
এমন দেখে ভাব করলি ধরলি শালুক ফুল ফোটা।

একে টুসুর রূপের সীমা নাই তারপর আবার বিষ্ণুপুরী হলুদ এনে টুসুর গা আলো করে দেওয়া হবে। আর তাকে সাজান হবে শ্রেষ্ঠ জিনিষ দিয়ে। কারণ টুসু যে সাগর ছেঁচা মাণিক ঃ

৩। এমন মাথা বাঁধব পরিপাটি তাতে দিব বেল কুঁড়ি,
বোম্বাইতে পার্শ্বেলেতে আনব যুগল চুড়ি।
মন বাঁধা দিয়ে সই, আমি বিদায় হই ॥
কটকে গড়াব গয়না ঢাকাতে চট করাব,
কোলকাতাতে রঙ করায়ে—টুসুধনকে সাজাবো।
মন বাঁধা দিয়ে সই, আমি বিদায় হই ॥
দিল্লী হতে আনব লাড়ু বারাণসীর হালুয়া,
বর্ধমানের মিহিদানা বাগবাজারের পান্তুয়া।
মন বাঁধা দিয়ে সই, আমি বিদায় হই ॥

৪। আমার টুসু কাশী যাবে সঙ্গে চাকর ছয় জনা
কালী মাটি দিয়ে ফিরবে দেখে টাটার কারখানা।
কালপুরে তামা গলাই মাটি গড়ায় আমদানী
বন ছিল নগর বসাল কেপ্ কল আর কোম্পানী।
মন বাঁধা দিয়ে সই, আমি বিদায় হই।
মইলিশালের চিঁড়ে বৈদ্যনাথের বসা দই
বলেছিলে সই পাতাব রাজার ছেলে আইল কই।
মন বাঁধা দিয়ে সই, আমি বিদায় হই।

এই টুসুর রূপ নিয়ে চলে প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, তাই একদল আর একদলের টুসুকে লক্ষ্য করে বলে ঃ

৫। তোমার টুসু যতই সাজাও চোখগুলি পিঁয়াজ ভাজা,
তোমরা যতই সাজাও।
আলি বলে তাই দেখা হলো
তোমার কাপড়ের পাড় ভাল।
তোমাদের পাড়ায় যায় না গো সই,
তোমাদের ডোমরা চোখে কাজল কই ॥

প্রতিবেশীর টুসুকে যতই সাজান হোক না কেন তার চোখ দুটি পেঁয়াজ ভাজা, শুধু তাই নয়, প্রতিবেশীর টুসুর খাঁদা নাকে নোলক মানায় না। তাই তারা গান গেয়ে ওঠে ঃ

৫। আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝম্‌ঝম্‌ করে গো,
তোদের টুসু ছোঁচরা মাগী আঁচল পেতে মাগে গো,
ছি ছি লাজ লাগে না তোদের খাঁদা নাকে,
নুলুক দোলা সাজে না।

বাঁশপাহাড়ীর টুসু গানগুলি যেন নারীজীবনের কামনা-বাসনার সুরভারতী। কুমারী, বিবাহিত নারীজীবনের দর্পণ। তাই দেখা যায় টুসুর বিয়ের অনুরোধ করা হচ্ছে টুসুব মাকে। কারণটা আর কিছুই নয় টুসুর ছেলে হলে নাতি কোলে নিতে পারবে, আর এ প্রলোভন ত কম নয়। তাই গান শুরু হয় ঃ

৬। টুসুর মাগো, টুসুর মাগো, টুসুর বিয়া দাও এসে,
আইবুড়োতে জাঁতি হাতে লাতি কোলে লাও এসে।
লাতি বলে হাতি লিব ; কোথায় হাতি পাব গো,
ওই যে আসছে রাজার বেটা জোড়া হাতি লিব গো।
আসুক আসুক রাজার ব্যাটা বসুক সিংহাসনে গো ;
চরণ দুটি ধুয়ে দিব কালো মেঘের জলে গো ॥
কালো করে ঝিকিমিকি পদ্ম করে আলো গো,
হোক না আমার কালো জামাই বাঁশি বাজায় ভালো গো।

গানটির চিত্রকল্প রচনা অনুপম। রাজার ছেলে জোড়া হাতি করে এসেছে, বসেছে সিংহাসনে, তার পা দু'টি কালো মেঘের জলে ধুইয়ে দেওয়া হয়েছে। কালো জামাই-এর পাশে রাজপুত্র যেন বিদ্যুতের মত ঝিকঝিক করতে থাকে। সর্বশেষে গায়ক-গায়িকা টুসুর মাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে জামাই আমাদের কালো হলে কি হবে সে ভাল বাঁশ বাজায়।

টুসু গান মূলতঃ বেদনার গীত। বিচ্ছেদ আর আর্তিতে তা ভরপুর। এ যেন বাংলার লৌকিক বিজয়া-সঙ্গীত। ছোটবেলায়

বিয়ে হয়েছে, পর দেশে শ্বশুরবাড়ীতে হয়েছে নির্বাসন মায়ের জন্যে আজ তার মন কেমন করে :

৭। মাগো মাগো, বিয়া দিলে বড় নদীর সে পারে,
এতো বড়ো পৌষ পরবে রাখলি, মা পরের ঘরে।
মাগো, আমার মন কেমন করে।
যেমন তাতা কড়ায় খই ফোটে ॥
মায়ে দিল মাথা বেঁধে, মাসী দিল ফুল গুঁজে,
বিদায় দে মা সংসারের কাজে,
আমি থাকব না, মা তোর ঘরে।

এখানকার চিত্রকল্পটিও অনুপম। কন্যার মায়ের জন্য মন উথালি-পাথালি করছে, কেমন, না যেমন তপ্ত কড়ায় খই লাফায় ঠিক তেমনি, এ বেদনা যে একান্ত অন্তরের সে কথাটি বুঝতে বিলম্ব হয় না। পরের দুটি গানও এরই প্রকাশ :

৮। এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে
মাগো আমার মন কেমন করে।
পরের মা কি বেদন জানে অন্তরে জ্বালায়ে মারে—
উপর পাড়ার টুসু তুমি, নামো পাড়ায় যেয়ো না,
মাঝ কুলিতে সতীন আছে, পান দিলে পান খেও না।

কিংবা :

৯। মাথা ঘসে রইলাম বসে আর আমাদের কে আছে—
মা বাপ আছে দূর দেশে প্রাণ জুড়াবো কার কাছে।
বল গো আমার মা কোথায় আছে,
আমি প্রাণ জুড়াবো কার কাছে।
ধিকি ধিকি প্রাণ কেঁদে ওঠে,
বল গো আমার মা কোথায় আছে।

প্রথম গানটিতে সতীনের উল্লেখ আছে। একদিন সতীনের জ্বালা বাংলাদেশের নারীকে কিভাবে ব্যাকুল করে ছিলো তার পরিচয় আছে বাঁশপাহাড়ীতে প্রাপ্ত বহু টুসু গানে। সতীনের উপর হিংসা আর বিদ্বেষের জ্বালা যে কত দূর তীব্র হতে পারে তার পরিচয় আছে নিম্নলিখিত একটি গানে :

১০। এক গাড়ী কাঠ, দু গাড়ী কাঠ, কাঠে আগুন লাগাবো
যখন আগুন হুদ হুদাবে সতীনকে ঠেলে দিব।
সতীন আমার জনমের বাদী।
সাঁকা পরাবো লো আদাবাদী
সতীন আমার জনমের বাদী।

দাদা বউকে বেশী ভালবাসে বলে বাংলাদেশের শাশুড়ী-ননদের তা সহ্য হয় না। তাই যদি দাদা বউ-এর জন্যে দশ টাকা দামের শাড়ি এবং কানফুল কিনে দেয় তা হলে আর রক্ষা নেই। একটি গানে বাংলাদেশের নারী সমাজের সেই মনস্তাত্ত্বিক পরিচয়:

১১। ও বউ রাগ কেনে, দাদা দিবে আজ শাড়ী কিনে,
বড় দাদা বাক্স খুলে আনছে গো টাকা গুনে,
টাওনায় আছে ফর্দি শাড়ী, তোমায় দিবে আজ কিনে।
বছর দিনের বড় পরব, দাদার আছে গো সবই মনে,
দশ টাকা দামের শাড়ি লিলি, কান ফুল দিলি কই কানে॥
আসছে বছর কান ফুল লিবি, টাকা রাখবি গোপনে,
শাউড়ি-ননদ জানতে পারলে, গাল দেবে তোরে দুই জনে॥

টুসুগানে সমাজ জীবনের কথাই হোক, আর নারীজীবনের কামনা-বাসনার কথাই প্রকাশ পাক না কেন, আসল যে সুরটি বারে বারে, টুসু গানে ফিরে ফিরে এসেছে সেটি হচ্ছে প্রেম। প্রেমই বাংলার লোক-সঙ্গীতের আদি-গঙ্গা-হরিদ্বার। যার থেকে উৎস শত শত লোক-সঙ্গীতের। বাঁশপাহাড়ীর টুসু গানেও সেই চিরন্তন প্রেমের নানা রহস্য, বিবিধ বিরহ-বেদনার কথা। বিরহ-ই প্রেমকে মধুরতর করে তোলে। এরকম কয়েকটি প্রেমমূলক টুসু গান পাওয়া গেছে বাঁশপাহাড়ীতে:

১২। শুন ওহে শ্যামধন, আর যদি না দিয়াছ মন,
যেদিন হতে প্রেমের হাটে গেছি,
বঁধু হে, আমাতে কি আর আমি আছি।
কিবা যারে দিয়ে মন পেয়েছি পিরিতি ধন,
কুলমান সকলি সঁপেছি।

বঁধু হে, তোমাতে কি আর আমি আছি।
যেদিন হৈতে মন হইল আপন
দিনু কয় দায়ে পড়েছি,
বঁধু হে, তোমাতে কি আর আমি আছি।

১৩। যমুনার জল আনিতে যেয়ে,
বড় ভয় লাগে বন্ধু বড় ভয় লাগে।
কি জানি কেউ আছে ঘাটে,
চমকি লাগিল আমার যৌবন বয়সে,
যৌবন বয়সে, আমার যৌবন বয়সে॥
কি জানি তোর কুল গো যাবে আমি যাই।
জানি ও তোর অল্প বয়সে অল্প বয়সে।
আমার অল্প বয়সে কি জানি কেউ আছে ঘাটে।
চমক লাগলি আমার যৌবন বয়সে॥

১৪। যমুনার জল আনিতে যায়ে শ্যামের সনে
দেখা বন্ধু, শ্যামের সনে দেখা।
আজ বলিব, কাল বলিব, পরশু দিব কথা, বন্ধু,
আজ কেন মন গঁসা, বন্ধু আজ কেন মন গঁসা।
রাস্তার মাঝে দাঁড়াই একা বলিব,
দুঃখের কথা বন্ধু বলিব দুঃখের কথা।
সরোবরয় কুল শুকাইল পদ্মপাতের ছায়া,
রাস্তার মাঝে দাঁড়াই একা বলিব দুঃখের কথা বন্ধু,
আজ কেন মন গঁসা।
হেন জয় চাঁদ বাউল বলে, কেন এমন দশা,
বন্ধু কেন এমন দশা।
রাস্তার মাঝে দাঁড়াই একা বলিব দুঃখের কথা।

তারপর আসে টুসুর বিদায় মুহূর্ত। এতদিন ধরে বাঁশপাহাড়ীর নারী টুসুকে উপলক্ষ্য করে বলেছে তাদের নারী জীবনের সমস্ত কামনা-বাসনার কথা, উজাড় করে দিয়েছে তাদের সব সুখ দুঃখের কথা। আজ তাই টুসুর বিদায় দিনে বাঁশপাহাড়ীর নারীকুল অশ্রু-সজল বেদনায় আকুল। টুসুর বিজয়া গানে তাই বেদনার আর্তি :

১৫। তিরিশটি দিন ছিলে, টুসু, তিরিশটি ফুল নিয়ে গো।
আর রাখতে নারি মাকে মকর হৈল বাদী গো ॥
এতদিন যে ছিলে টুসু, মা বলে কভু ডাকলে না।
যাবার বেলা রগড় হৈল মাকে ছাড়া যাব না ॥

ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলের শাল আর মহুয়া বনের আনাচে-কানাচে আদিবাসীর কুটির যখন বর্ষা উৎসব ও 'করম' গানে মুখর হয়ে ওঠে তখন পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের ঘরে ঘরে দেখা দেয় ভাদু উৎসব ও ভাদু গান। বাঁকুড়া মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার কিয়দংশে এই উৎসব ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অনেকে বলেন ভাদু উৎসব করম উৎসবেরই একটি হিন্দুসংস্করণ মাত্র। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে: 'আদিবাসীর করম উৎসব বর্ষা উৎসব, ভাদু উৎসব বর্ষা উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। বর্ষা বা ভরা ভাদ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদু উৎসব, ইহার গান ভাদু গান। ['বাংলার লোক-সাহিত্য' (১ম খণ্ড) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃ. ১৪২] ভাদু গান পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার নিজস্ব আঞ্চলিক সঙ্গীত। সারা ভাদ্রমাস জুড়ে চলে এই সঙ্গীত। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার শাল-মহুয়া-করম গাছের ডাল যখন সবুজ হয়ে ওঠে, মাটি বর্ষার জলে নরম হয়, মাঠের ধানগুলি অল্প অল্প পেকে যায়, যখন রোদের আলো পড়ে মাঠের পাকা ধানগুলি কাঁচা সোনার মত দেখায় তখনই বেজে ওঠে ভাদুর আগমনী গীত:

ভাদু গান

১। ভাদুর আগমনে
কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে
ভাদু আজকে এলো ঘরে গো, এলো গো শুভদিনে।
মোরা সাজি ভর্তি ফুল তুলেছি গো যত সব সঙ্গিগণে ॥

ভাদুর আগমনে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার ঘরবাড়ী আনন্দে মেতে ওঠে সঙ্গিগণের সঙ্গে সাজি ভর্তি ফুল তোলে, কারণ শুভদিনে ভাদুর

আগমনে তারা ফুলসাজে ভাদুকে সজ্জিত করবে। শুধু তাই নয় আরও কত তাদের আকাঙ্ক্ষা ঃ

২। মোরা সারা রাতি করব পুজা গো ফুল দিব গো চরণে
আনব সন্দেশ থালা থালা খাওয়াব ভাদুধনে ॥

তারপর ভাদুধন আসে। শুরু হয় তার রূপে মহিমা কীর্তন। কার ভাদু কত সুন্দর এ নিয়ে চলে সাথীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা; তাই গান হয় ঃ

৩। ভাইরে মনে মনে—
আমার ভাদুর রূপ দেখে জ্বলিস কেনে
আমার ভাদুর রূপটি তোদের লো
চোখে বল্ সইবে কেনে।

প্রতিবেশীর রূপ দেখে সঙ্গিগণের বড় হিংসে, তারা ভাদুর রূপ দেখে মনে মনে জ্বলে ওঠে তাদের চোখে সহ্য হয় না আমার ভাদুমণির আলো করা রূপ, তাই আবার বলে ঃ

৪। সূর্যের আলো দেখলে পেঁচা লুকায় গিয়ে ঘোর বনে,
তেমনি তোরা ভাদুধনে লো দেখতে নারলি নয়নে ॥
তোদের ভাদু আমার ভাদু তফাৎ লো রাতে দিনে—
আমার ভাদু স্বরগ শোভা, তোদের পাতাল ভুবনে ॥
সত্য মিথ্যা দেখ না চেয়ে চোখ থাকিতে অন্ধ কেনে,
তোদের ভাদু অনামুখী লো ভেবে দেখ মনে মনে।

আমার ভাদুর রূপের সে কি ঘটা। হলুদ মাখার তার প্রয়োজন নাই, কারণ আমার ভাদুর গায়ের রঙ হলুদের চেয়েও উজ্জ্বল। তাই গান হয় ঃ

৫। হলুদবনে ছিলা ভাদু গো
হলুদ কেন মাখ না
শাশুড়ী ননদ বলে
হলুদ মাখা সাজে না।

ভাদুর সাজের এক বিচিত্র বর্ণনা আর সমারোহ।

৬। ভাদু তোর লেগে রোদন করে—রাজা যমুনার তীরে,
কি কি গয়না লিবি ভাদু বলা না আমারে।

আমি পায়ে লিব তোড়া সাজাবো বাহারে,
কি কি শাড়ী লিবি ভাদু বলা আমারে।
আমি সবুজ পেড়া শাড়ী লেবো সাজাবো বাহারে,
আরও কি গয়না লিবি রে ভাদু বলনা আমারে।
নাকে লোবো নথের টানা সাজবো বাহারে।
ভাদু তোর লেগে রোদন করে রাজা যমুনার তীরে ॥

তারপর বহু বিচিত্র কামনা-বাসনার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে রচিত অসংখ্য ভাদু গান। শেষ হয় ভাদ্র মাসে। বেজে ওঠে বিদায় সঙ্গীত :

৭। ভাদু বিধুমুখী
এস এস হৃদয় ধরে রাখি,
বিদায় কথা শুনে তোমার গো অবিরাম ঝরে আঁখি,
যেও না লো বিনয় করি তোমাদের ফাঁকি।
তুমি মোদের প্রাণের আধার গো
তোমায় অধিক বলবো কি,
এলে বছর পরে থাক দু'দিন আমাদের করে সুখী।

কিন্তু যেতেই ত হবে। ধবে কাউকে রাখা যায় না। তাই পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের নরনারী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাদুকে বিদায় দিতে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। নরনারীর হৃদয় কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারই সজল প্রতিধ্বনি শোনা যায় শালবনের মর্মর ধ্বনির মধ্যে।



ষষ্ঠ পর্ব

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের ধাঁধা

॥ **সূচনা** ॥ সীমান্তবঙ্গের লালমাটির এই রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তরে গড়ে উঠেছে বাংলার লোক-সংস্কৃতির এক বিরাট সম্পদ। কোন সুদূর অতীত থেকে কিভাবে জন্ম পরিগ্রহ করে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে যে এই লোক সংস্কৃতির বিরাট ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই সীমান্ত সংস্কৃতির ধর্মটি হচ্ছে একান্তভাবে লৌকিক। একদিকে তা বৈষ্ণবীয়তায়, পৌরাণিক দেবদেবীর আহ্বানে উৎসব মুখর, অন্যদিকে তাই-ই আবার বৃক্ষপূজায়, সূর্যের আদিম বন্দনায় অথবা ধরিত্রীস্তুতিতে ব্যস্ত। এরই মাঝখানে আছে নানা অপদেবতায় বিশ্বাস, ভূত-প্রেত, দানা-দৈত্য ডান-ডাইনীর প্রতি নানা অলৌকিক অতিবিশ্বাস। তারপর আরও আছে কুসংস্কার ও সংস্কারাছন্ন আচার রীতি-নীতি। তাই এদের দেবপূজার প্রথম পর্বে প্রাচীন বৃক্ষমূলে দেবতার থান, কখনও তা বড়াম, কখনও ভিরকুনাথ, কখনও বা খুটামূল, কখনও তাই-ই কালভৈরব। দ্বিতীয়পর্বে আছে বুড়ো শিবের গাজন, পাটপূজা এবং ভাদু-মনসা-ধর্ম ইত্যাদির মূর্তি পূজা। তৃতীয় পর্বে এরা হয়ত কেউ বৈষ্ণব, গলায় কণ্ঠী ধারণ করে, কীর্তন অথবা ঝুমুরগানে মূর্তিমান বৈষ্ণব। অপদেবতার অপযশকে প্রার্থনার মধ্যে স্তুতিতে পরিণত করে বৃক্ষমূলে পূজা করেছে ব্রহ্মদৈত্যকে। এরা বিশ্বাস করে অরণ্যের সমস্ত বৃক্ষেই আছে নানা অপদেবতা, তারা রুষ্ট হলে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, শস্যে মড়ক লাগে, নারী মৃত সন্তান প্রসব করে। তাই নানা গাছের কোটরে, পাহাড়ের গুহায়, নদীর তীরে তীরে, গ্রামের কুটিরের আনাচে কানাচে, গোলা-ঘরে ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানোর বাস বলে এরা সদাসতর্ক তাদের তুষ্টি বিধানে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অপদেবতাই দেবতার স্থান অধিকার করে নিয়েছে ওদের মনে। শুধু ধর্মে বা বিশ্বাসেই নয়,

এই লৌকিক সংস্কারের চিহ্ন আছে এদের লোকগীতিতে, লোককথায় ও নানা পরব অনুষ্ঠানে, এখানকার মানুষের কাছে সংগীতই প্রাণমন্ত্র। দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে এরা গান গায়। তাই অরণ্য-ভূমির প্রান্তরের ছোট ছোট কুটিরে, সুবর্ণরেখা, শিলাবতী, কংসাবতী দারকেশ্বর দামোদরের তীরে তীরে অসংখ্য মানুষের আবাসমূলে শোনা যায় করম ভাদু, টুসু, ঝুমুর, জাওয়া, পাতানাচের গান, চড়ক, গাজন, করম, ভাদু, টুসু ইত্যাদি নানা লৌকিক পর্ব-পার্বণ আর রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথার অজস্র সম্ভার। বন্ধ্যা মাটি, শুষ্ক মরু তবু দেখি প্রাণের জোয়ার। সীমান্ত-বঙ্গে এই অজানা প্রান্তরে যেমন সবুজ, গাঢ় সবুজ কচি শালের অজস্র সমারোহ, সেই শালের বনে যখন ফুল ফুটে, মহুয়ার গন্ধে বনস্থলী কখন আমোদিত হয়, যখন ফাগুণের ক্ষণে পলাশের বনে রক্তরাগে হোলী শুরু হয়, বনজ ক্ষেত্র যখন দোয়েল, শ্যামা, বুলবুল, টিয়া, ফিঙের সংগীতে মুখরিত হয়ে ওঠে যখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহের পর শুষ্ক অরণ্যে দাবানলের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সীমান্ত-বঙ্গের এই প্রান্তর রক্তবর্ণ রূপ ধারণ করে, বনস্থলীর প্রান্ত থেকে উৎসব মাতাল মহুয়ার রসে ভরপুর আদিম নর-নারীর নৃত্যগীতের সঙ্গে যখন মাদলের দ্রিম্ দ্রিম্ রব আর ধামসার গুরু গুরু ধ্বনি শোনা যায় তখন সীমান্ত-বঙ্গে লৌকিক সংস্কৃতির বিচিত্র ও আদিমতর উৎসটি বনজ প্রান্তরের পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই লৌকিক সংস্কৃতি পরিপুষ্ট কয়েকটি গ্রাম হাতিবাড়ী, কুইলাপাল, ডোমজুড়ি, দহমুণ্ডা ; এই গ্রামগুলি থেকে সংগৃহীত কিছু ধাঁধার তুলনামূলক আলোচনা করে এই গ্রামগুলির লোক-সাহিত্যের অন্যান্য উপকরণের মত কিভাবে ধাঁধার দ্বারাও সমৃদ্ধ তার প্রমাণ উপস্থিত করা হবে। সুবর্ণরেখা—দ্বারকেশ্বর নদীর তীরবর্তী এই গ্রামগুলিতে ছোট ছোট বালক থেকে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রত্যেকেই তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ জ্ঞানকে নানা সূক্ষ্ম রূপক ও ভাষার রহস্য দ্বারা লুক্কায়িত করে ধাঁধা তৈরি করেছে এবং

পারস্পরিক আনন্দ, বুদ্ধিচর্চা ও জ্ঞানপরীক্ষার কাজে ব্যবহার করেছে। কোন ক্ষেত্রে ধাঁধাগুলি নিছক কৌতুকময়, কোন ক্ষেত্রে তা রহস্যময়, কোন ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানব জীবনের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কখনও মানুষের কাজে লাগানো হয়েছে, কখনও বা তা আনন্দ বর্ধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল তাই-ই নয়। এই অঞ্চলের লৌকিক সাহিত্যিক মন কোন কোন ক্ষেত্রে রচনা করেছে নানা সাহিত্যিক ধাঁধা তাই এ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধরণের পৌরাণিক আখ্যানমূলক, গাণিতিক সংখ্যামূলক এবং আচারগত বিচিত্র শ্রেণীর ধাঁধা। রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে নানা পৌরাণিক কাহিনী, গৃহ ও গৃহস্থালীর বিচিত্র উপকরণাদি, প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়। কৃষি ও সমাজতান্ত্রিক নানা বিষয়াবলী ভিড় করেছে সীমান্ত অঞ্চলের এই গ্রামগুলিতে। দহমুণ্ডাই হোক আর কুইলাপালই হোক যেমন মানুষের কুটিরদ্বারে উপস্থিত হওয়া গেছে তখনই অতিথি সংকারের সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধার উৎসমুখ তারা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ডোমজুড়ির স্বপনকুমার পাত্র, ভীমচন্দ্র সাউ, কার্তিকচন্দ্র দণ্ডপাঠ, দহমুণ্ডার রামেশ্বর ভুঁইয়া প্রভৃতি সরল গ্রামবাসীর দল। গানে, রূপকথায়, ধাঁধায়, অথবা হাস্য-পরিহাসে জমিয়ে তুলেছে তাদের চণ্ডীমণ্ডপ, গৃহপ্রাঙ্গণ,……ও বটবৃক্ষের নীচে ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তর।

॥ এক : ধাঁধার উৎস পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ॥

ধাঁধা সম্পর্কে বলতে গিয়ে C. F. Potter বলেছেন, Folklore is the lore of learning on common sense or mother wit of the people as passed down from parent or grandparent to child on grandchild, and that folk-knowledge must be packaged and capsuled for easier transmission down :through the generations. That is where proverb and especially the riddle come in.

[S. D. F. L. Page 939 vol. II] অর্থাৎ লোকশ্রুতি হচ্ছে এমন জ্ঞান বা সাধারণ ধারণা বা বংশ পরম্পরাক্রমে পিতা বা পিতামহের মধ্য দিয়ে শিশু বা দৌহিত্রদের মধ্য দিয়ে সংবর্দ্ধিত বা সংযুক্ত হয়ে বহু বংশধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর মধ্যে প্রবাদ-প্রবচন বিশেষ করে ধাঁধার অবস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয়। এর আবির্ভাব এবং অবস্থিতি প্রসঙ্গে তাই Maurice Bloomfield আরও বলেছেন—From older times, as an early exercise of the primitive mind in its adjustment to the world about it, comes the riddle······The fesher the vision, when the world was young, so much keener was the interest in the phenomena of nature, in the phenomena of life, and in the simple institution which surrounded man. All harmonies and fitness, all discrepancies and inconsistencies attract the notice of children and children like man. [ibid, Page 939]। এই প্রকৃতির রহস্যময়তা, ছন্দবদ্ধতা, পরিপূর্ণতা আদিম নরনারীর শিশু মনকে আকৃষ্ট করত। মনে নানা প্রশ্ন জাগতো। সেই প্রশ্নই পরে সৃষ্টি করেছে এই ধাঁধার। প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যময় বস্তুর মধ্যে যে সকল বিশেষত্ব তাদের নজরে পড়তো তাই তারা ছন্দের মাধ্যমে, প্রশ্নের আকারে তুলে ধরেছে অপর একজনের সামনে। ফলে একদিকে যেমন নিজেদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হয়েছে, অপরদিকে তেমনি অপরের বুদ্ধিমত্তার যাচাইও সম্ভবপর হয়েছে। সৃষ্টির বিচিত্র রহস্য আদিম মানবের মনে বিস্ময়, কৌতুক ও কৌতূহল—জিজ্ঞাসা এনে আবির্ভাব ঘটিয়েছে ধাঁধার। আকাশের চাঁদ, সূর্য তারা, মানুষের মনে চিরকালই বিরাট বিস্ময়। অনেক জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে মানুষের মনে অনাদিকাল ধরে। তাই যখন ধাঁধায় বলা হয়ঃ

১। আকাশ গুড় গুড় পাথর ঘাটা,
সাত শত ডালে দুটি পাতা।

তখন প্রকৃতির বিস্ময় মানুষের মনে কি ধরণের কাব্য সৃষ্টি করেছে তা বিশ্লেষণ করলে বিস্মিত হতে হয়। আকাশের মেঘগর্জন, মেঘঘর্ষণে বিদ্যুতের চমক চিরকাল মানুষকে কখনও ভীত কখনও চমকিত করেছে। আদিম মানুষ, গ্রাম্য মানুষ জেনেছে আকাশের ভিতর পাথরের ঘাট বা পাহাড় আছে বুঝি। তারই সংঘর্ষে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চকমকি। লৌকিক মন কিন্তু এখানেই থেমে যায়নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দেখেছে তারাভরা আকাশ আর মেঘের আড়ালে অজস্র নক্ষত্রের লুকোচুরি। আবার তাদের মধ্যে দুটি জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। একটি চন্দ্র অপরটি সূর্য। এই তাদের লৌকিক কাব্যিক মন আকাশের অজস্র তারাকে সাতশত বা অসংখ্য ডালের কল্পনা করে চাঁদ ও সূর্যকে সেই ডালের দুটি পাতার সঙ্গে উপমিত করেছে। আকাশের বিস্ময়ই ধাঁধাটি সৃষ্টির কারণ হয়েছে, মানুষের লৌকিক মনে যা প্রশ্ন আকারে অপরের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষার জন্য বেরিয়ে এসেছে। এই আকাশ ও তারা সম্পর্কে আরও একটি উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে :

২। সুফল ফুইট্যা রইছে তুলুইয়া নাই।
সুমরা মর‍্যা রইছে কান্দাইয়া নাই।
সুবিছানা পইড়া রইছে শুউইয়া নাই॥

এর উত্তর আর কিছু নয়। আকাশ ও তারা। সুন্দর ফুল ফুটেছে অথচ তোলা যায় না। সুমরা মরে আছে অথচ কেউ কাঁদছে না। সুন্দর বিছানা পড়ে আছে অথচ কেউ শুয়ে নাই। এরকম অর্থে জিনিষটি কি হতে পারে,—এই প্রশ্ন জেগেছে গ্রাম্য কৌতূহলী মানুষের মনে, সৃষ্টি হয়েছে ধাঁধা।

সকল লোকশ্রুতিবিদ্‌ই ধাঁধার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে উপজাতি বা আদিম জাতির মধ্যেই এর উৎস, খুঁজেছেন। আদিম মানুষের কাছে প্রকৃতি চিরকাল ভীতি, বিস্ময় ও রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

প্রকৃতির প্রচণ্ডতায় যেমন তারা ভীত হয়েছে, তেমনি প্রকৃতির বিরাটত্ব তাদের কাছে রহস্যের সন্ধান বয়ে এনে দিয়েছে। আকাশের বুক চিরে যে বিদ্যুতের প্রকাশ তার রহস্যে আদিম মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে :

৩। The music drops from heaven
but who is the player ? [Baiga riddle]

অর্থাৎ স্বর্গ থেকে গান পড়ে, কে যেন বাজায় ওরে ? আসলে এর উত্তর হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের চমক আদিম মানুষের কাছে আকাশের সঙ্গীত বলেই মনে হয়েছে আবার সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়েছে এই সঙ্গীতের গায়ক কে ? রহস্য ও বিস্ময় জিজ্ঞাসার আকারে বেরিয়ে এসেছে ধাঁধার মধ্যে এবং এক অভিনব বিশেষত্ব আদিম মানুষের মনে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। বিরাট বড় গাছের মাথায় নারিকেল ফল হওয়াটাকে তারা আশ্চর্য বলে মনে করেছে, তাই ধাঁধা তৈরী হয়েছে :

৪। The elephants eggs that are like a drum.
[Santal riddles]

আদিম মানুষের কাছে সব কিছুই রহস্যময়। তীর ধনুক নিয়েই তাদের কারবার। বন্দুক হয়ত দেখেছে পরবর্তী জীবনে, কোন আধুনিক সভ্য শিকারীর কাছে। তাই বন্দুকের ছোট্ট নল দিয়ে বিরাট গর্জন যখন শুনেছে এবং পশুকে হত হতে দেখেছে তখন কৌতূহল ও বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে :

৫। The tiger roars in the ants hole. [Baiga riddle]

লক্ষ্য করবার বিষয় যে এর উত্তর বন্দুক হলেও ধাঁধাটির প্রকাশ ভঙ্গিটি আদিমতর। আদিম গর্জন বলতে বোঝে ব্যাঘ্রের গর্জন, যার সঙ্গে তাদের নিত্য সংগ্রাম বনে-জঙ্গলে আর বন্দুকের ক্ষুদ্র নল পিঁপড়ের গর্তের প্রতীকে ধরা পড়েছে।

আলো বা দীপ আদিম মানুষ জানতো না। পরে তারা যখন আগুন জ্বালাতে শিখেছে বা আরও সভ্য জগতের সঙ্গে সংস্পর্শে

এসে যখন লম্ফ, প্রদীপ ব্যবহার করতে শিখছে, অন্ধকারের আদিম মানুষের মনের বিস্ময় তখনও অব্যাহত থেকে সৃষ্টি করেছে ধাঁধা :

৬। The root is in the river,
The flower is in the hill,

[Baiga Poetry, 'Man in India', Vol—XXII, pp. 54]

আসলে এর উত্তর হচ্ছে কেরোসিন লম্ফ। কিন্তু এর রহস্যময় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে,

৭। শেকড় আছে নদীতে
ফুল ফুটেছে পর্বতে

অর্থাৎ লম্ফর নীচে কেরোসিনে বাতি আছে আর জ্বলছে তার শিখা ওপরে। এটিও আদিম মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের বস্তু হয়েছে।

এভাবেই উদ্ভব হয়েছে ধাঁধার। আদিম মানুষ যা ব্যবহার করেছে কখনও তাদের সামাজিক জীবনে বিবাহ ইত্যাদি উৎসবাদিতে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার মানসে,—কখনও তা ব্যবহৃত হয়েছে নিজেদের মধ্যে কৌতুক ও আনন্দ উপভোগের জন্যে। এই প্রসঙ্গে C. F. Potter-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে :

For it is obvious that the solving of riddles was a technique anciently and primitively employed at times of crisis or on occasions when fate of some one or even a whole tribe hung in the balance. Rain-making, grain growing and harvesting, circumcision, wedding, funerals and buryings, all these were critical times'. [*S. D. F. L. Page 940.*] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আদিম যুগে বা প্রাচীনতম যুগে মানুষ ধাঁধাকে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেছে কোন সঙ্কটের সময়, যখন হয়ত একটা উপজাতি বা গোষ্ঠীর ভাগ্য নির্ভর করেছে। তাই অনাবৃষ্টির সময়ে বৃষ্টির জন্যে, অনুর্বরতায় উর্বরতা আসার জন্যে, বিবাহে, মৃত্যুতে, বীজ বপনে অর্থাৎ

জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এই ধাঁধাকে সঙ্কট-ত্রাণের মন্ত্র হিসেবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে। তার মনে করেছে ধাঁধার রহস্য উন্মোচন করলে অপদেবতারা খুশি হবেন এবং অভিশাপ চলে যাবে; দেবতা আর্শীবাদ করবে। শস্য ফলবে অপর্যাপ্ত, বৃষ্টিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হবে। এর ফলে গড়ে উঠেছে নানা প্রকৃতিমূলক ধাঁধা— যার পিছনে হয়ত আছে এরকম কিছু একটা উৎসের ইতিবৃত্ত। তাই যখন একটি সাঁওতালী ধাঁধাতে দেখা যায় যে:

৮। The old man's tooth that dangles.

আর জানা যায় এর উত্তর আম তখন সব স্পষ্ট হয়। কিংবা যখন বলা হয়, 'গাছটি ঝাঁপুর ঝুপুর, তার তলায় চৈতন্য ঠাকুর'— তখন ধাঁধাটি যে কৃষিমূলক তা বলে দিতে হয় না।

ব্যবহারিক জীবনে ধাঁধার একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রকৃতির আদিম বিশ্বাসের জগতে ধাঁধা হয়ত অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে, ধরাকে সজীব করে। কিন্তু বিবাহ বা মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেন ধাঁধাকে আবিষ্কার করেছে আদিম জগতে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ প্রসঙ্গে এর একটি মনস্তাত্বিক কারণ উপস্থিত করা যেতে পারে:

'Psychologically our primitive ancestors may have had something। Solving difficult riddles at wedding may have encouraged the young couple to think they might similarly tackle and find the solution of the many enigmas of married life. At any rate, it would start them off in the atmosphere of accomplishment and aura of success. [*Ibid—P. P. 940*] অর্থাৎ আদিম মানুষ বিশ্বাস করতো যে বিবাহ রজনীতে যদি তারা কঠিন ধাঁধার সমূহের সমস্যা পূরণ করতে পারে তাহলে তা পরবর্তী জীবনের বহু সমস্যাকে জয় করতে সহায়তা করবে। এভাবে নানা কারণে উদ্ভব হয়েছে ধাঁধা, কখনও তা জীবনের

প্রয়োজনে কখনও তা জীবিকার প্রয়োজনে, কখনও তা অবসর বিনোদন বা আনন্দ বর্ধনের জন্যে। ধাঁধা লোক-সাহিত্যের একটি আদিমতম বিষয়। এমনকি অনেকে রূপকথা-উপকথা, লোক-সংগীতের চেয়েও ধাঁধাকে লোক-সাহিত্যের আদি নিদর্শনরূপে গণ্য করেছেন। সংক্ষিপ্ততা, চিন্তার গভীরতা, প্রাচীনতম জ্ঞানসমৃদ্ধতা ও শক্তিময় ছন্দোবদ্ধতাই ধাঁধাকে লোক-সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ধাঁধার উৎসপর্ব যে প্রাচীন যুগে তার প্রধান প্রমাণ এর সংক্ষিপ্ততার মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম রূপকের সাহায্যে একটি পরিণত শিল্প ও রসবোধের প্রকাশ। বহুযুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, সাধারণ জ্ঞান, বাস্তব চেতনা ও রসবোধ দিয়ে তৈরী হয়েছে ধাঁধার বিপুল ভাণ্ডার। তাই ধাঁধার মধ্যে আছে এমন একটি সার্থক শিল্পরূপের পরিচ্ছন্নতা ও সংবদ্ধতা (Neatness and compactness) যা যুগযুগান্তর ধরে অনেক চিন্তা ও অধ্যবসায়ের ফলে গড়ে উঠেছে। তাই লোকশ্রুতিবিদ্ মতামত উপস্থিত করেছে : 'Riddles, perhaps even more than most types of traditional :lore, have a way of 'staying put.' Their Vigorous compactness of form seems to give them a peculiar hold on the popular imagination and in many cases to ensure their preservation for centuries. [L. W. Comppell, pp. 227, of B. A. Bofkin's 'Folksay', 1930]

তাহলে দেখা যাচ্ছে ধাঁধা হচ্ছে এমন জিনিষ যা জনশ্রুতির সঞ্চিত ভাণ্ডার। সংক্ষিপ্ততা ও দৃঢ়সংবদ্ধতার মধ্যে কতকগুলি জনপ্রিয় কল্পনাকে ধরে রাখা হয়েছে, যুগযুগান্তর ব্যাপী ধাঁধার মধ্য দিয়ে। কেবল পরিচ্ছন্নতা এবং সংবদ্ধতাই ধাঁধার একমাত্র গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়, এর আরও বহুতর গুণের মধ্যে আছে ভাষার এবং উপমার সৌন্দর্য, চিন্তার পরিপক্কতা, অর্থ ও প্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান-সমৃদ্ধি; যা কখনও আনে আনন্দ ও রসোপলব্ধি, অনাবিল

হাস্যরসে কখনও বা ভরিয়ে তোলে মনপ্রাণ, আবার কখনও হতবুদ্ধি ও চকিতভাব এনে দেয় শ্রোতাদের মধ্যে। তাই বলা হয়েছে ঃ 'Then again, like all children, I was intrigued by the peculiar combination of beauty and mystery on the one hand and absolutely logical factual reasoning of the other. The riddle was a puzzle and a challenge and nut to crack.' [C. F. Potter. S. D. F. L. pp., 939.]

সুতরাং বলা যেতে পারে হাস্যরস সৃষ্টি, বিস্ময় ও বৈচিত্র্য আনয়ন ধাঁধার অন্যতম গুণ ও বৈশিষ্ট্য। দু' একটি সংগৃহীত উদাহরণ দিয়ে ধাঁধার বৈশিষ্ট্যগুলি আরও সুপরিস্ফুট করা যেতে পারে।

ধাঁধা যদি দীর্ঘতম অভিজ্ঞতার বাহন হয়, তবে ধাঁধার মধ্যে দেখা যায় বহুযুগ সঞ্চিত সুসংবদ্ধ শিল্পের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঞ্চয়। তার উদাহরণ হিসাবে বলা চলে যেমন বোলতার হুলে মানুষের যন্ত্রণার সীমা-পরিসীমা নাই—তাই বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও সাধারণ জ্ঞান বোলতা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছে একটি ধাঁধায়। যেমন ঃ

৯। এতটুকু বামুন ছা, ছুঁই দিলে বলে হায় গো মা। [বোলতা]

অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাবধান বাণী, তেমনি একটি কৌতুককর গোপন জিজ্ঞাসা। বোলতা দেখতে এতটুকু বামুনের ছেলে, কিন্তু তাকে ছুঁলেই এত বড় তার ব্রহ্মতেজ যে মা মা বলে চীৎকার করতে হবে।

পরিচ্ছন্নতা ও সুসংবদ্ধতা ধাঁধার দুটি প্রধান গুণ। সংক্ষিপ্ততর পরিবেষ্টনীতে সুপরিচ্ছন্ন ভাবে একটি বিষয় বা বক্তব্যকে সাজিয়ে গুছিয়ে ইঙ্গিতবাহী করে উপস্থিত করা ধাঁধার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যথা ঃ

১০। একটুখানি মামা
গা ভর্তি জামা। [পেঁয়াজ]

১১। ছোটবেলা পরে জামা
বড় হলে ন্যাঙটো মামা। [বাঁশ]

প্রকৃতির মধ্যে যে প্রতি মুহূর্তে রহস্য ও বিশিষ্টতা আছে লৌকিক মানুষের কাছে তা চিরকালই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। পেঁয়াজ সারা গায়ে জামা পরে। পেঁয়াজের গায়ে অসংখ্য স্তর ও আবরণ। তাই ধাঁধা তৈরী হয়েছে তাকে নিয়ে 'একটুখানি মামা, গা ভর্তি জামা' সংক্ষিপ্ত ও সুপরিচ্ছন্ন ভাবে পেঁয়াজ সম্পর্কে এর চেয়ে আর কি ভালো ধাঁধা প্রস্তুত হতে পারে? অপর দিকে বাঁশের জন্মমুহূর্তে কচি বাঁশ অনেক আবরণে ঢাকা থাকে, আবার বড় হবার পর আস্তে আস্তে তার আবরণগুলো খুলে পড়ে, বাঁশ নগ্ন হয়ে যায়। তাই তাকে ধাঁধায় প্রকাশ করা হয়েছে, 'ছোটবেলা পরে জামা, বড় হলে ন্যাঙ্‌টো মামা'। এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সুসংবদ্ধ প্রকাশ বাঁশ সম্পর্কিত ধাঁধায় আর কি হতে পারে!

ধাঁধা কখনও অনাবিল, হাস্যরসে, কখনও বিস্ময়রসে হতচকিত করে তোলো, তাই যখন বলা হয়:

১২। একটুখানি পুষ্করিণী টলমল করে
একটুখানি কুটো পড়লে সর্বনাশ করে। [চক্ষু]

১৩। তলে মাটি উপরে মাটি
মধ্যে সুন্দরী বেটি। [হলুদ]

কখন একটুখানি কোন পুষ্করিণীর মধ্যে কুটা পড়লে সর্বনাশ হয়ে যায়—তা ভাবতে ভাবতে প্রতিপক্ষ শ্রোতা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। কিছুতেই তারা ভাবতে পারে না যে, চক্ষুও পুষ্করিণীর মত টলটলে জলে পরিপূর্ণ। আবার পুষ্করিণীর স্থির জলে কুটা পড়ে যেমন কম্পন জাগে তেমনি চোখে কুটা পড়লেও জলের জোয়ার আসে। পরের ধাঁধাটিতে হাস্যরসের মাধ্যমে হলুদের রূপকটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তলে ও উপরের মাটির মধ্যে সুন্দরী বেটি হলুদ যে ঘুমিয়ে আছে তা কে বলতে পারবে?

ধাঁধার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধাঁধার উত্তর জনশ্রুতিমূলক।

পূর্বে জানা না থাকলে উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য নয়। আর যে ধাঁধার যে উত্তরটি প্রচলিত তাই সর্বসমক্ষে গৃহীত হবে, অনুরূপ অন্য একটি উত্তর হলেও চলবে না। যেমন ঃ

১৪। একটুখানি ঘরে
চুনকাম করে। [ডিম]

১৫। একটুখানি গাছে
রাঙা বৌটি নাচে। [লঙ্কা]

১৬। কাল বউএর কপালে চিক্
জামাই এলে করে হিত। [মাসকলাই]

উপরোক্ত ধাঁধাগুলি বিশ্লেষণ করলে সেই ধাঁধার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি সুপরিস্ফুট হবে। প্রথম ধাঁধার উত্তর অন্য কিছুও হতে পারে কিন্তু 'ডিম' এই উত্তরটিই প্রচলিত সমাধান। একটুখানি গাছে রাঙা বৌ নাচে, এর উত্তর ত তেলাকুচা ফল বা অন্য কিছু হতে পারে, কিন্তু তা নয়, 'রাঙা বৌটি যে লঙ্কা' এটি জানলে ধাঁধা জিজ্ঞাসা-কারীর কাছে সে পরাজিত আবার, কখনও কখনও তা ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে ওঠে। মাসকলাই এর ধাঁধাটি তারই পরিচয় বহন করে। সে ধাঁধা কালবউ-এর রূপকে গৌরবান্বিত হয়ে কপালে একটি ফোঁটা পরে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

সরলতা ধাঁধার বৈশিষ্ট্য হলেও কখন কখন তা আক্রমণাত্মক ভাবে শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত হয়। যেমন ঃ

১৭। বুনিতে মুসুরি তুলিতে গ্যাড়া
যে না বলিতে পারে সে আসলে ভেড়া। [বেগুন]

১৮। রক্তে ডুবডুব কাজলের ফোঁটা
এক কথায় যে বলতে পারে
সে মজুমদারের বেটা। [কুঁচ]

সুতরাং কেউ ভেড়া হতে চায় না এবং মজুমদারের বেটা হওয়ার ইচ্ছা অনেকেরই আছে। তাই জানা থাকলে বিনা আয়াসেই বলতে পারে এর উত্তর। আবার জানা না থাকলে অনেক সময় ভেড়া বনেই থাকতে হয় আক্রমণকারীর কাছে।

॥ দুই ঃ পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের ধাঁধা ॥

সুবর্ণরেখা নদী। দুধারে বিস্তীর্ণ বালুচর। নদীতে জল খুবই অল্প। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বিচ্যুত শিলাখণ্ড কৃষ্ণময় জলস্তম্ভের ন্যায় মাথা তুলে আছে। আর তার চারপাশ দিয়ে চলেছে কলকল শব্দে সুবর্ণরেখার স্বচ্ছ কাজল-কালো জল—কখনও সমান্তরাল রেখা সৃষ্টি করে, কখনও বা ঘূর্ণিময় তরঙ্গ ভঙ্গিমায়। আর সেই স্বচ্ছ কাজল-কালো জলের নীচে দেখা যায়, অসংখ্য ক্রীড়ারত মৎসের শ্রেণী—স্বচ্ছন্দগতি সন্তরণশীল। এই জলের উপর দিয়ে প্রায়শই দেখা যায় ছোট ডিঙি নিয়ে বেয়ে চলেছে সুবর্ণরেখার তীরবর্তী জেলের দল—মৎসজীবী ধীবর শ্রেণী। কালো কুচকুচে মসৃণ তাদের দেহ—দেহে আবরণ নেই বললেই চলে। প্রকৃতির কোলে মুক্ত এই সরল মানুষের দল মিতালী পাতিয়েছে এই সুবর্ণরেখার সঙ্গে। তাই জ্যৈষ্ঠের শুষ্কপ্রায় বিশীর্ণ সুবর্ণরেখায় তারা লগি হাতে ঘুরে বেড়ায়, শ্রাবণ-ভাদ্রের উদ্দাম-যৌবন সুবর্ণরেখার বুকে তারা নিঃশঙ্কচিত্ত প্রহরী—আবার শরৎ-হেমন্তের নীলাভ শান্ত জলের বুকে তারা কৃষ্ণ মরালের মত ডিঙি আর জাল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাই কি গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্ত-শীত সব ঋতুতেই এরা সুবর্ণরেখার চিরসঙ্গী? সুবর্ণরেখার সঙ্গী কেবল এরাই নয়, আরও আছে সখীর দল—তারা গ্রামের মেয়ে। প্রভাত-সূর্যের কাঁচা সোনার রঙ যখন সুবর্ণরেখার ধানসিঁড়ি নদী-ঘাটের কাজলকালো জলকে আবির রঙে রাঙিয়ে তোলে—যখন সুবর্ণরেখার তীরে তীরে জেগে থাকা নিঃশঙ্ক অতন্দ্র প্রহরীর মত শালগাছের ডালে ডালে অসংখ্য পক্ষীর দল বিচিত্র সুরের গানে গানে সুবর্ণ-রেখার বাতাস ভরিয়ে তোলে—পাখীদের গান যখন সুবর্ণরেখার কলকল ধ্বনিকেও ম্লান করে দেয়, তখন গ্রাম থেকে আসে বধূর দল কলসী কাঁখে নিয়ে। তখনও সুবর্ণরেখার বুকে কুয়াশা আর অন্ধকারের লীলাখেলা চলেছে—জলস্রোতে জেগে থাকা দ্বীপগুলো যেন তখনও ঘুমন্ত অবস্থায় নানা রূপকথা রচনা করে চলেছে—তারা আসে

অনেক বালির পথ বেয়ে অশত্থ গাছের নীচে গেরাম থানের আস্তানার পাশ দিয়ে সুবর্ণরেখার ঘাটে। জনমানবহীন সুবর্ণরেখার ঘাটে তখন তারা দ্বিধাহীনচিত্তে অসম্বৃত বসনে গল্প করবে সাংসারিক জীবনের নানা কথা; গান গাইবে, ছড়া বা শোলোক পাড়বে, স্নানপর্ব সমাধা হলে পেতলের কলসীগুলি বালি দিয়ে মেজে চক্‌চকে করে জল ভরে নেবে। তারপর সূর্য ওঠার আগেই লজ্জাবনত পর্দানশীন গ্রামের বধূর দল ভিজে কাপড়ে শরীরের সর্বাঙ্গ ঢেকে জলভরা কলসী কাঁখে নিয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে বালুকাময় পথের উপর পদ-চিহ্ন আঁকতে আঁকতে ফিরে যাবে। তখন হয়ত গ্রাম্য বৈরাগী তার একতারাতে সুর তুলেছে ঃ

কোকিল কালো, কালা ভ্রমর কালো
যমুনার জলও কালো, কদম ডালে কালা ভ্রমরা ;
গুঞ্জারি গুঞ্জারি বোলে, তোদের বদন তুলো তুলো
বসন পাবি ভালো ভালো। [হাতিবাড়ী]

তারপর সূর্য ওঠে। সূর্যের সোনার আলোয় সুবর্ণরেখার ছোট ছোট ঢেউএর স্বর্ণকণা চিক্‌চিক্ করে ওঠে। মনে হয়, কে যেন মুঠো মুঠো সোনার কণা ছড়িয়ে দিয়েছে সুবর্ণরেখার বুকে—বালুচরের বালুকণায়। সারা সুবর্ণরেখা তখন জেগে ওঠে। শালের বন থেকে শব্দ ভেসে আসে—সোঁ সোঁ আওয়াজে, সুবর্ণরেখার জলে কম্পন দেখা দেয়। দূর থেকে শোনা যায় মেয়েদের কলহাস্য—ওই আসছে সুবর্ণরেখার একান্ত প্রিয় সখীর দল—এখুনি আসবে। নিবিড় আলিঙ্গনে ভরিয়ে দেবে সুবর্ণরেখার বুক। কলহাস্যে চপলতায় আলোড়ন জাগবে সুবর্ণরেখার যৌবনে। তাই বুঝি সেই শিহরিত মুহূর্তের অনুভূতি আকাঙ্ক্ষায় সুবর্ণরেখা স্থির—অপেক্ষা করছে সেই আনন্দের চরমতম পর্বটির। আসে কুমারীর দল—ঝাঁপিয়ে পড়ে যৌবন-সম্ভবার দল পূর্ণযৌবনা সুবর্ণরেখার বুকে। হাস্যে-পরিহাসে-চপলতায়-আলিঙ্গনে-চুম্বনে-সুবর্ণরেখা তখন আনন্দ অনুভূতির মুহূর্তে শিহরিত হয়—উদ্দাম উত্তাল হয়ে ওঠে।

দিনের শেষে সূর্য নামে। রক্তিম গোধূলির 'কনে দেখা আলোয়' আবার গৃহবধূর দল গাগরী ভরণে সুবর্ণরেখায় আসে। মনে তাদের 'বেলা যে পড়ে এল'র শঙ্কা, তাই জলকে চলার দ্রুত পদক্ষেপে তারা চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্যে আন্দোলিত হয় সুবর্ণরেখা। কিন্তু সে তো কেবল মুহূর্তের জন্যে—ক্ষণিক তার এই চাঞ্চল্য। সন্ধ্যা নামে, সুবর্ণরেখার বুক জুড়ে এক সুগম্ভীর ধ্যানমৌনতা। সুবর্ণরেখার বুক জুড়ে কেবল কল্ কল্ ছল্ ছল্ শব্দ, শালবনের শন শন আওয়াজ। সুবর্ণরেখার বুক জুড়ে তখন চাঁদের রূপোলী মেলা বসেছে। সন্ধ্যা-বেলায় গ্রাম্য বধূর মত সেও প্রিয় আগমন প্রতীক্ষায় সাজসজ্জা করেছে সোনার নয়, রূপার অলঙ্কারে। জোৎস্নার ধারা তখন সুবর্ণরেখার আকাশ থেকে নেমে এসেছে সুবর্ণরেখার দেহের ওপর—বালুচরের বালুকণায়, কালো কালো ঢেউএর আর শুশুকের মত জেগে থাকা পাথরগুলোর মাঝখানে। পাক দিয়ে ঘূর্ণির জল গোলাকৃতিতে ঘুরছে, তখন মনে হয় সুবর্ণরেখা যেন অসংখ্য রূপালী কঙ্কণ পরেছে। আবার সেই জল যখন সরল রেখায় এগিয়ে চলেছে, তখন মনে হয়, সুবর্ণরেখা যেন সাতনরী হার পরে রাজনন্দিনী হয়েছে। কিন্তু প্রোষিতভর্তৃকা সুবর্ণরেখার আজ কেউ সাথী নেই—এই মুহূর্তে সে রিক্ত-নির্জন-সর্বহারা। গ্রাম থেকে গ্রাম্যনারীর কণ্ঠস্বরে ভেসে আসা গান যখন সুবর্ণরেখার বুকে আছড়ে পড়ছে, তখন সেই কথার সঙ্গে সুবর্ণরেখার বেদনা একত্রিত হয়ে সুবর্ণরেখার রিক্ততাকে আর গভীর করে তুলেছে:

দিনের বেলা ভালো মেঘলা, রাতের ভালো জোছনা
ছোট দিদিগো বলো বলো তার মনের বেদনা। [ডোমজুড়ি]

এ বেদনা ত ব্যক্ত করা যায় না—এ যে অন্তরের গভীরতর দীর্ঘশ্বাস। তাই কান পাতলে শোনা যায়, শালবনের শনশন শব্দ, আর সুবর্ণরেখার কলধ্বনি মিলেমিশে এক ক্রন্দনের রোল—যা সুবর্ণরেখার জ্যোৎস্নাভরা প্রান্তরের নিঝুম রাতের কান্না।

সুবর্ণরেখা আর অসংখ্য মানুষের দল পাশাপাশি বাস করে।

এই সুবর্ণরেখার মত এ অঞ্চলের অসংখ্য নদনদী এই সব মানুষের মনের রসের উৎসস্থান। রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথায়-লোক-গীতিতে, ধাঁধায়-প্রবাদে ভরপুর-এই সব নদীর তীরবর্তী মানুষের মন। সারাদিন তারা চাষ করে, লাঙল চষে, বীজ বোনে, মাছ ধরে, খেয়া পারাপার করে, মাটির বাসন তৈরী করে, কাপড় বোনে, সুতা কাটে—সন্ধ্যাবেলায় একত্রে বসে গান গায়, কথকতা পাঠ করে, রূপকথা,—ধাঁধার রহস্য উন্মোচন করে। সুবর্ণরেখা এদের জীবন, তাই শিলাবতী, দারুকেশ্বর, কংসাবতী রূপনারায়ণ যাই হোক না কেন—নদীই এদের জীবনীশক্তির উৎস। নদী যেমন চাষের জল ও তৃষ্ণার জল দেয়, তেমন মনের মণিকোঠায় যে গোপন রস-নির্ঝর আছে, সেখানেও ধারা জোগায়। নদীকে বাদ দিয়ে তাই এদের জীবনের কোন অনুষ্ঠানই সম্ভবপর নয়। একটি অনুষ্ঠানের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানটি বালিকা পূজার। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা থেকে রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত এই ব্রতানুষ্ঠান হয়। কলা শশা ইত্যাদি ফলমূল, ভিজা মুগ-ছোলা পেতলের বাসন নিয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে নদীর ঘাটে যাবে। সেখানে বালুচরে বালির বেদী নির্মাণ করবে। নদীতে স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরে ছড়ায় মন্ত্র পড়বে দামোদর। বক ও সূর্যের বন্দনা করবে। তারপর ঘটিতে করে জল নিয়ে বাড়ীর তুলসি মঞ্চে দেবে। দিবাভাগে নিরামিষ আহার করবে, আতপ চালের ভাত দিয়ে আর রাত্রে মুড়ি, চিঁড়ে ফল ইত্যাদি খেয়ে থাকবে। সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নীচে দীপ জ্বালাবে শাঁখ বাজাবে। প্রত্যহ ওই একই অনুষ্ঠান চলবে। শেষ দিনে খুব ভোরে স্নানকরে শোলার বা পাঁকাটির রথ ভাসাবে নদীতে। ওই রথে থাকবে পয়সা, আতপচাল, সুপারী, হরিতকী, ঘৃতের বাতি, তারপর মন্ত্রপাঠ করবে। গান হবে:

বালিকা নবেন্দ্র বালিকা নবেন্দ্র
বালিকা বন্ধ এ নারী,

স্বর্গপুর পুষ্পোতি পড়িলে
মঞ্চে পড়ে হুলাহুলি।
নদী নবেন্দ্র নদী নবেন্দ্র নদীকে বন্দে এ নারী—
স্বর্গপুর যে পুষ্পোতি পড়িলে মঞ্চপরে হুলাহুলি
দামোদর নবেন্দ্র দামোদর নবেন্দ্র দামোদর বন্দে এ নারী—
স্বর্গপুর পুষ্পোতি পড়িলে মঞ্চপরে হুলাহুলি। [দহমুণ্ডা]

এভাবে নদীই এদের জীবনকে গড়ে তুলেছে। তাই প্রাত্যাহক জাবনচর্যায় নদীকে এরা কোনদিন বিস্মৃত হতে পারে না।

এক বিচিত্র লৌকিক সংস্কৃতি মানসের অধিকারী এই সব মানুষের দল। পশ্চিম-সীমান্তবঙ্গের প্রান্তবর্তী এই সব অধিবাসীর এই চিহ্ন যেমন আছে, তাদের লৌকিক ধর্মে, ব্রতানুষ্ঠানে, পর্ব-পার্বণে, আচার-আচরণে, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে ঠিক তেমনি এই লৌকিক-সংস্কৃতির পরিচয় আছে লোক-সাহিত্যের রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথায়, লোকগীতির বিভিন্ন গানে, আর ধাঁধায়—ছড়ায় প্রবাদে। এই পর্বে পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের ধাঁধার একটি বিশিষ্ট পরিচয় উপস্থিত করা হবে। হাতিবাড়ী, দহমুণ্ডা, ডোমজুড়ি, কুইলাপাল—পশ্চিম-সীমান্তের এই সব গ্রামগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সব ধাঁধা পাওয়া গেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে সীমান্ত-বঙ্গের ধাঁধার একটি প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থিত করা হবে।

আকৃতি ও বিষয়গত (Form and Content) ভেদে এ অঞ্চলের ধাঁধাগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। আকৃতিগত দিক দিয়ে ধাঁধার ছয়টি শ্রেণী। যথা: ১। লৌকিক ধাঁধা (Folk-riddle), ২। প্রাচীন ধাঁধা (Classical riddle), ৩। সাহিত্যিক ধাঁধা (Literary riddle), ৪। আক্রমণাত্মক ধাঁধা (Challenging riddle), ৫। আধুনিক ধাঁধা (Modern riddle), ৬। তাত্ত্বিক ধাঁধা (Theoritical riddle)। আবার বিষয়গত ভাবে ধাঁধাকে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা: ১। প্রকৃতি-বিষয়ক ধাঁধা, ২। পৌরাণিক ধাঁধা, ৩। আচার-

গত ধাঁধা, ৪। গার্হস্থ্য-জীবন-মূলক ধাঁধা, ৫। পারিবারিক সম্বন্ধ-মূলক ধাঁধা, ৬। সংখ্যামূলক ধাঁধা।

লৌকিক ধাঁধা প্রসঙ্গে বলা চলে এটি হল জনশ্রুতিমূলক। সংক্ষিপ্ত এবং প্রাত্যহিক। যেমন ঃ

১। উপরে বাসা নীচে ডিম। [মহুয়াফুল]

এর মধ্যে আছে পুরুলিয়ার আদিবাসী ও সাধারণ মানুষের নিছক অভিজ্ঞতা ও লৌকিক মানস। মহুয়াফুলের আকৃতি ও গঠনের বৈশিষ্ট্যটি এ অঞ্চলের গ্রামবাসীর মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। তাই-ই আবার ধাঁধার আকারে বেরিয়ে এসেছে। কিংবা,

২। এখান থেকে দিলুম দৃষ্টি
ঐ গাছটি বড়ই মিষ্টি। [আখ]

গাছের কাণ্ডের মিষ্টত্ব সরল গ্রামবাসীর মনে বিস্ময়ে সৃষ্টি করে ধাঁধার আকারে বেরিয়ে এসেছে।

প্রাচীন ধাঁধা বলতে প্রধানতঃ প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত ধাঁধা-গুলিকেই বোঝায়। সুপ্রাচীন চর্যাপদ থেকেই হেঁয়ালীর আকারে কবিরা তাদের অনেক বক্তব্য বিষয় ধাঁধার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। যেমন, চর্যাপদে, 'দুলি দুহি পীঢ়া ধরণ ন জাই। রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই' অথবা, 'জোই সাধী সোই অসাধী। জোই জোই বোধী, সোই নিবুধী'। চর্যাপদের কবিরা সান্ধ্যভাষায় তাদের দেহতত্ত্বকে হেয়ালীপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বহুক্ষেত্রে কবিরা ধাঁধার ব্যবহার করেছেন। ধাঁধাগুলির মধ্যে যেমন প্রাচীনত্ব আছে, তেমনি লৌকিক মনের স্পর্শও সেখানে বিদ্যমান। যথা ঃ

৩। যোগী নয় সন্ন্যাসী নয় মাথায় হুতাশন।
ছেলে নয় পিলে নয় ডাকে ঘন ঘন॥
চোর নয় ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে।
কন্যা নয় পুত্র নয় বর্শা মারে মুখে॥ [হুঁকা]

কিংবা,

৪। রঙ্গে বৈসে নানাস্থানে ভ্রমে চারি ভাই
জীবনকালে পৃথক মরণে এক ঠাঁই।
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে মূর্খ কিবা জানে
হিয়ালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণে ভণে॥ [পাশাঘুঁটি]

মুকুন্দরামের ধাঁধাগুলি প্রাচীন সাহিত্যিক ধাঁধার নিদর্শন হলেও লৌকিক মানসটি সেখানেও সদা-সক্রিয়। তাই ডোমজুড়ি গ্রামে প্রাপ্ত একটি ধাঁধার সঙ্গে এর সাদৃশ্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়ঃ

৫। বেদবর্ণ ষোল সখী অতি চমৎকার
তিন বীর নিয়ে করয়ে বিহার।
ষোল সখী হতে যদি এক সখী মরে
পুনর্বার জন্মে সেই নিজ ঘরে। পাশার ঘুটি [ডোমজুড়ি]

লৌকিক ধাঁধার সঙ্গে সাহিত্যিক ধাঁধার পার্থক্য হচ্ছে, লৌকিক ধাঁধার মধ্যে সরল গ্রাম্য মনের অনাড়ম্বর একটি অনুভূতিই প্রকাশিত হয়। যেমনঃ

৬। একটুকু গাছে কেষ্ট ঠাকুর নাচে। [বেগুন]

এই ধাঁধার মধ্যে কোন সাজসজ্জা অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি নেই, কেষ্ট ঠাকুরের রূপকে যা উপস্থিত হয়েছে, তা বেগুন বা কালো রঙের 'ইমেজ' এনেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়, অসংস্কৃত মনের অনাড়ম্বর সৃষ্টিই ধাঁধা। সাহিত্যিক ধাঁধায় একটি পরিণত শিক্ষিত বুদ্ধি ও মন, রূপ এবং অলঙ্কারের সাহায্যে বিস্তারিত আকারে প্রকাশ করে। লৌকিক ধাঁধায় যা সংক্ষিপ্ত, সাহিত্যিক ধাঁধায় তাই-ই বিস্তারিত। যথাঃ

৭। একটুখানি পুষ্করিণী টল টল করে
একটুখানি কুটা পড়লে সর্বনাশ করে। [চক্ষু]

এই লৌকিক ধাঁধাটির প্রকাশভঙ্গি কত সহজ ও সংক্ষিপ্ত; অথচ শিবায়ন কাব্যের কবি রামকৃষ্ণ রায় শিবের বিবাহ উপলক্ষ্যে বাসর গৃহে যে ধাঁধা উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যে 'চক্ষু' সম্পর্কিত ধাঁধা রচনা করতে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। যথাঃ

৮। ডিম্ব নাঞি ফুটে মাত্র ধরিয়াছে পাখা।
ডিম্বের ভিতরে তার শিশু যায় দেখা॥
দেখিল অপূর্ব ডিম্ব অনুক্ষণ উড়ে।
সতত চঞ্চল মাত্র ঠাঁঞি নাঞি ছাড়ে॥
বলেন ভৃগুর রমণী বলেন ভৃগুর রমণী।
একটি ফল ইয়ে আমি একমাস জিনি॥ [চক্ষু]

আক্রমণাত্মক ধাঁধার আকারগত রূপ পরিপূর্ণভাবে আক্রমণাত্মক। এগুলি লৌকিক ধাঁধারই অন্তর্গত। এ জাতীয় ধাঁধায় সাধারণত উত্তরকারীর প্রতি আক্রমণের ভাব থাকে, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে হাস্যাস্পদ করে তোলার চেষ্টা করা হয়। যেমন—পুরুলিয়া জেলার কুইলাপালে প্রাপ্ত একটি সংখ্যামূলক ধাঁধার এই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিটি লক্ষণীয়ঃ

৯। ষোল সতেরো উনিশে ডীপ
এই কথাটা ভাঙ্গতো, পণ্ডিত। [গরু কেনা]

আধুনিক যুগের সাহিত্যের মধ্যে আধুনিক মানসও ধাঁধা রচনায় সক্রিয়। বিশেষতঃ শিশুসাহিত্যের মধ্যে ব্যক্তি-রচিত সাহিত্যিক ধাঁধাকে আধুনিক ধাঁধার প্রকাশ বলা যেতে পারে। লৌকিক জন-জীবন থেকে জন্ম পরিগ্রহ করে নানা বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা আজও আধুনিক জীবনে প্রবহমান।

ধাঁধা রচনার আদিম যুগ থেকেই প্রকৃতি প্রেরণা দিয়েছে। তাই প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুও প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে লৌকিক ধাঁধার মধ্যে। প্রকৃতি আদিম মানুষের কাছে বিভীষিকা ও রহস্যময় ছিল। আজ সেই প্রকৃতির রহস্য অনেকটা উন্মোচিত হলেও গ্রাম্য সাধারণ মানুষের কাছে আজও তার রহস্য ও বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যায় নি। আকাশের বিদ্যুৎ তাই কুইলাপালের মানুষের কাছে আজও বিস্ময়। ধাঁধাই তাই দেখিঃ

১০। এ ফলটা পেলিস কোথা
রাজার কুণ্ডলেও নাই, বেনের দোকানেও নাই
পয়সা দিলেও মিলে নাই। [বিদ্যুৎ]

কুইলাপালের মানুষের বাস শাল আর মহুয়া বনের পাশেই। বনে অসংখ্য মহুয়া গাছ। সেই গাছে ফোটে অসংখ্য মহুয়ার ফুল। তাই মহুয়ার মদ তৈরীই হোক আর ভাতের অভাবে মহুয়ার ফুল সেদ্ধ হোক, মহুয়ার ফুল তাদের জীবনে অপরিহার্য। কিন্তু তাদের সেই প্রকৃতি প্রেমিক মনটি মহুয়া ফুলকে কেবল ব্যবহারিক জীবনে আবদ্ধ না রেখে তাকে যে ধাঁধায় প্রকাশ করেছে, তা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রকৃতি জগতে যা কিছু অত্যাশ্চর্য মনে হয়েছে, প্রাকৃতজন তাই সাদরে বরণ করে নিয়েছে, নিজেদের মনের মণিকোঠায় তৈরী করেছে ধাঁধা। যথা ঃ

১১। ছাগলটা বাঁধা রইলো পঘাটা চরতে গেল।

[কুমড়া ও কুমড়া গাছ]

১২। ধলা ছাগলের কাল পঘা। [লাউ] [কুইলাপাল]

বাবুইপাখীর বাসার মধ্যে আছে সৃজনীশক্তির এক অনবদ্য রূপায়ণ। সেই বিস্ময়কে ধরে রাখে ধাঁধার মধ্যে কুইলাপালের প্রাকৃতজন ঃ

১৩। স্বর্গে ঘর, পাতালে দুয়ার। [বাবুইপাখীর বাসা]

পদ্ম লৌকিক মনকে আকৃষ্ট করেনি, কিন্তু শালুকের বৈচিত্র্য তার মনটিকে আকৃষ্ট করে তৈরী করেছে ঃ

১৪। এক লোক হাসে, এক লোক ভাসে
আর এক লোক কাদায় মুড়গাছা দিয়ে থাকে। [শালুকফুল]

'বাঁশের কোড়' শহরের মানুষের ঘৃণ্য বস্তু হলেও গ্রাম্য মানুষের কাছে প্রিয় খাদ্যবস্তু। কিন্তু লৌকিক মানস তার থেকে শুধু সুস্বাদু ব্যঞ্জন-রন্ধনের সামগ্রীই খোঁজে না, আরও কিছু অতিরিক্ত রহস্য সন্ধান করে। তাই সে বলে ঃ

১৫। ছেলেবেলায় মাথায় টুপী, যুবাকালে ভুলায় গোপী,
রামের শরে রাবণ মরে, সেই তরকারী আমার ঘরে।

[বাঁশের কোঁড়]

প্রকৃতিজাত সমস্ত কিছু বস্তুই গ্রাম্য মানুষের লৌকিক মনে বিস্ময় ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। তাই বেগুন, বোলতা, পাকা লঙ্কা, লেবু,

চালকুমড়া, ময়ুর, ফুল, তরিতরকারী থেকে শুরু করে কীট-পতঙ্গ, পাখী প্রকৃতির কোন কিছুই ধাঁধার বিষয়বস্তু থেকে বাদ পড়েনি। যেমন ঃ

১৬। উপর থিকে পড়লো ছাঁ-টি
তার মাথায় টুপি। [তাল] ডোমজুড়ি

১৭। ওহে দাদা, ওহে দাদা, কি ফল পরে
কি ফল পাকা। [ভালিয়া ফল] ঐ

১৮। গাছটি ঝাপুর ঝুপুর, তার তলায় চৈতন ঠাকুর। [বেগুন] ঐ

১৯। এতটুকু গাছে, লালবাবু ঝুলে। [পাকালঙ্কা] ঐ

২০। এতটুকু বামুনদা ছুঁ দিলে হায় গো মা। [বোলতা] ঐ

২১। বনরু আইলা চিতি, চিতি বলে তোর পাতে মুতি। [লেবু] ঐ

২২। হস্তি দাঁত, গজমুক্ত, কাটিলে বাকল নাই
এই ফলটি খুঁজিলে রাজ্য ভিতরে নাই। [শিল] ঐ

২৩। নদীর সেপাথুরত (ও পারের) আইলা ঝনে (একলোক)
বাশি কাঁধে করি (কাট কাটার যন্ত্র কাঁধে),
গাছ চারা ফল জিন্তা, কাটমু কেমন করি। [চালকুমড়া] ঐ

ধাঁধাটির মধ্যে ভোজপুরী হিন্দীর প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। ডোমজুড়ি গ্রামটি মেদিনীপুর ও সিংভূম জেলার সীমান্তে অবস্থিত। তাই এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশ ও মিশ্রসংস্কৃতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। আর একটি ধাঁধায় ঃ

২৪। নদী সেপাথুরত্ আইলা ঝঁনে
তার পাছায় খড় পণে। [ময়ুর]

প্রকৃতির রাজ্যে সুন্দরের পাশেই আছে অসুন্দরের স্থান, সুশ্রীর পাশে বিশ্রী। তাই লৌকিক মানস যেমন ময়ুরের দিকে নজর দিয়েছে, ঠিক তেমনি ব্যাঙের কুৎসিৎ চেহারাও তার চোখে পড়েছে। তাই ব্যাঙকে নিয়ে ধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে ঃ

২৫। বাঘের মত ঝাঁপ মাঝে, কুতার রকম বলে,
গঙ্গাজলে শোনের মত ভাসে, পাথরের মত ডুবে।

মহুয়া গাছ ঝাড়গ্রাম-হাতিবাড়ী-ডোমজুড়ি অঞ্চলের বনে-জঙ্গলে

অনেক হয়। সে গাছের বিশিষ্টতা ও লৌকিক মানস ধাঁধার মধ্যে ধরে রেখেছে :

২৬। গাছটির নাম হীরা আগে ধরে গুড় বাইগণ
পাছে ধরে জিরা। [মহুয়া গাছ]

লম্বা লম্বা চিচিঞ্জে প্রকৃতির একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। গ্রাম্য মানুষের কাছে সেটি একটি সাধারণ খাদ্যবস্তু হলেও তাঁর প্রকৃতিজাত গঠন বৈশিষ্ট্যটি কিন্তু ধরা পড়েছে :

২৭। খেপ খেপড়া লোহার বাড়ি,
যে না কহে তার বাপ হাড়ি। [চিচিঞ্জে]

ব্যাঙের ছাতা প্রকৃতির একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। বর্ষায় সোঁদা জায়গায় বাংলার গ্রামে প্রচুর পরিমাণে এগুলি ফুটে উঠে। পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার একটি গ্রাম দহমুণ্ডা থেকে প্রাপ্ত ধাঁধায় এর রহস্যটি সৃষ্টি হয় :

২৮। নিমন মজা, মজ (বীজ) নাই তার উঠে গজা।
[ব্যাঙের ছাতা]

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের হাতিবাড়ী—ডোমজুড়ি—দহমুণ্ডা—কুইলাপাল প্রভৃতি গ্রামের মানুষের দল কেবল প্রকৃতির বিচিত্র বৈশিষ্ট্যর মধ্যেই ধাঁধার বিষয় নিবদ্ধ করেনি, গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিদিনকার কাজ-কর্মের মধ্যেও ধাঁধাকে আরও বেশী করে ব্যবহার করেছে। কুইলা-পালের হাটে আয়না বিক্রি হয়। গ্রামের বধূ সেই ছোট্ট আয়না কিনে এনেছে নিজেকে দেখবার জন্যে, আর কাঁকই দিয়ে চুল আঁচড়াবার জন্যে। সেই আয়নার মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত দেখে বিস্মিত হয়েছে। ধাঁধার মধ্যে আছে সেই বিস্ময়ের চিহ্ন :

২৯। আনবি রতন, করবি যতন
দেখায় কেমন আমার মতন। [আয়না]

কলুর ঘানি গ্রাম্য মানুষের কাছে প্রতিদিনকার দেখা বস্তু হলেও ঘানির পেষণে যে তেল বেরিয়ে আসে সেটা তাদের কাছে রহস্যময়। তাই তারা রচনা করে :

৩০। চিকন চিকন চক্রবর্তী
এক হাঁটু উপরে বসি। [কলুর ঘানি] নূতনডি

গ্রাম্যবধূ মুড়ি ভাজে। কারণ, ভাতমুড়ি তাদের নিত্যকার খাদ্য-সামগ্রী। কিন্তু তবু মুড়ি বা খই ভাজার সময় চাল বা ধান থেকে ফট্ ফট্ করে কি ভাবে মুড়ি বা খই বেরিয়ে আসে, সেটি কিন্তু গ্রাম্যনারীর দৃষ্টিকে কৌতূহলী করে তুলেছে ঃ

৩১। মাঠের মাদল খেড়েক বুবা
নাচছে নাচছে বুড়ি কুবা কুবা। মুড়ি বা খই। [ঐ]

গ্রামের মানুষ পেষ্ট বা মাজন দিয়ে দাঁত মাজে না। দাঁতন কাঠি তার চাই-ই। কিন্তু সামান্য দাঁতন কাঠিটিও তাঁর কৌতূহল থেকে বাদ পড়েনি ঃ

৩২। খিল যেতে আধজন, ধাতুর দিল স্বরজন
কাটি তো মাড়ি নাই, খাই তো গিলি নাই।
[দাঁতনকাঠি] কুইলাপাল

আজকাল গ্রামে গ্রামে চালের কল দেখা দিলেও একদিন বাংলার গ্রাম ঢেঁকির আওয়াজে মুখর থাকতো। ঢেঁকিশাল ছিল বঙ্গনারীর বৈঠকখানা। ধান ভানতে ভানতে যেমন তারা গান রচনা করেছে, গেয়েছে—ঠিক তেমনি ধাঁধাও রচনা করেছে ঃ

৩৩। হুকুড় কুন্দা শ্রীদাম দাদা
কেউ করে ছেঁ কেউ করে মেঁ
কেউ দালাক ঢুলুক নাচে। [ঢেঁকি]

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের একটি গ্রাম ডোমজুড়ি। এর ভৌগোলিক অবস্থান সিংভূম জেলায় হলেও এই গ্রামের সাংস্কৃতিক মানসটি পরিপূর্ণভাবে বাঙালীর। এই গ্রামে অনেকগুলি পারিবারিক গার্হস্থ্য-জীবনসম্পৃক্ত ধাঁধা পাওয়া গেছে। এই গ্রামের গৃহস্থের আঙিনায় যখনই যাওয়া হয়েছে, অতিথিকে একঘটি জল ও মুড়ির ডালা এগিয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়েছে। কুইলাপালে যেমন মুড়ি ও খই ভাজার ধাঁধা পাওয়া গেছে, তেমনি ডোমজুড়ি গ্রামেও পাওয়া গেছে মুড়ির ধাঁধা।

৩৪। সমুদ্র বালিরে কি ফুল ফুটে
বালুতে দেখিনি ভূঁইরে লুটে। [মুড়ি।]

গ্রাম্য যুবক হয়তো নতুন চপ্পল পরে এসেছে। গ্রাম্য বালক বা গ্রাম্য নারীর কাছে তা কৌতুকের সামগ্রী। ধাঁধায় সেই কৌতুকেরই প্রকাশ ঃ

৩৫। ঘরে ঢুকে বাইরে ঢুকে, ঢুকে সবার মাঝে
চামের ভিতর চাম দিলে ফটর ফটর বাজে। [চপ্পল]

অনেক ধাঁধাতেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গী। একটি ঢেঁকির ধাঁধা এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

৩৬। উঠে বসে ঢেড়া সাপ
যে না কহে তার মেড়া বাপ। [ঢেঁকি]

উনান আর কলসী গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য বস্তু। তাই এই ধাঁধায় তারা বাঁধা পড়েছে। উনান নিকিয়ে পরিষ্কার করে গ্রাম্য বধূ যায় জল আনতে, কলসী কাঁখে।

৩৭। এক যে বুড়ি রোজ সকালে পাছা কেট্‌রায় [উনুন]
৩৮। একে বুড়ি রোজ সকালে উঠে আর ডুবে [কলসী]

কেবল উনুন আর কলসীই বা কেন—রাঁধতে বসে বঙ্গরমণীর প্রধান প্রয়োজন লবণের। গ্রাম্য নারীর ওই তো সম্বল। তাই লবণের বৈশিষ্ট্যটি তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়নি। যথা ঃ

৩৯। সমুদ্রেতে জন্ম তার সহরেতে বাস
ছা কে মা ছুঁইলে হয় সর্বনাশ। [লবণ]

সন্ধ্যা হয়। বাংলার গ্রাম্যনারী শঙ্খধ্বনি করে মা লক্ষ্মীকে আহ্বান জানায়। এখানেও কিন্তু রহস্য বা কৌতূহলের ক্ষেত্রটি অটুট। তাই শোনা যায় ঃ

৪০। ধব কুঁকড়া নেজা মুকুড়া, ফুঁকি দিলে বলে উঁ। [শঙ্খ]

'কাপড়' যা মানুষের লজ্জা নিবারণ করে, কৌতূহলী গ্রাম্য মানুষের লৌকিক মনে তা কিভাবে আলোড়ন এনেছে নিম্নের ধাঁধাটি তা প্রমাণ করে ঃ

৪১। বড় বড় বিলে, পাত গাঁ উড়ে।
জীব নয় জন্তু নয় মানুষ গিলে। [কাপড়]

তারপর 'জাল'—সেটাই বা বাদ যায় কেন? তাই দেখি সেখানেও নিজ রহস্য নিয়ে মাছ ধরার জালও ধাঁধার মধ্যে ফুটে উঠেছে :

৪২। আইলা রণরণাই বসলা গোড় মেলাই
মাইলা জন্তু খাইলা নাই। [জাল]

এভাবেই পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের মানুষ ঢেঁকি থেকে শুরু করে জাল, কাপড়, লবণ, হুকা, শঙ্খ, মুড়ি, খই, চটি, দাঁতনকাঠি, কলুর ঘানি, আয়না, কলসী, উনুন—নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী থেকে পরিচিত পরিবেশের সমস্ত কিছুকেই তুলে ধরে ধাঁধার মাধ্যমে।

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের সাধারণ গ্রাম্য মানুষের দল চণ্ডীমণ্ডপে বসে কথকতা শোনে, নিজেরা ঘরের দাওয়ায় বসে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী পাঠ করে, পুরাণের নানা গল্পকাহিনী নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে, ফলে রামায়ণ মহাভারত, পুরাণের নানা প্রভাব আছে এদের লৌকিক সংস্কৃতির স্তরে স্তরে। তাই এদের যাত্রাগানে, কাঠিনাচের গানে, ঝুমুর গানে, দেহতত্ত্বের গানে বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীর মহাত্ম্য বর্ণনা। ধাঁধার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। ডোমজুড়ি—হাতিবাড়ী—দহমুণ্ডা ইত্যাদি অঞ্চলে পৌরাণিক ধাঁধার এক বিরাট লুপ্তপ্রায় অধ্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তারই কিছু কিছু নিদর্শন এখানে তুলে দেওয়া হলো :

৪৩। পাককার্যে ক্লান্তা হয়ে ভীমের রমণী।
বক্ষ হতে বস্ত্র খুলে ফেলিল তখনি ॥
শ্বশুর সম্ভোগ ইচ্ছা বধূ হয়ে কয়।
কেমনে সম্ভবে ইহা বলহ নিশ্চয় ॥ [হাতিবাড়ী, মেদিনীপুর]

ভীমের পত্নী রন্ধনে ক্লান্ত হয়ে বায়ুর প্রার্থনা করছে। যেহেতু ভীম পবনের মানসপুত্র, তাই গ্রাম্য-মানুষের কাছে ভীম-পত্নীর এই বায়ু সম্ভোগের ইচ্ছাটিকে কৌতুকময় বলেই মনে হয়েছে।

৪৪। পশু সঙ্গে ভ্রমে কিন্তু পশু নয়।
কভু রাজ বেশ কভু যোগী বেশে রয় ॥
অসম্ভব কার্য তার শুনে হাসি পায়।
পিতার কন্যার গর্ভে সন্তান জন্মায়। [রামচন্দ্র], ঐ

৪৫। পিতাপুত্র এক নারী করে আলিঙ্গন,
উভয় ঔরসে জাত উভয় নন্দন ॥
নাম তাদের কি হয় বল দেখি শুনি।
মিথ্যা নহে সত্য ইহা শাস্ত্রে আছে জানি ॥

এর উত্তর হচ্ছে যমপুত্র যুধিষ্ঠির, যমপুত্র সূর্য ও সূর্যপুত্র কর্ণ।

৪৬। দ্বিভুজা রমণী কিন্তু পতি দশভুজ
পশুপতি নয় তবু পতি পঞ্চমুখ
পুত্রহীন শ্বশুর যে অকালে মরিল
কেবা সেই নারী হয় চিন্তা করি বল। [দ্রৌপদী], ঐ

একটা লক্ষ্য করার বিষয়, পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যেখানেই একটু রহস্যময়তা আছে, অদ্ভুত কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে গ্রাম্য মানুষ ধাঁধার মধ্যে তাকেই তুলে ধরেছে।

৪৭। হস্ত পদ নাহি দেহ কুষ্মাণ্ড আকারী।
পৈতা কেহ নাহি দেখ তবু পৈতাধারী ॥
চন্দনে চর্চিত কৃষ্ণ অঙ্গ পুষ্পময়।
মহারাজ নয় কিন্তু সিংহাসনে রয় ॥
ভক্ষ্যপাণি নাহি চায় তবু খাদ্য দেয়।
আশিস না করে কারে প্রণমিলে তায় ॥ [শালগ্রাম শিলা]

হাতিবাড়ীর লৌকিক সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্মের ক্ষেত্রে শুধু পৌরাণিক চরিত্র বা কাহিনীই নয়, শালগ্রাম শিলারও প্রভাব সেখানকার লোকজনকে কৌতূহলী করে তুলেছে ও ধাঁধা রচনা করেছে। লৌকিক গ্রাম্য মানুষের ধাঁধার বিষয়বস্তু থেকে দুর্গা, কার্তিক, রাহু ও ভৈরব কেউ-ই বাদ পড়ে নি। যথা ঃ

৪৮। চারি দেব উপবিষ্ট আসি একস্থান
গগনেতে পঞ্চপদ তিন পেট হন ॥
নয়টি মস্তক আর বাহু চৌদ্দখান,
উনিশ নয়ন সবে অষ্টাদশ কান ॥
বুদ্ধি করি বল দেখি কেমনে সম্ভবে
পুরাণে বর্ণিতা ইহা ভেবে দেখলে পাবে

দুর্গা, কার্তিক, রাহু ও ভৈরব।

৪৯। শচীসুত নহে কিন্তু ইন্দ্রের তনয়
পিতামহ ব্যাসদেব জানিবে নিশ্চয় ॥
ভগ্নী তার ভার্যা হয় একি বিপরীত
মামীকে শাশুড়ী বলে জগতে বিদিত ॥ [অর্জুন]

পৌরাণিক জগতের যা কিছু অসম্ভব, অবাস্তব, কৌতুককর বৈচিত্র্যময় চোখে পড়েছে গ্রাম্য মানুষ তার সব কিছুকেই ধাঁধার জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তুলে ধরেছে অপরজনের কাছে, তার বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার মানসে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের যা কিছু রহস্যময় তাদের দৃষ্টিপথে এসেছে তারা তারই রহস্য ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যখন সেই উপলব্ধ বিষয়টি পরিস্ফুত হয়েছে, তখন তাকেই ধাঁধার হেঁয়ালীর মাধ্যমে চিরস্থায়ী কৌতুক ও কৌতূহলে বিষয় করে ধরে রাখবার চেষ্টা হয়েছে। কৃষ্ণের জন্ম কাহিনী অতি বিচিত্র। ভাগবতের এই কৃষ্ণ জন্মকথার রহস্যকে গ্রাম্য মানুষ ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে ধাঁধার মাধ্যমে। যথা ঃ

৫০। জনমিয়া মাতৃস্তন পান না করিল,
পরগৃহে প্রাণভয়ে আশ্রয় করিল।
অবশেষে মাতুলে করিল সংহার,
শুনিয়া মঙ্গল বিধি করুন সবার ॥ [কৃষ্ণ]

গ্রাম্য মানুষ অনেক সময় লৌকিক ধাঁধার অনুসরণে নিজেদের মধ্যে চাতুরী পরীক্ষার ইচ্ছায় ধাঁধা তৈরী করেছে। ধাঁধাগুলি ব্যক্তি-কর্তৃক রচিত হওয়ার লক্ষণ দেখা গেলেও এর সঠিক রচয়িতার নাম নাই। অপরদিকে বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও লৌকিকতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট ঃ

৫১। বিধাতৃ নির্মিত ঘর অতি সুগঠন,
তাহার মধ্যেতে থাকি করে বিচরণ ॥
হস্তপদ নাহি তার মাংসপিণ্ড প্রায়
জলের ভিতর থাকে কিবা সেই হয় ॥ [শামুক]

৫২। সন্ধ্যাকালে জন্ম তার প্রভাতে মরণ,
মস্তক উপরে সদা করে বিচরণ ॥

স্বর্ণকায় মনোহর দেহের বরণ।
এক পথে করে গতি সেই কোন জন ॥ [তারা]

৫৩। হাসতে হাসতে আসছ তুমি ঠাট্টা করতে মোকে।
আমার শ্বশুর বিয়ে করেছে তোমার শ্বশুরের মাকে ॥
ভেবে দেখো মোর সনে কি সম্বন্ধ হয়।
উপহাসের পাত্রী কিনা জানিবে নিশ্চয় ॥ [মামীশাশুড়ী]

এভাবে পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের মানুষ রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথা-লোকগীতি এবং ধাঁধায় সুসমৃদ্ধ করে রেখেছে তাদের লৌকিক মানসটিকে। জীবনে তাদের দুঃখ আছে, অভাব আছে ; শত সহস্র অনটনের পীড়া তাদের প্রতিনিয়ত পীড়িত করে, কিন্তু তারা গান গায়। নূতনডির মহেশ্বর টুডু, কুইলাপালের ভোলানাথ কালিন্দী, বাঁশপাহাড়ীর হারাধন, ডোমজুড়ির কার্তিকচন্দ্র দণ্ডপাট, হাতিবাড়ীর কাদম্বতী দেবী—পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের অসংখ্য মানুষের এরাই হচ্ছে প্রতিনিধি, যারা বয়ে নিয়ে চলেছে লোক-সংস্কৃতির এক বিরাট ভাণ্ডার—লোক-সাহিত্যের ধারাকে। আজও যদি সুবর্ণরেখা—দারুকেশ্বর—রূপনারায়ণের তীরবর্তী এই সব গ্রামে যাওয়া যায় তবে শুনতে পাওয়া যায় ভাদু-টুসু, করমগান, ঝুমুরগীতি—আর রূপকথা-উপকথা-ধাঁধা-প্রবাদ—সমস্ত কিছু। সুবর্ণরেখার তীরে আজও রচিত হচ্ছে লোক-সাহিত্যের এক বিরাট স্বর্ণভাণ্ডার। আজও সেখানে গেলে গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী হাসিমুখে এগিয়ে আসবে, ডালা ভরে দেবে মুড়ি, চক্‌চকে মাজা ঘাটিতে করে দেবে জল, আর খাটিয়া দেবে পেতে, বলতে শুরু করবে এক রাজা আর এক রাজপুত্তুর……।

*

সপ্তম পর্ব

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের ছড়া

॥ সূচনা ॥

লোক-সাহিত্যের ছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহ মন্ত্রের মত ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারি না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং এত নীতি প্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদ্ ঘর্ম-ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে অথচ এই সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। ['ছেলে ভুলানো ছড়া'। লোক সাহিত্য। পৃ. ৩।]।

এর কারণ হিসাবে চলা চলে যেহেতু শিশু হচ্ছে প্রকৃতির সৃজন সেহেতু ছড়াগুলিও প্রকৃতিরই সৃষ্টি। তাই রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন—'তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে'। আমাদের চেতন মনের শাসন অনুশাসনের বাইরে একটা এমন জগৎ আছে যেখানে জগতের শ্রুত-অশ্রুত-ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, রূপ-রস, গন্ধ স্পর্শের একটা বড় অংশ বাইরে থেকে যায় এবং পরে কোন এক সময় মনের পর্দায় চলচ্চিত্রের মত ভেসে ওঠে এবং ছড়ার মধ্যে গড়ে ওঠে এক কল্পনাময় জগৎ। ছড়াগুলির মধ্য দিয়েই শিশুর কল্পনার জগৎ সত্য ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আকাশের সঙ্গীত, পাখীর কলতান, পাতার মর্মর ধ্বনি, ঝর্ণার কলধ্বনি, ধানের শিষের নৃত্য চপল ভঙ্গী, বৃষ্টির ঝির ঝির ধারা—পৃথিবীর সমস্ত কিছুর বিস্ময়ই শিশুর কাছে ছড়ায় এক কল্পনা ও বিস্ময়ের জগৎ তৈরী করে। তাই যখন বলা হয় :

ধনকে নিয়ে বনে যাব, থাকব বনের মাঝে।
আয় দেখিনি নীলমণি তোর কেমন ঘুঙুর বাজে ॥
তোর নাচলে কেমন সাজে, ঝুনুক ঝুনুক বাজে ॥ [বাঁকুড়া]

তখন শিশুর নৃত্যের তালে তালে কেবল নূপুরের নিক্বণই শোনা যায় না, বনের সবুজ পাতার মর্মর ধ্বনিও যেন কান পাতলে ছড়াটির মধ্যে শোনা যায়। আদিম জন-সমাজের রহস্যময় জগত শিশু-কল্পনায় ধাঁধাঁ ও ছড়ার মধ্যে আর এক নবতম জগতের সৃষ্টি করেছে।

ধাঁধাঁ ও ছড়ার মধ্যে শিশুমনের কোন অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তা বলতে গিয়ে Maurice Bloomfield বলেছেন: 'From olden times, as an early exerise of the Primitive mind in its adjustment to the world about it, comes the riddle. ···The fresher the vision, when the world was young, so much keener was the interest in the phenomena of nature, in the phenomena of life, and in the simple institutions which surrounded man. All harmonies and fitness all discrepancies and inconsistencies attract the notice of children and the child-like man······They are the mystery and at the same time the rationalism of the juvenile mind.'

[S. D. F. L. pp. 939]

সুতরাং এর থেকেই বেশ বোঝা যায় প্রাকৃতিক আদিম ভয় ও বিস্ময়ই ছড়ায় এবং ধাঁধাঁয় এক রহস্যময়তার ও সৌন্দর্য প্রাণতার সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি আদিম ছড়ায় এক সঙ্গে সৌন্দর্য, কল্পনা ও রহস্যের আলোছায়া সৃষ্টি করেছে। ছড়াগুলি Varrier Elwin সংগৃহীত:

১। White flower there is none like you.
From a great crowd I choose you.

২। The parrot has eaten him green Karmata fruit.
O wings of the golden bird those days are gone.

৩। Heavily pours the rain, the water comes along the caves,
The girls' are eating frogs eggs', the red calf is never weary,
As I was digging, Malko, I found a mouse's hole.'[১]

আদিম রহস্য থেকে শুরু করে গ্রাম্য শিশুর কল্পনা এবং সৌন্দর্য-মুগ্ধতার ছবি আছে লোক-সাহিত্যের ছড়াগুলিতে। পরবর্তী অংশে শিশু মনই যে ছড়ার আদি উৎস তারই আলোচনা উপস্থিত করে পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের ছড়ার এক সংক্ষিত বিবরণ দেওয়া হবে।

॥ এক : শিশুমন ও ছড়া ॥

শিশুমন কল্পনা বিলাসী। রঙীন কল্পনার মায়ালোকে সঞ্চরণ করতে তার শিশুমন সর্বদা উৎসুক। সাংসারিক ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার মালিন্য স্পর্শ তাদের অন্তরকে কলুষিত করে না বলেই হয়ত তারা নিজের অজান্তেই মনে এক কল্পনার মায়ালোক রচনা করে ফেলে। শিশু-মন গণ্ডীবদ্ধ থাকতে পারে না, সে সর্বদা সুদূরেরই পথে যাত্রা করে আকাশের পথে পথে, মেঘলোকের আস্তরণে আস্তরণে ঘুরে বেড়ায়। তাই তাকে ভুলাবার জন্য প্রয়োজন নিত্য নূতন সামগ্রীর। অল্প সামান্য কথায় হয়ত তাকে ভুলানো সম্ভবপর, কিন্তু সেই অল্প কথাই কল্প-লোকের রহস্যজালে মায়ামধুর হয়ে ওঠা চাই। আর এই জন্যই শিশুমনের কল্পনার রঙকে আরো উজ্জ্বল করার প্রয়োজনেই ছড়া-গানের সৃষ্টি।

শিশুই পরিণত-বুদ্ধি মানুষের অগ্রজ। অনাদিকাল থেকেই শিশু কল্পনা বা শিশুর জন্য কল্পনার সামগ্রীই হয়তঃ একমাত্র লোক-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল। ছড়া এই বিষয়বস্তুর অগ্রজতম। তাই এর বহিরঙ্গ পরিপাট্য না থাকলেও দেশ দেশান্তরের ছড়া একই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। বিষয়বস্তুর সঙ্গে কৃত্রিমতা নেই—অকৃত্রিম সরল অকপট হৃদয়ের কল্পনা-কথাই ছড়ার মধ্যে সঞ্চারিত।

---

[১] A short Anthology, Five Battra songs. Man in India Vol—XXIII, pp. 9.

যুগে যুগে দেশে দেশে শিশুমন অভিন্ন—একাত্ম-হৃদয়। আর সেই শিশুমন চিরন্তন স্বপ্নের দেশকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করে। 'ক্ষীর নদী'র তীর থেকে আরম্ভ করে 'উজানতলী'র দেশ সমস্ত তাদের কাছে প্রত্যক্ষ—হয়তো কল্পনায় দেখা, বাস্তব। তাই মা যখন ছেলেকে দুধ খাওয়ায় তখনও যেমন ছড়া বলতে হয় আবার যখন ঘুমাবার সময় হয় তখনও জননীকে ছন্দের তালে তালেছড়া বলেই ঘুম পাড়াতে হয়ঃ

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়োলো বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।

শিশুমন পরির্তনশীল। তাই রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ মেঘের পরিবর্তনশীলতা যেমন চিরন্তন ধর্ম, তেমনি শিশুমনে নিয়ত পরিবর্তনধারা সদাপ্রবাহমান। মেঘদল যেমন বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হয়ে বায়ুস্রোতে যথেচ্ছ ভাসমান থাকে, তেমনি শিশুমনের কল্পিত ছড়াগুলি এরূপ বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, কল্পনার তরঙ্গে সদা ভাসমান। কিন্তু মেঘ কেবল যেমন বিষয়হীন অসার বস্তু নয়, মাঝে মাঝে উচ্চস্তর থেকে বৃষ্টিধারায় নেমে এসে ঊষর কঠিন মাটিকে সরস করে তোলে, তেমনি ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হয়ে কল্পনার বৃষ্টিতে শিশু-শস্যকে প্রাণদান করে আর শিশু হৃদয়কে উর্বর শস্যশ্যামল করে তোলে।

এই ভাবহীন, বিষয়হীন, বন্ধনহীন লঘু ছড়াগুলিই শিশুমনের কল্পনার সঞ্জীবনী-মন্ত্র। দিবসের ক্রীড়া-ক্লান্ত দামাল শিশু যখন মধ্যাহ্নের অলস আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্রাম করতে চায় তখনঃ

খোকন যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে যাবে কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে যাবে চিলে।

ছড়াটি শিশুর কল্পনা-প্রবণ মনে যে আনন্দের সাড়া জাগায় তার পিছনে কোন বৈষয়িক আকর্ষণ কিংবা ভাবগাম্ভীর্য থাকে না, কেবল

খোকা তখন কল্পনায় ক্ষীর নদীর কূল স্পষ্ট দেখতে পায় এবং কোলা-ব্যাঙের ছিপ নেওয়ার দৃশ্য বা চিলের মাছ নেওয়ার দৃশ্য তার লঘু হৃদয়কে আনন্দ-হাস্যে পুলকিত করে তোলে।

আবার মধ্যাহ্নের শেষে যখন শরতের লঘু মেঘ সঞ্চরণ করতে করতে রৌদ্রালোকিত ধরণীতে দু-একপশলা বৃষ্টিধারা নামিয়ে দেয়, তখন হয়ত জননী শিশুকে আনন্দ দেওয়ার জন্য বলে ওঠেন ঃ

রোদ হয়, জল হয়,
খ্যাঁকশেয়ালের বিয়ে হয়।

তখন খোকার মনে রোদ এবং জলের একসঙ্গে হওয়াটাও যেমন আশ্চর্য লাগে তেমনি খেঁকশিয়ালের বিয়ের মত একটা অসম্ভব ব্যাপার কল্পনা করে পুলকিত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র আলোচনায় লোক-সাহিত্যে ছড়া প্রসঙ্গে একটিমাত্র দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শিশু সম্পর্কিত সব ছড়াই ছেলে ভুলানো ছড়া নয়। যতদিন পর্যন্ত শিশুর মুখের ভাষা অস্ফুট থাকে—ততদিন জননীই ছড়া বলে শিশুকে ভুলিয়ে রাখেন—এটা শিশু-বিষয়ক ছড়ার অংশ মাত্র—সমগ্র পরিচয় নয়। এই ছড়ার আবৃত্তিকারিণী জননী। কিন্তু শিশু যখন শৈশব অতিক্রম করে বাল্যে প্রবেশ করে, তখন সে কেবল মায়ের মুখ থেকে ছড়া শুনে তৃপ্তিলাভ করে না। নিজেও ছড়া বলতে শেখে। তখন তার খেলার জীবন। তাই তার প্রথম জীবনের ছড়াকে যদি ছেলে ভুলানো ছড়া বলা যায়, তাহলে দ্বিতীয় স্তরের ছড়া ছেলের খেলার ছড়া। আবার ছেলে ভুলানো ছড়াকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। ঘুম পাড়ানো, দুধ খাওয়ানোর ছড়া তাদের মধ্যে অন্যতম।

এভাবে দেখা যায় শিশু ও শিশু-বিষয়ক ছড়ার বিষয়-বৈচিত্র্যের সীমা-পরিসীমা নাই। বর্তমানে লোক-সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গেছে। এবং ছড়া সম্পর্কে এক নূতন গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে। এই গবেষণা ও আন্দোলনের পুরোধা অধ্যাপক ড.

আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা দেশের শিশু-বিষয়ক ছড়াগুলিকে তেরোটি বিষয়ে বিভক্ত করেছেন :

১। ঘুম পাড়ানো ছড়া : ক। দোলার ছড়া। খ। কোলের ছড়া।
২। খেলার ছড়া : ক। ছেলের খেলার ছড়া। খ। মেয়েদের খেলার ছড়া। গ। ছেলেমেয়েদের খেলার ছড়া।
৩। নাচের ছড়া।
৪। মামাবাড়ীর ছড়া।
৫। শিশুর অভিযানের ছড়া।
৬। শিশুর কান্নার ছড়া।
৭। শিশুর খাওয়ার ছড়া।
৮। বিয়ের ছড়া।
৯। শিশু ও মা সম্পর্কিত ছড়া।
১০। খোকা ও চাঁদ সম্পর্কিত ছড়া।
১১। খোকার কৃষ্ণরূপের ছড়া।
১২। শিশু ও পশুপক্ষী-বিষয়ক ছড়া।
১৩। বিবিধ।

শিশু সম্পর্কিত ছড়ার কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ঘুম পাড়ানো ছড়ার কথা মনে আসে। দুরন্ত ও অবোধ শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য মাতাকে নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই ছড়াগুলি তাদের অন্যতম। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ দু-রকম ছড়া ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথমটি দোলার ছড়া। দোলার মধ্যে শুইয়ে মাতা বা অন্য কেউ মৃদুভাবে দোল দিতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সুরেলা ছড়ার সৃষ্টি হয় :

দোল দোল দুলুনি রাঙা মাথায় চিরুনি,
বর আসবে এখুনি নিয়ে যাবে তখনি।

এক্ষেত্রে মনে হয় শিশুটি কন্যা, মাতা তাঁর কন্যার ভাবী বরের স্বপ্ন দেখিয়ে ঘুমের দেশে পৌঁছিয়ে দিতে চান। তাই আবার বলেন :

আয় ঘুম যায় ঘুম দত্ত পাড়া দিয়ে,
দত্তদের বউ পান খেয়েছে এলাচ দানা দিয়ে।

খোকনের ঘুম যখন ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসতে থাকে, তখন মা আরও ঘুম গভীর করে আনতে চান শিশুর চোখে। তাই আবার বলেন ঃ

ঘুম পাড়ানি মাসিপিসী মোদের বাড়ী এসো,
খাট নেই, চৌকি নেই খোকনের চোখ জুড়ে বসো।

ঘুম জগতের যিনি অধিষ্ঠাত্রী, তিনি দেবীও নন,—তিনি আমাদের ঘরেরই স্নেহশীল পিসীমাসী কিংবা জননী। তাই তাঁকে গৃহে আহ্বান করে খাট-চৌকির বদলে খোকার চোখ জুড়ে বসতে অনুরোধ করেন। ক্রমশ রাত্রি বাড়ে। মা বলেন ঃ

নিষুত রাতি নাইরে সাড়া,
ঢুল ঢুল ঢুল নয়ন তারা।
কুল কুল বইছে নদী
ঘুমের জোছনায়,
আয়রে ঘুম, আয়রে—
তোরা আয়।

ঘুমের জোছনার মধ্য দিয়ে যে নদী কুলকুল স্বরে প্রবাহিত হচ্ছে সে অচিন দেশের স্বপ্নময় নদী, সেখানকার নিষুত রাতের তারা খোকাকে ডাক দেয়, খোকার চোখে নিদ্রাদেবী ভর করেন।

আবার মা কখনও কোলে করে শিশুকে দোল দিতে থাকেন, দোলের তালে তালে আপনা থেকে এক অপূর্ব ছন্দের সৃষ্টি হয় এবং সেই ছন্দই ছড়ার জন্ম দেয়, বলে ওঠেন ঃ

দোল দোল দোলে,
খোকনমণি কোলে,
কুলগাছটির তলে।
মাসি কাটে সরু সুতো
মামা কাটে পাত,
সত্যি করে বলগো মাসী
মামা কি তোর বাপ ?

শেষের পদে 'মামা কি তোর বাপ ?' কথাটির উপর যখন মা জোর দিয়ে বলে ওঠেন তখন শিশু উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠে।

শিশুর ঘুম পাড়ানো যেমন এক সমস্যা, অসময়ে কান্না নিবারণ করাও আর এক সমস্যা। শিশুর হাসি যেমন অকারণ, তেমনি কান্নাও অকারণ। শিশু যখন খাবার সময় কিংবা অন্য সময় কাঁদে মা শিশুকে ভুলাবার জন্য বলেন :

খোকন যাবে নায়,
পাঁচশো টাকার মলমলের থান
জরির জুতো পায়।

খোকার সঙ্গে মায়ের কৃষ্ণরূপের কথাও মাঝে মাঝে স্মরণ পথে উদিত হয়। তাই মা জিজ্ঞাসা করেন :

কোন বনে গিয়েছিলি ওরে রাম কানু ;
আজ কেন চাঁদ মুখে শুনি নাই বেণু।

আবার জিজ্ঞাসা করেন :

ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বাঁধিয়া,
কিছু বুঝি খাও নাই শুকায়েছে হিয়া।

শিশুর কান্না যখন কোন ক্রমেই থামে না মা তখন বলেন :

তোমরা কেউ কোরোনা মানা
স্যাকরা ডেকে মোহর কেটে
গড়িয়ে দেবো দানা।

কালো বলে খোকাকে গালি দেওয়ায় খোকনের কান্না যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মা খোকনকে কোলে নিয়ে বলেন :

আমার খোকনকে কেউ বোলনা কালো,
পাটনা থেকে হলুদ এনে গা করে দেব আলো।

এই খোকন মাঝে মাঝে অভিযান করে। কল্পনাময় স্বপ্নজগতে মাঝে মাঝে তার এই অভিযান চলে। তাই মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে খোকন :

তালতলা দিয়ে জল যায় মা
ডুবে মরি গো,
পাটের শাড়ী বার করনা
দক্ষিণ যাবো গো।

সে শুধু দক্ষিণে যাবে না, সে সকলের জন্য দ্রব্যসম্ভারও নিয়ে আসবে। তাই সে আবার বলে :

বাবার জন্য আনবো আমি
দুধ খাবার বাটি,
মায়ের জন্য আনবো আমি
হেঁসেল পাড়ার ঘটি।
ভায়ের জন্য আনবো আমি
রতনমণি দোলা,
বোনের জন্য আনবো আমি
কমলা লেবুর খোলা।

খোকন সবার জন্য সব কিছু আনবে। কিন্তু বোনের জন্য কমলা-লেবুর খোলা কি জন্য আনবে তার রহস্য অনাবিষ্কৃত থেকে যায়।

মাঝে মাঝে খোকন মায়ের কোল থেকে বেরিয়ে পড়ে, খোঁজা-খুঁজির পর মা হয়ত তাকে পান, কিন্তু সেই খোকনের সঙ্গে রহস্য করার ছলে বলেন :

খোকন খোকন ডাক পাড়ি,
খোকন নেই কো ঘরে,
টোকা মাথা দিয়ে খোকন
বেগুন চুরি করে।

কিংবা, খোকনের অভিযান চলে আরো দূর দেশে :

খোকা যাবে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে
মাছ নিয়ে গেল চিলে।

খোকন ও মায়ের সম্পর্ক একান্ত নিবিড় স্নেহ-সম্পর্ক। এই খোকনকে সাজিয়ে মায়ের তৃপ্তি নাই, আবার মনে মনে ভয়ও আছে, পাছে খোকনের প্রতি কেউ নজর দেয়। তাই খোকনের কড়ে আঙ্গুলটি কামড়ে মা বলেন :

সাঁঝের বাতি নড়ে চড়ে
খোকনকে যে খোঁড়ে,
তার মুখটি যেন পোড়ে।

আর

যে খোঁড়ে মনে মনে পুড়ে মরুক সে
আঁধার ঘরের কোণে।

খোকার সঙ্গে চাঁদের যে সম্পর্ক সে চিরন্তন মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক। চাঁদ তার মামা, তাই শিশু-কোলে মা বলে ওঠেন ঃ

আয় চাঁদ নড়ে
ভাত দোব বেড়ে,
রাঙা সুতোর কাপড় দেব,
চড়ে বেড়াতে ঘোড়া দেব,
দুধ খেতে গাই দেব
ধান ভেঙে কুঁড়ো দেব
আয় চাঁদ আয়।

এত প্রলোভন সত্ত্বেও চাঁদ যখন শিশুর কপালে টিপ দিয়ে যায় না তখন ক্রন্দনরত শিশুকে মা সান্ত্বনা দেন ঃ

চাঁদ ত কথা শোনে না
চাঁদ হেসে ভেসে যায়
আয় চাঁদ আয়।
চাঁপা গাছের উপর দিয়ে
বাঁশ বনের ভেতর দিয়ে
নীল সাগরে সাঁতার দিয়ে
আয় চাঁদ আয়।

তখনও যখন চাঁদ আসে না তখন মাতা চাঁদ মামাকে একান্ত অনুরোধ জানান ঃ

দেরে ধরা চাঁদের ফাঁদে
নইলে যে রে চাঁদ কাঁদে।

তখনও যখন চাঁদকে পান না, কিংবা চাঁদের ফাঁদে চাঁদ ধরা দেয় না তখন মা বলেন ঃ

তুই চাঁদের শিরমণি
ঘুমোরে আমার খোকামনি।
মাটির চাঁদ নয়, গড়ে দোব,
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দোব
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব ?

তখন পৃথিবীর চাঁদ খোকোনমণি স্বর্গের চাঁদের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দেয়।

খোকা ভ্রমণ শেষে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে গৃহে ফেরে তখন মা বলে ওঠেন :

খোকা এল বেড়িয়ে
দুধ দাও গো জুড়িয়ে,
দুধের বাটি তপ্ত
খোকা হলেন খ্যাপ্ত।
খোকন যাবে নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।

খোকার নাচ মাতার নিকট একটি প্রিয় সামগ্রী। তাই খোকা যখন নাচে মা বলেন :

আয় রে আয় টিঁয়ে নায়ে ভরা দিয়ে
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে,
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।

পাখির মধ্যে টিঁয়া-পায়রা, শালিক শিশুর নিকট খুব প্রিয়। আর পশুর মধ্যে শিয়াল ভোঁদড় ইত্যাদি পশুর সমাবেশ বেশী লক্ষ্য করা যায়।

শিশুর খেলাধূলাও ছড়ার মধ্যে অঙ্গীভূত। অর্থাৎ ছড়ার মাধ্যমে শিশুর খেলার রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ভাই-বোনে বসে প্রদীপের আলোকে খেলে আর ছড়া বলে :

এক যে রাজা
সে খায় খাজা,
এক যে রানী
সে খায় ফেনী
তার যে বেটা
সে খায় পাঁঠা,
তার যে বউ
সে খায় মউ
তার যে চাকর
সে খায় পাঁপর
আর দেয় ঘুম
তাল গাছ পড়ে দুম।

এই তালগাছ পড়ার সঙ্গে তারা হাসিতে লুটোপুটি খেতে থাকে, খেলা জমে ওঠে। কিংবা,

তালগাছ কাটম্ বোসের বাটম্
গৌরী হেন ঝি,
তোর কপালে বুড়ো বর
আমি করব কি ?
টঙ্কা ভেঙ্গে শঙ্কা দিলাম
কানে মদন কড়ি
বিয়ের বেলায় দেখে এলাম
বুড়োর চাপদাড়ি।

এই ছড়াটি কেবলমাত্র মেয়েদের খেলার ছড়া। ভাই আবার ছড়ার মাধ্যমে দিদির সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করে :

দিদিগো দিদি
একটা কথা,
কী কথা
ব্যাঙের মাথা,
কী ব্যাঙ
সরু ব্যাঙ।
কী সরু
বামুন গোরু,
কী বামুন
ভাট বামুন।
কী ভাট
গুয়া কাঠ
কী গুয়া
চিকি গুয়া
কী চিকি
সোনার চিকি
কী সোনা
ছাই সোনা,
তার অর্ধেক
ভাগ নেনা।
ভাগ নিয়ে
করব কী
তোর ভাগ
তোরে দি॥

সাধারণতঃ বাদলার দিনে কিংবা সন্ধ্যার পর স্বল্পালোকিত গৃহকোণে বসে ভাই-ভগিনী মিলে এ প্রকার প্রশ্নোত্তরের খেলা চলতে থাকে। অন্তর যখন আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে, তখন সামান্য উপকরণেই হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—সামান্য কয়েকটি কথা অথচ আবৃত্তির

মধ্য দিয়ে আনন্দের সীমা থাকে না। তারা আবার আর এক খেলার ছড়া শুরু করে,

ঘুঘু সই
পুত কই।
কী ছেলে
বেটা ছেলে।
কোথায় গেছে
মাছ ধরতে।
কী মাছ
সরল পুঁটি।
মাছ কই
চিলে নিয়েছে।
কাদা কই
বালি হয়ে গেছে।

চিল কই,
ডালে বসেছে।
ডাল কই
ছুতোরে কেটেছে।
ছুতোর কই
নৌকা গড়ছে।
নৌকা কই
জলে ডুবেছে।
জল কই
কাদা হয়ে গেছে।
বালি কই
লোকে খই ভেজে খেয়েছে।

শিশুমন বৈচিত্র্যের পিয়াসী। শরতের মেঘে যেমন নানা রঙের খেলা, ঝর্ণার ধারায় যেমন তরঙ্গের নানা ভঙ্গিমা, ময়ূরের পাখায় যেমন নানা ছন্দের বিন্যাস, ঝাউবানের বাতাসে যেমন বিচিত্র মর্মরধ্বনি, নদীর কূলে কূলে যেমন নানা সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলা, তেমনি শিশুমনের বৈচিত্র্যের নানা চিহ্ন আছে লোক-সাহিত্যের ছড়াগুলিতে। লোক-সাহিত্যের ছড়াগুলি যেন শিশুমনের কল্প-লোকের বিচিত্র ভাণ্ডার, যেন রূপকথার এক মায়াময় রাজ্য, যেখানে চিন্তা নেই, সংঘর্ষ নেই, দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব, কেবল আনন্দ আর কল্পনার অকারণ পুলক আর হাস্যের ঝর্ণাধারা। এই আনন্দের আর আলোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত হয়ে বাংলার লোক-সাহিত্যের ছড়াগুলি প্রকাশ করে চলছে শিশুমনের নানা বৈচিত্র্যকে।

॥ দুই ॥

'বাঙলা দেশে যে অনার্যের বসতি ছিল তা আমরা এদেশের প্রত্যন্ত ভাগে এখনও অনার্য জাতের বাস দেখে অনুমান করতে পারি। বাঙলা দেশের আদিম অধিবাসীদের অনার্য-ভাষিতার

আর একটি প্রমাণ আমরা পাই বাঙলার গ্রাম আর পল্লীর নাম থেকে…পশ্চিম বাঙলায় ভূমিজ সাঁওতাল, ওঁরাও, মালপাহাড়ীরা এখনও বিদ্যমান ['বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পৃ. ৪০]। রাঢ় অঞ্চলের বহু অংশ জুড়ে আদিম অধিবাসীদের বসবাস। কিন্তু সাধারণ গ্রাম্য মানুষের পাশাপাশি থাকায় তাদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ অনেক বদলে গেছে। তার প্রমাণ আছে পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বহু গ্রামে। কি গ্রাম্য নারী, কি আদিম অরণ্যবাসী সকলেই শিশুকে ঘুম পাড়াবার সময় কিংবা দামাল শিশুকে ভোলাবার সময় ছড়া বলে থাকে। শুধু ঘুমের সময় নয়, জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে তারা গান গায়, ছড়া বলে। শিশুর খেলা থেকে শুরু করে ব্রতকথা, চাষবাস, সামাজিক নানা আচার রীতি-নীতির মধ্যেই আছে ছড়ার সন্ধান তাই ধান রোয়ার সময় দহমুণ্ডার মানুষ ছড়াগান শুনিয়েছে :

১। বাঁশী বাজে যথায় তথায়, বাঁশীর রোদন কুথা
গুণের বাঁশীরে কেনে বাজ নিতি সারাক্ষণ
ঘরে রহিতে না মন। [দহমুণ্ডা]

২। গাছের মহুলরে তুইতো পলিস না ;
আমার ভালবাসার জন ফিরে চাইলো না।
ফিরে চাইলো গো ওটায় পয়সা নাই,
যদি ওটায় পয়সা নাই, তোর মুখের জবাব নাই।
পান পঞ্চায় পয়সা দিলি, দিলি গো সদর করে,
আর পিরীতি করবো না গো মনের বিছরে।
মনের বিছত বড় বিছত ভেটলো শালার অন্তরে
মুড়ির থরকারে, তোকে সোর করে,
আমার ভালবাসাকে দে না মিল করে।
পান খাইতে দিব পয়সা, আমার ভালবাসাকে দে না মিল করে।
নাঞ মারিস না নাঞ মারিস না মরে যাবো,
যদি বাঁচি থাকে পায়ে তেল দিব। [ঐ]

রামেশ্বর ভূঁইয়া এই ছড়া দুটি শুনিয়েছিল। ধান রোয়ার ছড়া দুটির মধ্যে পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের রুক্ষ্ম প্রান্তরের কিছু কিছু আদিমতার চিহ্ন আছে। তাই বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই পরিষ্কার নয় তবে 'আমার ভালবাসাকে দে না মিল করে'—এই ধুয়াটি বার বার আসার ফলে ছড়ামূলক এই গানটি একটি বিশিষ্ট রসের প্রকাশ ঘটিয়েছে। মেদিনীপুর জেলার বাঁশপাহাড়ীতে সংগৃহীত দুটি ব্যঙ্গমূলক বিবাহের ছড়ায় যে আদিমতার ছাপ বিদ্যমান তা বেশ লক্ষ্য করা যায়। যথা :

১। কালো দেখে নামলাম জলে জল হোল মা একগলা
ও প্রাণনাথ, ছেঁকে তোল রঙ্গ দেখিবার যায় বেলা। [ঝাড়গ্রাম]

২। আম বাগানে কে তুমি ফুল বাগানে কে
জ্বর গায়ে ঘাম পড়েছে পাখা আইন্যা দে। [ঐ]

পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের এইসব গ্রামে ঘুরে দেখা গেছে আকারে সংক্ষিপ্ত এই ছড়াগুলি বিভিন্ন সময়ে গান হিসাবেও গেয়েছে। উপজাতীয় সংগীত (Tribal Song) যেমন সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যঞ্জনা-পূর্ণ, পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের ছড়াগুলিও তেমনি সংক্ষিপ্ত, অর্থবহ ও রূপকাশ্রয়ী। কয়েকটি ছড়ার উদাহরণ দিলে এ কথাটি সপ্রমাণ হবে। প্রথমে পুরুলিয়া জেলার একটি ছড়া :

১। আলা গো তুষ কুন্নি ঘরে বাইরে গাইওলি।
গেয়ের গোবরের সরষের ফুল, আমরা পুজি গো মা-বাপের কুল॥

২। আওনি বাওনি তিন দিন পিঠা ভাত খাওনি।
তিন দিন না কোথা যেও, ঘরে বসে পিঠা খেও॥ [মেদিনীপুর]

৩। চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ, হিঞ্চে বনে শচী।
ঐ এক চাঁদ ঐ এক চাঁদ, চাঁদে মেশামেশি॥ [বাঁকুড়া]

৪। কুলি কাদা পায়ে আলতা, তাই আস্তেছে লিতে লো।
হারাল সিন্দূরের কৌটা মন সরে না যাত্যে লো॥ [পুরুলিয়া]

এরই সঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বৈগা উপজাতির কতকগুলি ছড়া-মূলক গান উপস্থিত করা যেতে পারে। যথা :

১। Against the sky swings the mango fruit
O my sweet enemy, take my life and
I will take care of yours.[২]

২। The Narbadda came and sweept away the rubbish
Fly away, bees, do not perch on my cloth.[৩]

৩। The mahua flowers are falling from the trees on the hill
Leave me your cloth so that I may know you
will return.[৪]

উপরোক্ত ছড়ামূলক গানের মধ্যে আদিম মানসিকতার অনেক চিহ্ন বর্তমান।

শিশু এবং নারীই অন্যান্য অঞ্চলের মত পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের ছড়ারও প্রথম এবং প্রধান উপজীব্য। এ ধরণের ছড়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন: 'বস্তুতঃ মনুষ্য বুদ্ধির নিকট শৃঙ্খলাতেই সৌন্দর্য, বিশৃঙ্খলাই কুৎসিৎ,……কিন্তু শিশুর পক্ষে সমস্তই ইহার বিপরীত।……তাহার স্বাধীন মুক্ত জীবনের নিকট প্রকৃতির মূর্তিও সম্পূর্ণ ভাবে বিশৃঙ্খল ও সংযম-রহিত। তাহার নিকট জগতের খানিকটা প্রাকৃত, খানিকটা অতিপ্রাকৃত নহে, সমস্তটাই অতিপ্রাকৃত।' [শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'খুকুমণি ছড়ার' ভূমিকা] একটি সাঁওতাল পরগণা ও পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের সন্নিহিত অঞ্চলের ছড়ার উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি সুপরিস্ফুত হবে। যেমন:

আয় ঘুমানি আয়, ভালুকে তেঁতুল খায়,
তারা নুন কুথা পায়।
শাওড়া গাছের নুন, কুসুম গাছের তেল
তারা তাই দিয়ে দিয়ে খায়॥

---

[২]'Baiga Poetry' : *Man in India* : vol—XXIII. pp. 55.
[৩]'Twenty Four Murha Dadaria' : ibid. pp. 24.
[৪]Ibid.

এ প্রসঙ্গে লোকশ্রুতিবিদের অভিমতটিও প্রণিধান যোগ্য : 'এখানে চিত্রটি যে একান্তই অসম্ভব, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ ভালুকের তেঁতুল খাইবার মধ্যে কিছুই অসম্ভাব্যতা নাই, কিন্তু তেঁতুল খাইতে হইলে ভালুকেরও যে নুনের একান্তই প্রয়োজন এবং তাহার অভাব এক ক্ষেত্রে সে নদীর ঝুর ঝুরানি বালি এবং আর এক ক্ষেত্রে কুসুম গাছের তেল দ্বারাই পূর্ণ করে এবং কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রে শাওড়া গাছ হইতে নুনের সন্ধান পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করে, ইহারই মধ্যেই একটু অসম্ভব্যতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অসম্ভব এবং অসঙ্গত চিত্রের মধ্য দিয়াই ছড়ার রস প্রকাশ পায়, এখানেও তাহাই হইয়াছে'।[৫] পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের ছড়াগুলির প্রথম ও প্রধান রস তাই অসঙ্গতি ও অসম্ভবের রস যা শিশুচিত্তকে সরস ও উর্বর করে, পুলকে পরিপূর্ণ করে।

ঘুম পাড়ানো শিশুকে এক ভীষণ ব্যাপার। তার জন্যে যেমন মাকে অসম্ভবের ছবি আঁকতে হয় তেমনি তুলে ধরতে শিশুর অনেক আবদার এবং অসঙ্গতির কথা। যথা :

১। সনা বায়ানি সনা বায়ানি গাই চরিতে যাবা।
মা বাপো যে গাল দিবে সন্ন্যাসী হবা॥
ভোগ লাগিবে কি খাইবু কালিবাড়ির ফল।
ঘুম ধরিলে বাই শুইবু গাইর গোড়তল॥ [মেদিনীপুর]

২। হাইনা আস্‌সে বাঘ আস্‌সে পড়তে যাবনি
মুড়ি খায়্যা শুইয়া পড়ব ঘুম ধরবে নি॥ [ঐ]

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার শাল আর মহুয়ার জঙ্গলে থাকে বাঘ আর হায়েনা! সুতরাং শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে শিশুকে যেমন গাই চরাতে পাঠাতে হয় ঠিক তেমনি বাঘ ও হায়েনার ভয়ও দেখাতে হয়।

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার মেদিনীপুর-বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার বহু গ্রাম বর্গীর আক্রমণে যে বিপর্যস্ত হয়েছিল তার ঐতিহাসিক পরিচয়

---

৫ 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ২য় খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃ. ৫৩।

নিয়ে ঐ অঞ্চলের বহু ছাড়া আজও শিশুরাজ্যে এক নূতন কল্পনা ও বিভীষিকার সৃষ্টি করে। যথা:

১। ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে॥ [বাঁকুড়া]

২। খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো কানাচে ঐ কে ?
ঐ রে বাবা ছেলেধরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।
চোখ দুটো তার ভাটার মত গালভরা দাড়ি।
ছেলেধরা ঝুলি নিয়ে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি॥ [মেদিনীপুর]

উপরোক্ত দ্বিতীয় ছড়াটিতে বর্গীর নাম লুপ্ত হয়ে ছেলেধরায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু তার মধ্য দিয়েও রাঢ় অঞ্চলের সেই অত্যাচারিত দিনগুলির কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলা দেশের ছড়ায় পিসির চেয়ে মা-মাসির প্রাধান্য বেশী। বাংলা দেশে বহুদিন পর্যন্ত অনার্য অদিবাসীদের প্রভাব ছিল। আর্যরা যেমন 'প্যাট্রিয়্যাক্যাল পরিবারের লোক, অনার্যরা, অধিকাংশ 'ম্যাট্রিয়্যাক্যাল' বা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের লোক। তাই বাংলা দেশে আজও পিতৃ-পরিচয় প্রধান হলেও মায়ের দিকে টান অত্যন্ত প্রখর। বাংলা দেশের বিশেষ করে পশ্চিম-সীমান্তের ছড়ায় তারই চিহ্ন বর্তমান। যথা:

১। ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো।
বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো॥
অন্নপূর্ণা দুধের সর, কাল যাব মা পরের ঘর।
পরের বেটা মেলে চড়, কানতে কানতে বাপের ঘর॥
মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিলে শাড়ি।
শীঘ্রি মা বিদেয় কর দাদা আসছে বাড়ী॥ [বাঁকুড়া]

২। ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি মোদের বাড়ী এসো,
খাট নাই মাদুর নাই খোকার চোখে বসো।
চাল কড়াই ভাজা দেব, যত খেতে পারো,
দাঁত না থাকলে তোমা করে দেব গুড়ো।

বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো,
ফোকলা মুখের ঠোঁটটা মাসি রাঙা করে যেয়ো। [মেদিনীপুর]

শিশুর খাওয়াও একটা ভীষণ কাণ্ড। কত অনুরোধ উপরোধ দ্বারা শিশুর মনটিকে পূর্ণ করতে হয়। তাই বলা হয়ঃ 'খোকা আমার কী দিয়ে ভাত খাবে, নদীর কূলে চিংড়ি মাছ বাড়ির বেগুন দিয়ে'। দুধ ছাড়া শিশু আর সবই খেতে চায়। তাই মায়ের জিজ্ঞাসা ঃ

বাপ ভনরি, কি খাইতে সাধ করেছে, চালদা মুসুরী।
বাপ নন্দলাল, কি খাইতে সাধ করেছে, গাছপাকা তাল॥ [ঐ]

কিন্তু সে খায় না, কেবল কাঁদে। শিশুর হাসি আর কান্না যেন হীরে আর পান্না। তাই ছড়ায় তারই কত সান্ত্বনা ঃ

পুঁটু আমার কেঁদেচে কত মুক্তো পড়েচে।
যখন পুঁটু আমার হয় নাই, ভিখারীতে ভিখ নেয় নাই।
ভাগ্যে পুঁটু হয়েছে, ভিখারীতে ভিখ নিয়েছে। [বাঁকুড়া]

এই পুঁটুর আবার যখন বিয়ে হবে তখন কি হবে ঃ

পুঁটু রানীর বিয়ে দেব হপ্ত মালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে, তারা সোনায় দাঁত ঘষে।
রুই মাছ পটল কত ভারে ভারে আসে॥ [ঐ]

তারপর ঐ পুঁটু যখন শ্বশুর বাড়ী যায় তখন মা ছড়ায় বলেন ঃ

আঁকড় ফুলের ঝাঁক ঝাঁক বেঁচ ফুলের পেঁড়ি,
দুর্গা যাচ্চেন শ্বশুর বাড়ী।
আজ থাক মা দুধ পান্তা খেয়ে, কাল যাবে মা শহর কাঁদিয়ে।
পাছে যাচ্ছে ভার বাউটি, আগে যাচ্ছে ডুলি।
দাঁড়ারে বাজ বাজন্দার মায়ে বোধ করি।
নির্বুদ্ধি মাগো, কেঁদে কেন মর ?
আপন বুঝিয়ে দেখ কার ঘর কর। [মেদিনীপুর]

খুড়ো বুড়ো বরে বিয়ে দিয়েছে। শ্বশুর ঘরে যতই সমৃদ্ধি থাকুক না কেন মেয়ের মন ত আর সন্তুষ্ট হয় না। তাই সে প্রতি মুহূর্তে খুড়োকে ডুবিয়ে মারার জন্যে অভিশাপ দেয় ঃ

কাঞ্চন কাঞ্চন দুধের সর, কাঞ্চন যাবে পরের ঘর,
হইত যদি বাপের ঘর, তুল্যা খাইত দুধের সর।
এত হইল পরের ঘর, কোই পাবে রে দুধের সর,
খুড়া দিল বুড়া বর, ও খুড়া তুই জলে ডুব্যা মর॥ [ঐ]

অগ্রহায়ণ মাসে ইতুর পূজা। পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের একটি বহুল প্রচলিত ব্রত। আসলে এটি লৌকিক সূর্য পূজা। নারীরা ইতুর সরায় জল দেবে আর ছড়ায় মন্ত্র বলবে ঃ

ইতু ইতু ব্রাহ্মণ, তুমি ইতু নারায়ণ।
তোমার শিরে ঢালি জল, অন্তিমকালে দিও থল॥
সুষমী-কলমী ঢল ঢল করে রাজার বেটা বচ্ছি গাড়ে।
গাড়ুর বচ্ছি উড়ুক চিল, সোনার কোঠা রূপার খিল॥ [বাঁকুড়া]

তারপর আসে পৌষ মাঘ। সীমান্ত বাংলার রুক্ষ প্রান্তর তখন ভরে ওঠে সবুজ ধানে ধানে। সীমান্ত বাংলার মানুষ তখন পৌষকে আহ্বান জানায় ঃ

পুষালু গো রাই, আমরা ছোপড়ি পিঠ্যা খাই।
ছোপ্ড়ি লোপ্ড়ি, গাঙ্গ সিনাতে যাই।
গাঙ্গের জলে রাঁধি বাড়ি, ঝারির জল যাই॥
চার মাস বর্ষা আমরা পোখোর না খাই।
হাতে পো, কাঁখে পো, পৃথিবীতে জুড়ালো, না পড়লো লো।
এস পো যেয়ো না, জন্মে জন্মে ছেড়ো না॥
কাল খাঁয়েছ পিঠ্যাভাত, আজ খাবে গাঙ্গের জল।
এ বছর যাও পুষালো কাঠের মালা পরে,
আর বছর আন্‌ব গা দুব তুলসী দিয়ে॥

এই সব ছড়া প্রসঙ্গে একজন লোকশ্রুতিবিদের মন্তব্য ঃ ‘এই সব মেয়েলী ছড়ায় বাংলার মেয়েদের চিরন্তন মনস্তত্ত্বের এমন একটি আভাস পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র দুর্লভ।…প্রায় প্রত্যেক ছড়ার টুকরায়, প্রত্যেক তুচ্ছ কথায়, বাঙালী ঘরের বহু বিচিত্র বিস্মৃত সুখ দুঃখ ও হাস্য-কৌতুকের কণা শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে বাংলা দেশের প্রাত্যহিক গৃহ স্বামীর দ্বন্দ্ব কলহ,

দ্বেষ হিংসা, উত্তেজনা অবসাদ, দৈন্য সঙ্কীর্ণতা, অক্ষম, অসহিষ্ণুতা, পানাপুকুরের ঘাট হইতে পিছনের আস্তাকুড় পর্যন্ত, কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই।' ['বাংলা প্রবাদ'। শ্রীসুশীলকুমার দে। পৃ. ৯]। কয়েকটি ছড়ার উদাহরণ দিলে উক্তিটি স্পষ্টতর হবে।

১। চিঁড়ে বল, মুড়ি বল, ভাতের সমান নেই।
পিসী বল, মাসী বল, মায়ের বাড়া নেই ॥

২। মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি ॥
মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের গলায় চন্দ্রহার ॥
গিন্নির হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা,
বাছার কি দিব তুলনা—
মায়ের হাতে তুলার দাঁড়ি, মাগের কানে সোনা।

৩। বউ ভাঙলে শরা, গেল পাড়া পাড়া,
গিন্নি ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা।
তেলের ভাঁড়ে তেল নেইক, পলায় মারে ঘা,
এতদ্দেশের বউ কাটকী ছিদাম তেলীর মা ॥

৪। বড় বউ বড়ালের ঝি, কোণে বসে কর কি ?
মেজ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় ঝাঁঝের আঁটি ॥
সেজ বউ সেজুনী, সব কাজেতে এগুনী।
ন বউ নত্তা, সকল ঘরের কত্তা।
নূতন বউ নথনী, শেওড়া গাছের পেত্নী।
ছোট বউ আতরের শিশি, ছোট্ ঠাকুরপোর গোঁফে ঘষি।

এ ভাবেই বাংলা দেশের ছড়াগুলিতে ধরা আছে শিশুর নানা হাসি কান্নার কথা থেকে শুরু করে সমাজ জীবনে নানা আচার-বিচার রীতি-নীতি সমাজিক নানা অন্যায় ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। এ সব নিয়ে বাংলার লোক-সাহিত্য, সমাজ-মানস ও সৌন্দর্য প্রাণতার চিত্র ধারণ করে বয়ে চলেছে সেই কোন্ সুদূর অতীত কাল থেকে অনন্তকালের দিকে।

*

উল্লেখপঞ্জী

১। বাংলার লোক-সাহিত্য (১ম—৭র্থ খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
২। বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর (১ম—৪র্থ খণ্ড)— ঐ
[An Encyclopaedia of Bengali Folk-Song]
৩। বাংলার লোকশ্রুতি—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
৪। বাংলা সাহিত্যের কথা—ডঃ সুকুমার সেন
৫। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ
৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। বাংলা দেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
৯। হিন্দুসমাজের গড়ন—শ্রীনির্মলকুমার বসু
১০। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—শ্রীবিনয় ঘোষ
১১। Histroy of Bengal (Vol—II)—Sir Jadunath Sarkar
১২। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকা [শ্রাবণ—আশ্বিন সংখ্যা ১৩৭৬]
১৩। বিচিত্র প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৪। লোকসাহিত্য— ঐ
১৫। Folk-Tales of Bengal—Rev. Lalbehari Dey
১৬। Man in India (Vol.—XXIV), 1944, Edited by
—R. C. Roy, W. G. Archer and Verrier Elwin
১৭। Man in India (Vol.—XXIII) 1943, Do
১৮। Folk-Tales of Mohakoshal—Verrier Elwin
১৯। Malto Folk-Tales—Mildred Archer
২০। Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend (S. D. F. L.) Vol—I+II—Edited by Maria Leach
২১। Folk-Lore of Kols—Walter G. Griffiths
২২। Santal Folk-Tales—P. O. Bodding
২৩। The Folk-Tale in Santal Society—Mildred Archer
২৪। The Philosophy of Religion—D. Miall Edwards
২৫। 'লোকশ্রুতি' (প্রথম সংকলন, জুলাই '৭১)—Edited by
Dr. A. Bhattacharjee
২৬। বাংলার ব্রত—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৭। মেয়েদের ব্রতকথা—
২৮। Folklore of Santal Parganas—C. H. Bompas
২৯। সীমান্ত বাঙলার লোকযান—ডঃ সুধীরকুমার করণ
৩০। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা —ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়